অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ

শংকর

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা ১২

সূচি

প্রচ্ছদ চিত্র

১৮৮৬-১৯০১ এই পনেরো বছরে দেশে-বিদেশে স্বামীজির যত ছবি তোলা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ১০৬টি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই ছবিগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্ত করেছেন বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া।

প্রচ্ছদের ছবিটি কবে কোথায় তোলা হয় সে নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথমে ধারণা ছিল ছবির তারিখ ১৮৯৭, কিন্তু পরবর্তীকালে অনুসন্ধানীদের সিদ্ধান্ত ছবিটি কলকাতায় তোলা হয় স্বামীজির দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার দিনে, অর্থাৎ ২০ জুন ১৮৯৯। ওইদিন রামকৃষ্ণজায়া সারদামণি তাঁর সন্ন্যাসীসন্তানদের মধ্যাহ্নভোজনে আপ্যায়ন করেন বশীশ্বর সেনের বাগবাজার ৮ বোসপাড়া লেনের ভাড়াটে বাড়িতে। পরবর্তীকালে বশীশ্বর জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন।

স্মরণীয় এক গ্রুপ ফটো থেকে স্বামীজিকে সাবধানে বার করে আনা হয়েছে। মুখের কোথাও অসুস্থতার চিহ্ন নেই। মূল গ্রুপ ফটোতে যে ছ'জন ছিলেন তাঁদের নাম : স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং বিবেকানন্দশিষ্য স্বামী সদানন্দ। শ্রীমা এই সময়ে বাগবাজার বোসপাড়া লেনেই থাকতেন।

সেবারের বিদেশযাত্রায় জাহাজে স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতা। সেবারেই জাহাজে স্বামীজি তাঁর অনন্য ভ্রমণকাহিনি 'পরিব্রাজক' রচনা করেন যা বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই ছবির ফটোগ্রাফার কে অবশেষে তাও নির্ধারিত হয়েছে—ইনি স্বামীজির শিষ্য, একদা বেলগাঁওয়ের ফরেস্ট অফিসার শ্রীহরিপদ মিত্র। এঁর স্ত্রী ইন্দুমতী মিত্র স্বামীজির প্রথম দীক্ষিতা মন্ত্রশিষ্যা।

স্বামী ত্রিগুণাতীতার বিদেশিনী শিষ্যা শ্রীমতী কারা ফ্রেঞ্চ তাঁর সংগ্রহের ছবিটির পিছনে লিখে রেখেছেন : "ফটো টেক্‌ন বাই এইচ মিত্র, বিবেক কুটীর, ভাইতা পোস্ট (বার্ডওয়ান), বেঙ্গল।"

স্মরণীয় গ্রুপ ফটোটি বেলুড়মঠে স্বামীজির ঘরে পশ্চিমমুখো দেওয়ালে টাঙানো আছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অদ্বৈত আশ্রম

স্বামী রমানন্দ

স্বামী প্রভানন্দ

স্বামী বামনানন্দ

স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী বোধসারানন্দ

স্বামী বিশোকানন্দ

স্বামী বিভাত্মানন্দ

স্বামী আত্মজ্ঞেয়ানন্দ

প্রয়াত সুনীলবিহারী ঘোষ

শ্রীদিলীপকুমার দে

শ্রীজয়ন্ত ঘোষাল

শ্রীঅভীক দত্ত

শ্রীপ্রণব গোস্বামী

শ্রীমতী গোপা বসুমল্লিক

শ্রীপবন লোহিয়া

শ্রীমতী পাপিয়া চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনির্মল সাহা

শ্রীপ্রদীপকুমার সাহা

শ্রীসুধাংশুশেখর দে

শ্রীশুভঙ্কর দে

শ্রীশিবশঙ্কর ঘোষ

শ্রীরবিশঙ্কর বল

শ্রীপ্রশান্ত নন্দী

শ্রীবিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী রিনি সেন

ডাঃ সুব্রত সেন

ডাঃ সত্যজিৎ মুখার্জি

শ্রীবঙ্কিম কোনার

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এবং অবশ্যই

শ্রীঅরুণকুমার দে

তথ্যসূত্র (১)

সুলোচনা—বিশ্বনাথ দত্ত
বাণী ও রচনা ১-১০ খণ্ড—স্বামী বিবেকানন্দ
রামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (৫ ভাগ)—স্বামী সারদানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ১-২ খণ্ড—প্রমথনাথ বসু
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল
স্বামী-শিষ্য-সংবাদ (২ কাণ্ড)—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
আমার জীবনকথা—স্বামী অভেদানন্দ
স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেমন দেখিয়াছি—সংকলক স্বামী চেতনানন্দ
যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ১-৩ খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ
লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১-৩ খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী ১-৩ খণ্ড—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
স্বামী শুদ্ধানন্দ : জীবনী ও রচনা
স্বামীজির পদপ্রান্তে—স্বামী অব্জজানন্দ
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত
স্মৃতির আলোয় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত
বিবেকানন্দের জীবন—রোমাঁ রোলাঁ
শ্রীম-দর্শন ১-১৬ খণ্ড—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ
সেবা—স্বামী নরোত্তমানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ—ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনালোকে—স্বামী নির্লেপানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ১-৭ খণ্ড—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়—ড. বেণীশঙ্কর শর্মা
বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
আদালতে বিপন্ন বিবেকানন্দ—চিত্রগুপ্ত
রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা—স্বামী প্রভানন্দ
আনন্দরূপ বিবেকানন্দ—স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অন্ত্যলীলা—স্বামী প্রভানন্দ
ইউরোপে স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণলীলার শেষ অধ্যায়—নির্মলকুমার রায়
শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিক্রমা—কালীজীবন সেনশর্মা
সংসদ চরিতাভিধান
অন্তিমশয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার তারকনাথ তরফদার—স্বাস্থ্য শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৮
আমি বিবেকানন্দ বলছি—সংগ্রহ শংকর
অচেনা অজানা বিবেকানন্দ—শংকর

তথ্যসূত্র (২)

The Complete Works of Swami Vivekananda Vol 1-9
The Life of Swami Vivekananda By His Eastern & Western Disciples
The Master as I Saw Him—Sister Nivedita
The Complete Works of Sister Nivedita Vols I-V
Letters of Sister Nivedita Vol. I-II—Edited by Shankari Prasad Basu
Swami Vivekananda in the West: New Discoveries Vol I-VI —Marie Louise Burke
A Comprehensive Biography of Swami Vivekananda Vol I-II —Sailendranath Dhar.
Swami Vivekananda—Romain Rolland
Days in the Indian Monastery—Sister Devmata
Six Lighted Windows—Swami Yogesananda
Swami Vivekenanda: A Forgotten Chapter of His Life —Dr. Beni Shankar Sarma
Swami Vivekananda—Patriot and Prophet—Dr Bhupendranath Datta
A Concordance to Swami Vivekananda Vol I-III
God Lived with Them—Swami Chetanananda
You Will be a Paramahansa—Swami Sarbagatananda
Western Admirers of Ramakrishna and His Disciples —Dr Gopal Stavig

“ঈর্ষাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয়চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। ঈর্ষা থাকলে সর্বশক্তিমান ভগবানও কিছু করে উঠতে পারেন না।”

৩ মার্চ ১৮৯৪
শিকাগো থেকে ‘কিডি’-কে লেখা স্বামীজির চিঠি

“আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না ; কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর তার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই, তখন আমি বক্তৃতায় অগ্নি বর্ষণ করতে পারি।”

১৫ মার্চ ১৮৯৪
ডেট্রয়েট থেকে হেল ভগিনীদের কাছে লেখা

“হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিস দেয়—আমি গরীব—আমার আর কিছু নেই, কেবল শরীর, মন ও আত্মা আছে—এগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া করে এগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চলবে না।”

৩১ জুলাই ১৮৯৪
গ্রীন একার থেকে হেল ভগিনীদের কাছে লেখা

“আমার বন্ধুদের বলবে যাঁরা আমার নিন্দাবাদ করছেন, তাঁদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাটকেল মারতে যাই, তবে তো আমি তাদের সঙ্গে একদরের হয়ে পড়লুম।”

২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪
আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠি

“আমি বাঙলা দেশ জানি, ইন্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার একজন, কাজের বেলায় শূন্য।”

৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫
নিউ ইয়র্ক থেকে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে লেখা

"পরস্পরের সহিত বিবাদ ও পরস্পরকে নিন্দা করা আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। অলস, অকর্মণ্য, মন্দভাষী, ঈর্ষাপায়ণ, ভীরু এবং কলহপ্রিয় এই তো আমরা বাঙালি জাতি। ...বেকুবদের কথা মোটেই ভেবো না ; কথায় বলে বুড়ো বেকুবের মতো আর বেকুব নেই। ওরা একটু চেঁচাক না।"

২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৬
ফ্লোরেন্স থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা

"হিসেবের অভাবে...আমি যেন জোচ্চোর না বনি।"

১২ অক্টোবর ১৮৯৭
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠি

"অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নইলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে পারতুম রে।"

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮
শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে

"ভারতের অনেকে...ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে।"

১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯

"লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হলো—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া'—'হে শিব, হে শিব, আমার তরী পাড়ে নিয়ে যাও প্রভু।'

১৮ এপ্রিল ১৯০০
ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে

জন্মভিটেতে শরিকি সংঘাতের বিষবৃক্ষ

উনিশ শতকের ছয়ের দশকে বিস্ময়কর বিবেকানন্দের জন্মের সময় কেমন ছিল উত্তর কলকাতার জীবনযাত্রা? এ বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ নিজে তেমন কিছু বলে যাওয়ার সুযোগ পাননি, কিন্তু তাঁর মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বেশ কিছু বিবরণ রেখে গিয়েছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। কয়েকটি ছোট ছোট ছবি মনে রাখলে উত্তর কলকাতার ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটকে বুঝতে সুবিধে হতে পারে।

এখনকার অক্সফোর্ড মিশন ছিল কলুবাড়ি, তার পর হাড়িপাড়া। মহেন্দ্র গোঁসাই গলিটা ছিল ডোমপাড়া, মধু রায় গলি গয়লাপাড়া।

সিমলা থেকে জগন্নাথ ঘাট পর্যন্ত খুব উঁচু বাড়ি না থাকায়, দত্তদের ভিটেবাড়ির ছাদে উঠে জাহাজের মাস্তুল দেখা যেত।

ঘোড়ার গাড়ির প্রথা বেশ কম ছিল, মেয়েরা ঘোড়ার গাড়ি চড়ত না, বাবুরা গদি-বিছানায় শুয়ে পাল্কিতে অফিস-আদালতে যেতেন।

গৃহস্থবাড়িতে কাঠের জ্বালে রান্না হত। ১৮৭৬ সালে লোকের বাড়িতে প্রচারের জন্য বিনামূল্যে কয়লা বিতরণ হত। ক্রমে কয়লার দাম এক আনা মণ হল।

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে স্বামীজির ভিটেবাড়িতে ছিল তিনটে পাতকুয়ো—এই জল রান্নায় ব্যবহার হত। পাতকুয়োতে একটা কচ্ছপ ছিল। সেকালের কলকাতার অনেক বাড়িতেই কচ্ছপ জল পরিষ্কার রাখত। বাড়ির চাকররা হেদুয়া থেকে বাঁকে জল আনত। "আমরা মাধব পালের পুকুরে স্নান করতাম," লিখেছেন স্বামীজির মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ।

সেকালের কলকাতায় দারুণ শীত পড়ত। তাই শোওয়ার সময় এক মালসা আগুন ঘরে রাখা প্রয়োজন হত।

জামা পিরানের তেমন প্রচলন ছিল না, কমবয়সী ছেলেরা খালি গায়ে,

খালি পায়ে থাকত। নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার সময়ে পরতে হত চিনে কোট। বয়োজ্যেষ্ঠরা পরতেন বেনিয়ান।

গরমকালে লালদিঘি থেকে স্বামীজির ছোটকাকা অ্যাডভোকেট তারকনাথ দত্ত ঘোড়ার কম্বলে মুড়ে আমেরিকান বরফ আনতেন। গোঁড়া হিন্দুরা এবং বিধবারা এই বরফ খেতেন না।

সিমলে পাড়ায় বড় মাতালের উৎপাত ছিল। সেই জন্য প্রবাদ ছিল 'সিমলার মাতাল আর বাগবাজারের গেঁজেল'।

কলকাতার বিয়েবাড়িতে অনেক দুষ্ট লোক যেত, জুতো চুরি করত। সেই জন্য গৃহকর্তার সঙ্গে চাকরও যেত জুতো পাহারা দিতে।

শহরে লোকে দিনে আড়াই পোয়া চালের ভাত খেত, রাতে আধসের এবং উপযুক্ত পরিমাণ দুধ। দুধ পাওয়া যেত টাকায় দশ সের থেকে ষোলো সের।

নগর কলকাতার রাস্তায় দূরে দূরে শাল কাঠের থামেতে রেড়ির তেলের আলো জ্বলত—রাত্রে তেল চুরি হত এবং বাতিওয়ালা গালাগালি করত। রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হলে গৃহস্থরা যে-যার লণ্ঠন নিয়ে যেতেন।

সে-কালের গান : 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে, হরি ভজে কি হবে, চপ-কাটলেট, কোপ্তা খাও বাবা গবাগব, খাও বাবা গবাগব, হরি ভজে কি হবে?'

গৌরমোহন স্ট্রিটের দত্ত বাড়িতেও ঢেঁকি ছিল, পরে বন্ধ হয়ে যায়।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "আমাদের সময় আট নয় বৎসরের মেয়ের বিবাহ হইত।" বিয়ের আগে কাঁচা দেখার প্রথা ছিল। পরে শুভদিনে পাকা দেখা হত। 'কাঁচা দেখা' কথাটা এখন অভিধান থেকে মুছে গিয়েছে।

শহরের বৃদ্ধেরা অনেকে মাথা মুড়িয়ে শিখা রাখতেন। টেরি কাটার প্রথা ছিল না।

সব হিন্দু বাড়িতেই তুলসী গাছ রাখতে হত।

চাকররা গোঁফ রাখতে পারত না। পাইকরা কিন্তু সেই সুবিধা পেত।

৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ দত্তর জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ সোমবার সকাল ৬টা ৪৯ মিনিটে। শৈশব, বাল্য ও যৌবনলীলা এখানেই সাঙ্গ করে তেইশ বছর বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি প্রথমে বিবিদিষানন্দ, পরে কিছু সময় সচ্চিদানন্দ এবং অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দ।

নামকরা উকিলবাড়ির আদরের সন্তান, কিন্তু ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাসিন্দা নরেন্দ্রনাথের কৈশোর, বাল্য, যৌবনের কোনও ফটো কারও সংগ্রহে নেই। বিদেশিনী অনুরাগিণী মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড ভারতভ্রমণে এসে কোথাও নাকি কলেজের ছাত্র, তারুণ্যেভরা নরেন্দ্রনাথের একখানা ছবি দেখেছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ায় দত্তবাড়িতে হৃদয়হীন ইংরেজ পুলিশের এমন কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল যে সব ইতিহাস তছনছ হয়ে গিয়েছে। ফলে এখনকার চিত্রসংগ্রহে তাঁর প্রথম ছবিটি ২৩ বছর বয়সের সাধক নরেন্দ্রনাথের, কলকাতায় কাশীপুর উদ্যানবাটিতে তোলা ১৮৮৬ সালে। এই ছবিটি কেমনভাবে তোলা হল তার কোনও বিস্তৃত বিবরণ নেই।

পিতৃদেব বিশ্বনাথ ও মাতা ভুবনেশ্বরীর সংসার ছোট ছিল না। ভাই মহেন্দ্রনাথ ছিলেন নরেন্দ্রনাথের ছ'বছরের ছোট। তাঁর কাছে দত্তবাড়ির নানা নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর তুলনাহীন বর্ণনা : "গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল। বাড়ির অভ্যন্তর দেড় বিঘা ছিল এবং আশেপাশে অনেক জমিতে রেওয়ত ছিল। বাড়ির বর্ণনা বলিতে হইলে প্রথম ঠাকুরদালান হইতে আরম্ভ করিতে হয়। পাঁচফুকুরী ঠাকুরদালান পশ্চিমমুখী, অর্থাৎ ইহার পাঁচটি খিলান ও গোল ইটের থাম। ঠাকুরদালানের সম্মুখে বড় প্রাঙ্গণ। ঠাকুরদালানের উপরের দক্ষিণ দিকে দুইতলা বড় হলঘর। উত্তরদিকের ঘরটিকে 'বড় বৈঠকখানা ঘর' বলা

হইত। দক্ষিণ দিকে নীচের ঘরটিকে 'বোধন ঘর' বলা হইত এবং উপরকার ঘরটিকে 'ঠাকুরঘর' বলা হইত। তাহার পর বাহিরের উঠানে চকমিলান দালান ও ঘর। অন্দরমহলে দুইদিকে দুটি উঠান ছিল এবং পিছন দিকে কানাচ বা পুকুর ছিল।"

কেমন ছিল সেকালের দত্তবাড়ির খাওয়াদাওয়া? শুনুন ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের নিজের মুখে : "তখন কলকাতায় পাঁঠার মুড়ি বিক্রি হত না, আমরা পাঁঠাওয়ালাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলাম যে, তার দোকানে যে কটা মুড়ি থাকবে, আমাদের জন্যে রেখে দেবে। ...দশ বারোটা পাঁঠার মুড়ি, সের দুই আড়াই ওলন্দ কড়াইশুঁটি, এক সঙ্গে ফুটিয়ে একটা তরকারি হত। বিকেলবেলা স্বামীজি আর আমি স্কুল থেকে এসে, আমরা দু'জন ওই কড়াইশুঁটি দেওয়া ব্রেনের তরকারি দিয়ে, খান-ষোলো করে রুটি খেতুম।"

অনেক দিন পরে দক্ষিণেশ্বরের শরৎকে (স্বামী সারদানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশ দিলেন, নরেনকে দেখে আয়, "নরেন্দ্রনাথ কায়েতের ছেলে, বাপ উকিল, বাড়ি সিমলে"। ১৮৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে শরৎ ও ভ্রাতা শশী (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) বেলা আড়াইটার সময় ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে এলেন। পিতার মৃত্যুর পর ভুবনেশ্বরী পরিবারের শোচনীয় অবস্থা। "কেবল একখানি ভাঙা তক্তপোষ, একটা মাদুর ভাঁজকরা, ঘরের পশ্চিমদিকের তক্তপোষের উপর তুলা বের করা একটা গদি, দু'একটা ছেঁড়া বালিশ আর পশ্চিমদিকে একটা কালো মশারি পেরেকের উপর গুটান, কড়িকাঠ হইতে একটা টানা-পাখার ছেঁড়া ঝালর ঝুলিতেছে।"

এ বাড়ির ওপর দিয়ে তার পরে নানা সময়ে নানা রকম ঝড় বয়ে গিয়েছে। নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসী হলেন ১৮৮৬ সালে, বাড়ির শরিকি মামলা একটু আয়ত্তে আসবার পরেই তিনি পরিব্রাজক হলেন এবং ১৮৯৩-তে মুম্বই থেকে জাহাজে চড়লেন আমেরিকার উদ্দেশে। বিশ্বজয়ী হয়ে প্রথম দেশে ফিরলেন ১৮৯৭ সালে। আবার বিদেশ যাত্রা ১৮৯৯ সালে, শেষবারের মতো ফিরে এলেন ১৯০০ সালের ৯ ডিসেম্বর।

ইতিমধ্যে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে নানা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত খেতড়ির মহারাজের আর্থিক সাহায্য নিয়ে দাদাকে

অগ্রিম না জানিয়েই আচমকা হাজির হলেন লন্ডনে, উদ্দেশ্য ব্যারিস্টারি পড়বেন। নিজে কোথায় থাকবেন ঠিক নেই, এই অবস্থায় সহায় সম্বলহীন ভাইকে দেখে বিবেকানন্দ মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর ইচ্ছে ভাই ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমেরিকায় যান। অভিমানী মহেন্দ্রনাথ স্থির করলেন দাদার কাছে জাহাজ ভাড়া না নিয়ে পায়ে হেঁটেই ভারতে ফিরবেন। পদযাত্রায় বেশ কয়েক বছর লাগল। এই পর্যায়ে বাড়িতে তিনি কোনও চিঠি লেখেননি। ৪ জুলাই ১৯০২ সালে মহেন্দ্রনাথ বহু দেশ পেরিয়ে কাশ্মীরে, স্বামী সারদানন্দের কাছে দাদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দ্রুত ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে ফিরে এলেন।

জননী ভুবনেশ্বরীর কিন্তু জীবনে একবিন্দু শান্তি নেই। দারিদ্র ও শোকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কিছুদিন পরেই শুনলেন ছোট ছেলে ভূপেন্দ্রনাথ গোপনে দেশের বিপ্লব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছে। ১৯০৭ সালে রাজদ্রোহের অভিযোগে কলকাতার আদালতে ভূপেন্দ্রনাথের এক বছর জেল হল। সেখানে ঘানি টানতে হত, জেল খাটার পরে আবার আটক হবার আশঙ্কায় মায়ের অর্থানুকূল্যে এবং সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শে আত্মপরিচয় গোপন করে দেশ ছেড়ে প্রথমে আমেরিকায় চলে গেলেন ভূপেন্দ্রনাথ, মায়ের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। আমেরিকা থেকে ইউরোপে গিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনে রোমাঞ্চকর অংশ নিয়ে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দেশে ফেরেন ১৯২৫ সালে।

চিরদুঃখিনী ভুবনেশ্বরীর দেহাবসান হয় ২৫ জুলাই ১৯১১, মেনিনজাইটিস রোগে। শেষ নিঃশ্বাসের কয়েক ঘণ্টা আগে সুখদুঃখের নিত্যসঙ্গিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, শ্মশানেও উপস্থিত ছিলেন নিবেদিতা। প্রায় একই সঙ্গে দেহ রাখলেন দিদিমা রঘুমণি বসু, ভুবনেশ্বরী তাঁর একমাত্র সন্তান।

মহেন্দ্রনাথের দেহাবসান ১৪ অক্টোবর ১৯৫৬ সালে পূজার সময়। মহানবমীর দিনে গুরুতর অসুস্থ মহেন্দ্রনাথকে দেখতে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তবাড়িতে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এলেন। বিজয়া দশমীর রাত্রি ১২টা ৪২ মিনিটে মহেন্দ্রনাথের বিদায় মুহূর্তে ঘরের আলোটি হঠাৎ

ফিউজ হয়ে গেল এবং সেই সময়েই নিঃশব্দে চলে গেলেন অসামান্য ভ্রাতা ও অসামান্য লেখক মহেন্দ্রনাথ। স্বামীজির বংশের শেষ পুরুষ অকৃতদার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ওই একই বাড়িতে দেহ রাখলেন ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫। শেষ হল দত্ত পরিবারের ইতিহাস।

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দর জন্মভিটে যে শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় এই ভাবে রক্ষা পাবে, তা এ দেশে তাঁর অনুরাগীদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল মাত্র ক'বছর আগেও।

অসম্ভবকে সম্ভব করাটাই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের স্বভাব। তাঁরা আর একবার কাজটা করে দেখিয়ে দিলেন : স্বপ্ন থাকলে, প্রতিভা থাকলে, এবং বিশ্বাস থাকলে কপর্দকশূন্য অবস্থা থেকেও বড় কাজ সেরে ফেলা যায়। এগারো বছরের বেশি সময় ধরে যে-সন্ন্যাসী অশেষ ধৈর্য ও চরম দুঃসাহস মূলধন করে এই প্রচেষ্টার অন্যতম রূপকার হলেন, সেই স্বামী বিশোকানন্দ (পার্থ মহারাজ) বললেন, "আত্মনেপদের কোনও স্থান নেই, রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী হিসেবে যে দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তা পালন করা গেল বহু মানুষের, বহু প্রতিষ্ঠানের এবং বহু সরকারি সংস্থার অভূতপূর্ব সাহায্যে।"

নিজের কথা কিছুতেই বলবেন না এই কাজপাগল সন্ন্যাসী। শেষে অনেক চেষ্টায় বললেন, "১৯২৫ সালে ত্রিপুরা থেকে বেলুড় মঠে এলাম, তখনকার জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী আত্মস্থানন্দ বললেন, আমরা এত কাজ করছি, কিন্তু বিবেকানন্দের জন্মস্থান উদ্ধার করতে পারছি না। অথচ এটা আমাদের দায়। একটু উঠেপড়ে লাগো। সঞ্জীব মহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের নাম করে লেগে পড়া গেল। কাজটা শেষ পর্যন্ত হয়েও গেল।"

ভিটেবাড়ি পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টার শুরু কিন্তু আরও তিরিশ বছর আগে, স্বামীজির জন্মশতবর্ষে ১৯২৫-তে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে ইচ্ছাপ্রকাশ করা হয়, বাড়িটি অধিগ্রহণ করে স্মৃতিমন্দির করা হবে।

তখনকার জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ সেই কথা শুনে একটা পাল্টা প্রস্তাব দেন : শুধু ৩ নম্বর নয়, ১ থেকে ১০ নম্বর গৌরমোহন স্ট্রিট ও সিমলা স্ট্রিটের কিছু জমি নিয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে-যাওয়া বাড়িটিকে মেরামত করে আদি অবস্থায় ফিরিয়ে এনে মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, গবেষণাগার ইত্যাদি করা যেতে পারে।

পরে এক সময়ে রাজ্যসরকার জমি ও বাড়ি অধিগ্রহণের নোটিফিকেশন জারি করেন, কিন্তু বহুজন বিরক্ত হয়ে ওঠেন এবং আদালতের শরণাপন্ন হন। একটি সংস্থা বাধাদানে প্রধান ভূমিকা নিয়ে বলে, কিছুতেই আমরা অধিগ্রহণ করতে দেব না। পরিস্থিতি জটিলতর করার জন্য প্রশ্ন তোলানো হয়, রামকৃষ্ণ মিশন কেন? এখানে ন্যাশনাল মিউজিয়াম করতে হবে। সেই সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছু করা গেল না।

স্বামী বিশোকানন্দ বলছেন, "১৯২৫ সালে ভিটেবাড়ির মামলা তদ্বির করতে গিয়ে দেখলাম, যখনই সমস্যাটা একটা সিদ্ধান্তের পথে এগোয়, তখনই কোনো অদৃশ্য শক্তি অনেককে উসকে দিয়ে ব্যাপারটা বানচাল করে দেয়।" এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক দলের কেউ কেউ আছেন।

নিরাশ না হয়ে স্বামী বিশোকানন্দ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করলেন, মিশনের পরিকল্পনাটা কী তা ব্যাখ্যা করলেন। প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। বলা হল, আপনাদের বিকল্প জায়গা দেব। মুরারিপুকুরে ২৮টি ফ্ল্যাট তৈরি করা হল। সরকারি হাউজিং বোর্ড থেকেও ফ্ল্যাট নেওয়া হল এবং পুনর্বাসনের আলোচনা পুরোদমে চালু হয়ে গেল। পার্থ মহারাজ প্রথম যখন সিমলেপাড়ায় এসেছিলেন, "তখন বাড়ি তো দূরের কথা, গলিতেও ঢুকতে পারতাম না। জেদ চেপে গিয়েছিল। আমি যদি ফিরে যাই, আর হবে না।"

বহু চেষ্টায় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে একজন ভাড়াটিয়াকে নতুন বাড়িতে সরানো গেল, তাঁকে সরসুনাতে শকুন্তলা পার্কে জায়গা দেওয়া হল। "এই প্রথম ভিটেবাড়িতে দাঁড়াবার একটা জায়গা পাওয়া গেল।" স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে নিরন্তর আলোচনা চালালেন সন্ন্যাসীরা, আরও

ছ'জন বাসিন্দাকে পুনর্বাসনে রাজি করানো সম্ভব হল, এবং যে দিন তাঁরা উঠে যান, সে দিনই ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন কর্তৃপক্ষ সরকারি ভাবে মিশনকে তা দিয়ে দেন।

এক সময় স্বামীজির ভিটেবাড়িতে কী ছিল না? পানের দোকান, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, রেস্তোরাঁ, জ্যোতিষী, অসংখ্য সোনার দোকান, ছাপাখানা, দফতরিখানা, প্রকাশনা, লন্ড্রি, ডেকরেটর, সাইনবোর্ড পেন্টিং কোম্পানি, ব্লেড ফ্যাক্টরি, পেরেক ফ্যাক্টরি, পিচবোর্ড-বাক্স তৈরির ফ্যাক্টরি, লেদ মেশিন, জিংক প্লেট ফ্যাক্টরি, এমনকী একটা ক্লাব! স্বামী বিশোকানন্দ বললেন, "উপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য ৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি। ১৪৩টি পরিবার ও ব্যবসা সংস্থাকে অন্যত্র সরাতে হয়েছে। আর দেরি হলে বাড়িটাই ভেঙে পড়ত।"

যথাসময়ে রামকৃষ্ণ মিশন পরামর্শ ও সাহায্য নিলেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে সংস্থা এবং ডি সি পি এল নামক আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন কোম্পানির। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শ্রীমতী শান্তা ঘোষ একটি পয়সাও না নিয়ে সমস্ত কাজটি নিঃশব্দে করে দিলেন, যার আর্থিক মূল্য অন্তত এক কোটি টাকা।

স্বামী বিশোকানন্দ তাঁর মিশন সম্পন্ন করেও সম্পূর্ণ আড়ালে থেকে যেতে চান। বহু অনুরোধের পর তিনি শুধু বললেন, "এ সবই স্বামীজির কাজ, আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। এই সুযোগ পেয়ে আমরা কৃতার্থ।"

ভিটেবাড়ির কঠিনকর্ম সম্পন্ন করে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী বিশোকানন্দ নিঃশব্দে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট ত্যাগ করে ভিন্ন দায়িত্বপালনের জন্য অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটা নিয়ে যত আইনি লড়াই হয়েছে তার পুরো ইতিহাস খাড়া করলে মস্ত একখানা বই হয়ে যায়। উকিলবাড়ির ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত কলকাতার অ্যাটর্নি পাড়ায় শিক্ষানবিশি করলেও এবং আইনপড়া সম্পূর্ণ করলেও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় বসেননি এবং পরবর্তী

সময়ে ভাই মহেন্দ্রনাথকে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। তবু আইন তাঁকে ছাড়েনি এবং সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমার রাহু তাঁকে কীভাবে ঘিরে ধরেছিল তা এক নিতান্ত দুঃখজনক কাহিনি।

আপাতত আমরা শুধু তাঁর জন্মভিটের আইনি হাঙ্গামার খোঁজখবর করব যার বিস্তৃতি অর্ধশতাব্দীর অধিক কাল ধরে। যদি জন্মভিটের পুনরুদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সন্ন্যাসীদের কথা ধরা যায় তাহলে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে মামলা-মোকদ্দমার অবস্থিতি উনিশ, বিশ এবং একুশ শতাব্দী জুড়ে।

দেরেটোনার দত্ত পরিবারের যে মানুষটি (রামসুন্দর) মধু রায় লেনে বসবাস করতে এসে ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে অনেকখানি জমি-সহ বিশাল বসতবাড়ির পত্তন করলেন, তিনি প্রথমে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের ইংরেজ অ্যাটর্নির ম্যানেজিং ক্লার্ক এবং পরে ফার্সি আইনজীবী। আইনপাড়ায় উপার্জন করা প্রভূত অর্থ থেকেই দত্তদের এই ভিটেবাড়ির পত্তন।

রামমোহনের দুই পুত্র (দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ) ও সাত কন্যা। পঁয়ত্রিশ বছরে কালীপ্রসাদের অকালমৃত্যু কলেরায়, আর নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ নিতান্ত তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে সংসারবন্ধন ত্যাগ করে চলে গেলেও, ভিটেবাড়িতে প্রথম মামলার অনুপ্রবেশ ঘটল তাঁরই মাধ্যমে। সেই সময়ের হিন্দু আইন অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল, যার মোদ্দা কথা দুর্গাপ্রসাদ দত্ত নিরুদ্দিষ্ট, টানা বারো বছর তাঁর কোনও সন্ধান না পাওয়ায় আদালতে তাঁকে 'মৃত' ঘোষণা করা হোক।

সন্ন্যাসী হয়ে-যাওয়া দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিশ্বনাথ বি এ পাশ করে কিছু দিন ব্যবসা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে আইনপাড়ার অ্যাটর্নি অফিসে আর্টিকেলড ক্লার্ক হন এবং পরে হেনরি জর্জ টেম্পলের অ্যাটর্নি অফিসে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা ভুবনমোহন দাশ ওই অফিসে তাঁর সহকর্মী ছিলেন। পরে তিনি যে অ্যাটর্নি অফিস স্থাপন করেন

তার নাম ধর অ্যান্ড দত্ত।

অ্যাটর্নি হিসেবে বিশ্বনাথ প্রচুর যশ অর্জন করলেও, দত্তবাড়ির শরিকরা পরবর্তী কালের পারিবারিক মামলায় তাঁকে বেহিসেবি এবং আর্থিক সঙ্গতিহীন বলে অভিযোগ করেন। আমরা জানি বিবেকানন্দ-গর্ভধারিণীর দুঃখ ও নীরব বেদনা। বিশ্বনাথ একবার বলেছিলেন, "আমি এত টাকা রোজগার করি, আর আমার স্ত্রী পেট ভরে খেতে পায় না।"...বিশ্বনাথের অকালমৃত্যু ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ সালে, কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই শরিকি লড়াইয়ের সূচনা হয়ে যায়। এর প্রথম ইন্ধন জোগানো হয় ১৮৭৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর যখন অর্থের প্রয়োজনে দত্ত পরিবারের দুই নিঃসন্তান বিধবা অবিভক্ত ভিটেতে নিজেদের অংশ নরেন্দ্রজননী ভুবনেশ্বরীকে বেচে দেন। ভোলানাথ দত্তর বিধবা বামাসুন্দরী ও মাধব দত্তর বিধবা বিন্দুবাসিনী এর জন্যে যে পাঁচশো টাকা করে পেয়েছিলেন তা আসলে কার উপার্জিত টাকা এই নিয়ে পরবর্তী কালে মস্ত লড়াই আদালতে। নরেন্দ্রনাথের খুড়ো হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজ্ঞ তারকনাথ দত্তর বিধবা জ্ঞানদাসুন্দরী বনাম বিশ্বনাথ দত্তের বিধবা ভুবনেশ্বরী দাসীর আইনি লড়াই স্বামী বিবেকানন্দর অবশিষ্ট জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই মামলার আগেও ১৮৮০ সালে অবিভক্ত বাড়ির আর এক শরিক শচীমণি দাসী (গৌরমোহন দত্তের দৌহিত্রী) ভিটেবাড়ি বিভাজন মামলা এনেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টে যাতে অন্য সকলের সঙ্গে বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরীও ছিলেন প্রতিপক্ষ। পরের বছরে আদালতের নির্দেশে কলকাতার বিখ্যাত অ্যাটর্নি রবার্ট বেলচেম্বার্স সম্পত্তি বিভাজনের কমিশনার নিযুক্ত হন এবং চার বছর ধরে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে তিনি দত্তবাড়ির শরিকদের ভাগ ঠিক করে দেন। বেলচেম্বার্সের স্বাক্ষরিত ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের নকশাই পরবর্তী সময়ে বিবেকানন্দ ভিটের পুনরুদ্ধার ও সংস্কারে মঠ ও মিশনের খুব কাজে লেগে যায়।

নরেন্দ্রনাথের বাবা বিশ্বনাথ দত্তের অকালমৃত্যুর পরেই উকিল তারকনাথ ভুবনেশ্বরীর নামে কেনা সম্পত্তি তাঁর বেনামি সম্পত্তি বলে দাবি করতে থাকেন। ১৮৮৫ বড়দিনের সময় এই বাড়ির একটা অংশে

বাথরুম মেরামতির জন্য পুরনো দেয়াল ভাঙা নিয়ে ভুবনেশ্বরীর পরিবারের সঙ্গে তারকনাথ উত্তপ্ত কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়লেন। এই মামলায় যথাসময়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠেছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। হাইকোর্টে বিচারপতির নাম উইলিয়াম ম্যাকফারসন। নরেন্দ্রনাথ যখন সাক্ষ্য দেন (৮ মার্চ, ১৮৮৭) তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি লাভ করেছেন, তাঁর ত্যাগী সন্তানরা তখন তপস্যাদীপ্ত বরাহনগরের মঠবাসী। নিরুপায় নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে যেতেন পায়ে হেঁটে, আর ভুবনেশ্বরী যেতেন পাল্কিতে। নরেন্দ্রনাথের সাক্ষ্যের কিছু অংশ: "...কয়েক মাস পিত্রালয়ে থেকে আমার মা ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে ফিরে এসে দেখেন তাঁরই জমির একটা অংশে তারকনাথ দত্ত একটি পাকা ঘর তৈরি শুরু করেছেন।...ঘটনাস্থলে মায়ের পক্ষ নিয়ে আমি আপত্তি তুলেছিলাম।"

দীর্ঘ শুনানির পরে ১৪ মার্চ ১৮৮৭ হাইকোর্টের বিচারপতি ম্যাকফারলেনের সুচিন্তিত রায় প্রকাশিত হল। অভিযোগ প্রমাণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তারকনাথের বিধবা জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী। প্রমাণ হল, প্রয়াত বিশ্বনাথ প্রবাস থেকে নিয়মিত তাঁর স্ত্রীকে টাকা পাঠাতেন। বিপদ সাধল তারকনাথের এক পুরনো চিঠি, যেখানে এক আত্মীয়কে তিনি লিখছেন, সম্পত্তির প্রকৃত ক্রেতা তিনি নন, ভুবনেশ্বরী।

রায়ের বিরুদ্ধে যথাসময়ে আপিল করেছিলেন জ্ঞানদাসুন্দরী। তখনকার প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি আর্থার উইলসন ও জাস্টিস রিচার্ড টটেনহ্যামও ভুবনেশ্বরীর পক্ষে রায় দিলেন ১৫ নভেম্বর ১৮৮৭। কিন্তু জয় অত সহজ হলো না। শাখাপ্রশাখা মিলে এই মামলার রেশ চলল স্বামীজির জীবনের শেষ শনিবার পর্যন্ত—সেই সঙ্গে অজস্র অর্থব্যয় ও সীমাহীন যন্ত্রণা।

পিতৃহীন পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান, আবার বৈরাগ্যের কঠিন সাধনা, অসহনীয় এই টানাপোড়েনে নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর গুরুভাইদের অবিস্মরণীয় ভালবাসা ও সমর্থন। দুই গুরুভাই নরেনের টাকার অনটন মেটাবার জন্য বরাহনগর থেকে বালির স্কুলে গিয়ে মাস্টারি করতে চাইলেন। সে বড় করুণ কাহিনি। জীবনের শেষপর্বেও স্বামীজি তাঁর প্রিয়

গুরুভাইকে অনুরোধ করেছিলেন, 'রাখাল আমার শরীর ভাল নয়। শীগগিরই দেহত্যাগ করব। তুই আমার মার ও বাড়ির ব্যবস্থা করে দিস। তাঁকে তীর্থ দর্শন করাস, তোর ওপর ভারটি রইল।'

হাইকোর্টের রায়ের পরেও গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের মামলা কেমনভাবে পল্লবিত হয়ে তাঁর তিরোধানের দিন পর্যন্ত স্বামীজিকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল তার নানা নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং ইতিহাসের পাতায় পাতায়। হাইকোর্টে হেরে যাওয়ার পরে খুড়ি তাঁর অংশটি ৬ হাজার টাকায় স্বামীজিকে বেঁচে দেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে (মার্চ ১৯০২) সিস্টার নিবেদিতাকে স্বামীজি লিখলেন, "ইউরোপ থেকে সামান্য যে টাকা এনেছিলাম তা মায়ের দেনা শোধ এবং সংসার খরচে লেগে গেল। সামান্য যা রয়েছে তাতেও হাত দেবার উপায় নেই। ঝুলে থাকা মামলার জন্য লাগবে।"

বেলুড়ে স্বামীজির মহাসমাধি ৪ জুলাই ১৯০২। তার পাঁচ দিন আগে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের সমস্যা মেটাবার জন্যে স্বামীজি হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কয়েক জন শরিকের সঙ্গে স্বেচ্ছায় দ্বন্দ্ব মিটে গেল টাকার পরিবর্তে। দুই পক্ষের অ্যাটর্নি (পিন্টু কর ও এন সি বসু) খুব দ্রুত কাজ করলেন। কারণ, অপেক্ষা করবার মতো সময় আর স্বামীজির হাতে নেই। ২ জুলাই ১৯০২ মহাসমাধির দু'দিন আগে শরিক হাবু দত্ত ও তমু দত্তর দাবি স্বেচ্ছায় মিটমাট হয়ে গেল।

স্বামীজি কিছুটা স্বস্তি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলেও আইনের কালো মেঘ এরপরেও মাঝে মাঝে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

রাজনৈতিক অপরাধে কেউ আদালতে অভিযুক্ত হলে ভূপেন্দ্রনাথ অনেক সময় বাড়ির মালিক হিসেবে জামিনদার হতেন, একজন আসামি মামলা চলাকালীন উধাও হওয়ায় ভূপেন্দ্রনাথকে জামিনদার হিসেবেও জরিমানা দিতে হয়। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়ির অংশ বিক্রি করে সেই টাকা যে জোগাড় করতে হয়েছিল তা এই প্রজন্মে আমরা ভুলে গিয়েছি।

অবশ্বাস্য বিবেকানন্দকে বুঝতে গেলে তাঁর ভিটেবাড়ির আত্মীয়স্বজনদেরও যে বোঝা দরকার সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

স্বামীজির প্রাক্‌সন্ন্যাসজীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহও বেড়ে চলেছে। শৈশবে, কৈশোরে, বাল্যে ও যৌবনে কেমন দেখতে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত? কোথায় গেল আদিপর্বের আলোকচিত্রমালা? তাঁর মা, বাবা, ভাইবোন সম্পর্কে আমরা কেন আরও তথ্য সংগ্রহ করতে পারছি না, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে জর্জরিত হচ্ছেন বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-অনুসন্ধানীরা।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা পর্বের আগে নরেন্দ্রনাথের কোনো ফটো তোলা হয়নি তা মানতে মন চায় না। যেমন বিশ্বাস হতে চায় না যে সফল আইনজীবী ও দেশে দেশে পরিভ্রমণকারী, অভিজাতরুচি পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের কোনো ফটোগ্রাফ তোলা হয়নি। এ বিষয়ে দত্তপরিবারের ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য : সবই ছিল, কিন্তু সবই হারিয়ে গিয়েছে পারিবারিক বিরোধে ও বারংবার পুলিসি খানাতল্লাশিতে।

পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমা ও নরেন্দ্রনাথ দত্তের নিতান্ত আপনজনদের ভিটেবাড়ি থেকে আচমকা উৎখাতের প্রসঙ্গে যথাসময়ে আসা যাবে। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দর মহাসমাধির পরবর্তী দশকে ইংরেজ পুলিসের বিষদৃষ্টিতে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তভিটেতে বহুবার তল্লাশি চলে এবং শাসকরা প্রতিবারই দেওয়ালের ছবি থেকে ট্রাঙ্কের কাগজপত্র, কাপড়চোপড় সব বাজেয়াপ্ত করে সঙ্গে নিয়ে যান।

এই অত্যাচারের ফলে ঐতিহ্যমণ্ডিত দত্ত পরিবারের অনেক নিদর্শন নষ্ট হয়েছে, বিবেকানন্দ ভিটেতে কাঠের দরজা জানলা, ইটের দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে এবং ছাদ ছাড়া আর কিছুই অতীতের ধারাবাহিকতা বহন

করছে না। এবাড়ির যা কিছু খবরাখবর তা সংগ্রহ হয়েছে মানুষের স্মৃতিকথা থেকে এবং মূল্যবান আদালতি রেকর্ড থেকে।

দত্তপরিবারের শরিকি লড়াই প্রায় মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত স্বামীজিকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। কখনও প্রায় দেউলিয়া, কখনও সর্বস্বান্ত হয়েছেন দত্ত নামধারী পুরুষ ও মহিলারা। কিন্তু সব অমঙ্গলেরই একটা মঙ্গলময় দিক থাকে। স্বামীজির আপনজনদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন আদালতি সূত্র থেকেই অনুরাগীরা উদ্ধার করতে পেরেছেন।

তবু যতটুকু জানা গিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য এখনও অজানা থেকে গিয়েছে স্বামীজির গর্ভধারিণী জননী, পিতৃদেব এবং আত্মঘাতিনী বোনদের সম্পর্কে। ভাইদের সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু জানি আবার অনেককিছু জানি নাও বটে। জননী ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে আজও কৌতূহলের বিরাম নেই—বহুযুগ আগের দুই ভুবনবিদিতা জননী শঙ্করাচার্যমাতা ও চৈতন্যজননী সম্পর্কেও ভক্তজনের একই ধরনের ব্যাকুলতা।

সুদূর প্রবাসেও স্বামীজি তাঁর গর্ভধারিণী জননী সম্পর্কে মাঝে মাঝে কিছু হৃদয়গ্রাহী মন্তব্য করেছেন। স্বামীজির বিদেশিনী অনুরাগিনীরাও তাঁদের গুরুদেবের জননীকে মার্কিনদেশ থেকে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন।

ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে প্রাচীনতম নিদর্শনটি হল কলকাতা হাইকোর্টের কাগজপত্রে একটি বাংলা সই, যা দেখে বোঝা যায় তাঁর হস্তলিপি খুবই সুন্দর ছিল। আমরা জানি তিনি মেমদের কাছ থেকে ইংরিজি পাঠ নিয়েছিলেন এবং বড় ছেলেকে ইংরিজি শিখিয়েছেন। পরবর্তীকালে সাগরপারের কয়েকজন ভক্ত ও ভক্তিমতীর সঙ্গেও তিনি ইংরিজিতে কথা কইতেন, কিন্তু তাঁর ইংরিজি লেখার কোনো নিদর্শন আজও উদ্ধার হয়নি। এতোদিন বিবেকানন্দ-জননীর একটিমাত্র আলোকচিত্রই ছিল ভরসা। স্বামীজির দেহাবসানের পর বিদেশিনীদের অর্থে সিস্টার নিবেদিতা এই ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভুবনেশ্বরী দেবী ও নিতান্ত আদরের একমাত্র সন্তানের ভাগ্যবিপর্যয়ে সর্বদাকাতর বিবেকানন্দমাতামহী রঘুমণি দেবীর আলোকচিত্র মনে হয় একই সময়ে তোলা হয়েছিল।

অতিসম্প্রতি বিবেকানন্দ গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দাসীর দ্বিতীয় একটি ছবি অধ্যাপক শ্রীসুজিত বসুর সৌজন্যে আমাদের নজরে এসেছে। নির্মম দারিদ্র্য, বিচ্ছেদ, আত্মীয়দের অপমান ও অকালমৃত্যুতে জর্জরিত বিবেকানন্দজননীর এই হৃদয়বিদারক ছবিটি ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায় সম্পাদিত স্বরাজ পত্রিকায় বৈশাখ ১৩১৪ প্রকাশিত হয়েছিল।

স্বরাজ পত্রিকায় লেখা হয়, "আমরা নরেন্দ্রের মাতার চিত্র দিলাম। নরেন্দ্রের মাতা রত্নগর্ভা। মা—অমন রত্ন হারাইয়াছেন। হারাইয়াছেন কি—ব্যবহারতঃ হারাইয়াছেন—পরমার্থতঃ হারান নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সুতের চরিত্রসৌরভে ভারত আমোদিত। আহা—মায়ের ছবিখানি দেখ—দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে নরেন্দ্র মায়ের ছেলে বটে—আর মাতা ছেলের মা বটে।"

দুঃখের বিষয় ভুবনেশ্বরী দেবীকে লেখা অথবা তাঁর নিজের হাতে পুত্রকে লেখা কোনো চিঠি এখনও সংগৃহীত হয়নি। আমরা জানি, মধ্যমপুত্র মহেন্দ্রনাথ ভাগ্যসন্ধানে বিদেশে গমন করে অজ্ঞাত কারণে বহু বছর অদৃশ্য হয়েছিলেন এবং দীর্ঘসময় ধরে পদব্রজে বহুদেশ ভ্রমণ করে স্বামীজির দেহাবসানের কয়েকদিন পরে কলকাতায় ফিরে আসেন। চার-পাঁচবছর মাকে একখানাও চিঠি না লিখে মহেন্দ্রনাথ তাঁর মা ও নরেন্দ্রনাথের উদ্বেগ যথেষ্ট বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু স্বামীজির মাতৃঅনুরাগের কথা তো আমাদের অজ্ঞাত নয়। দীর্ঘকাল স্বদেশ ও বিদেশের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে নিজের মাকে তিনি কখনও কোনো চিঠি লেখেননি তা ভাবতে ইচ্ছে করে না। প্রকৃত ঘটনা যাই হোক, মহেন্দ্রনাথ বা তাঁর ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ কোথাও দাদার লেখা কোনো চিঠির উল্লেখ করেননি। যতদূর জানা যায়, স্বামীজির দিদি স্বর্ণময়ীও এবিষয়ে কোনো মন্তব্য রেখে যাননি, স্বামীজির দেহাবসানের তিনদশক পরেও (১৯৩২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) তিনি কিন্তু বেঁচে ছিলেন। স্বামীজির দিদির ক্ষেত্রে একটু নাম বিভ্রাটও আছে, মৃত্যু-রেজিস্টারে তিনি স্বর্ণবালা, আবার কোথাও স্বর্ণলতা।

স্বামীজিরা ছিলেন দশ ভাইবোন (নরেন্দ্রনাথ ষষ্ঠ সন্তান), এঁদের

পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তের কোনো ছবি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। থাকার মধ্যে এই ইংরিজি সই, তারিখ ২৩ নভেম্বর ১৮৬৮, ওইদিন অ্যাটর্নি 'দত্ত অ্যান্ড ধর' প্রতিষ্ঠার দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী

নরেন্দ্রজননী ভূবনেশ্বরী ইংরিজি জানতেন, কিন্তু মুক্তোর মতন হস্তাক্ষরে সই করতেন বাংলায় স্বামীর মৃত্যুর পরে, পাওনা টাকা আদায়েব জন্য আবেদন করে তিনি কলকাতা হাইকোর্ট থেবে অনুমতিপত্র পান।

সম্বন্ধেও আজও অনেক কিছু অজানা। আমরা বিশ্বনাথ দত্তের প্রথমপুত্র ও দুই কন্যার নাম জানি না। সন্ধানকারীদের মন্তব্য : নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় এদের নামকরণ হয়নি, অথবা নামকরণ হলেও নামগুলি আমরা এখনও সংগ্রহ করতে সমর্থ হইনি। তার থেকেও যা দুঃখের, অন্য ভগ্নীদের প্রায় কোনো খবর হাতের গোড়ায় নেই। পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তর আকস্মিক প্রয়াণের সময় কন্যারা বিবাহিতা কি না তাও আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

প্রথম যুগের ইংরিজি বিবেকানন্দ-জীবনীতে বিশ্বনাথের পারলৌকিক কাজ শেষ করে নরেনের বাড়ি ফেরার বর্ণনা আছে। এই বিবরণ থেকে আন্দাজ হয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ তখন যেমন নিতান্তই শিশু তেমনই ভগ্নীদের কেউ কেউ অবিবাহিতা।

পরবর্তীসময়ে এদের বিবাহে কে কী ভূমিকা গ্রহণ করলেন, কোথা থেকে বিবাহের অর্থ এলো তাও অস্পষ্ট। আরও যা আলো-আঁধারিতে ভরা, তা হলো একজন নয়, দুই বোনের নিতান্ত অল্পবয়সে স্বামীগৃহে দুঃখজনক অকালমৃত্যু। এঁদের একজন যে ছোটবোন যোগীন্দ্রবালা তা জানা যায়, তিনি যে কলকাতা সিমলা অঞ্চল থেকে সুদূর সিমলা পাহাড়ের পতিগৃহে আত্মঘাতিনী হন তাও স্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় আত্মঘাতিনী ভগ্নীর প্রকৃত বিবরণ এখনও রহস্যময়।

এক নজরে বিশ্বনাথ-ভুবনেশ্বরীর পরিবারের ছবি আঁকার সময় আমরা আরও কিছু বিবরণ উপস্থাপন করব। সংসারত্যাগের পরে এবং বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনের আগে গৈরিক বেশধারী নরেন্দ্রনাথকে যে কখনও ভিটেবাড়িতে দেখা যায়নি এমন ইঙ্গিত রয়েছে, তবে দিদিমা রঘুমণি বসুর ৭ রামতনু বসু লেনের বাড়িতে যে বেশ কয়েকবার গুরুভাই ও শিষ্যদের নিয়ে স্বামীজি এসেছেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

চরম অর্থনৈতিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের সময় বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ভুবনেশ্বরীর আশ্রয়স্থল এই রামতনু বসু লেনের পিত্রালয়। অল্পবয়সে বিধবা হওয়া অসহায়া মেয়ের পাশে সারাজীবন দাঁড়াতে গিয়ে দিদিমা রঘুমণি বসু বড়ই কষ্ট পেয়েছেন। অসহায় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে

আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রে স্বামীর ভিটেবাড়ি থেকে বিতাড়িতা হয়ে ভুবনেশ্বরী তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছেন স্নেহময়ী মায়ের কাছে। আদরিনী কন্যার মৃত্যু তারিখ.ডেথ রেজিস্টার অনুযায়ী ২৫ জুলাই ১৯১১। অভাগিনী কন্যাকে আগে সব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে পাঠিয়ে দিয়ে, তার ঠিক দু'দিন পরে ২৭ জুলাই ১৯১১ স্বামীজির দিদিমা রঘুমণি বসু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

উত্তর কলকাতায় ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দর ভিটেবাড়ির শেষ উল্লেখযোগ্য বাসিন্দা, কনিষ্ঠভ্রাতা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জীবনসায়াহ্নে তাঁর বাংলা বইতে একটি ছোটখাট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গিয়েছেন।

স্বামীজির জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথের ইংরিজি বই 'স্বামী বিবেকানন্দ পেট্রিয়ট-প্রফেট' বইতে জলঘোলা নেই, কিন্তু বাংলা রচনা 'স্বামী বিবেকানন্দ' বইতে দরিয়াটোনার দত্ত বংশের পরিচয় দিতে-দিতে এবং পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্ত সম্পর্কে বলতে-বলতে তিনি যে গোপন পারিবারিক তথ্য ফাঁস করেছেন, তার মর্মার্থ হল, স্বামী বিবেকানন্দের পরমপ্রতিভাবান পিতা অকালমৃত বিশ্বনাথ দত্ত 'সুলোচনা' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যা সেকালের পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। বহুদর্শী নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার কিছুটা গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরীর কাছ থেকে জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন—তাঁর জননী যে কবিতা রচনা করতেন তা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই জানি, কিন্তু পিতৃদের বিশ্বনাথ দত্তের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে তেমন কোনো ইঙ্গিত অনুরাগী মহলে ছিল না, যদিও নানা ভাষায় বিশ্বনাথের ব্যুৎপত্তি ও গ্রন্থপ্রেম কারুর অজানা ছিল না।

'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ১০১ পাতায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর পিতৃদেব সম্বন্ধে লিখেছেন : সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল

অপরিসীম। 'সুলোচনা' নামে একটি বাংলা উপন্যাস তিনি রচনা করেছিলেন।

এর পরেই বিস্ফোরণ। তাঁর নিজের আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিল না বলে জ্ঞাতিখুড়ো শ্রী গোপালচন্দ্র দত্তের নামে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

'সুলোচনা' সম্পর্কে এই ধরনের চাঞ্চল্যকর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরে কয়েকদশক অতিবাহিত হলেও স্বামীজি সম্পর্কে গবেষকরা কেন এই বইটি সম্বন্ধে তেমন অনুসন্ধান করলেন না তাও বিবেচনার দাবি রাখে।

প্রকাশিত হওয়ার পরে "পাঠক সাধারণ কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত" 'সুলোচনা' পরবর্তীকালে দুষ্প্রাপ্য হলেও দুর্লভ নয়। স্বদেশে ও বিদেশে যেখানেই ঊনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের সংগ্রহ আছে সেখানকার গ্রন্থতালিকায় এই উপন্যাসের নাম রয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন "১৮৮০ খৃষ্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।" কিন্তু কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে দেশবিদেশে খোঁজখবর করতে গিয়ে বিলেতে যে বাংলা বইয়ের হদিশ পাওয়া গেল তার প্রকাশ কলকাতায়, সময় ১৮৮২, বাংলা সন ১২৮৯।

তখনকার কলকাতায় প্রকাশিত বাংলা গল্প-উপন্যাসে একটা ইংরিজি ও একটা বাংলা ফ্লাই-লিফ থাকতো। ইংরিজি টাইটেল-পেজ অনুযায়ী বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮৮২। প্রকাশক ২৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বি ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং। বাংলা ফ্লাইলিফে বি ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং হয়েছেন বি. বানুর্জি কোম্পানি। ব্যানার্জি পদবীটির উচ্চারণ ও বানান নিয়ে বাংলা ও ইংরিজিতে যে দীর্ঘকাল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার অকাট্য প্রমাণ।

'সুলোচনা' উপন্যাসের শেষপ্রান্তে উল্লেখ : "কলিকাতা বারাণসী ঘোষ স্ট্রিটে ৬৯ বাটীতে হিতৈষী যন্ত্রে শ্রী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।"

'সুলোচনা' উপন্যাসের টাইটেল পেজে আরও কিছু খবরাখবর আছে। সেকালের বইতে মূল নামের সমর্থনে ও ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় একটি নাম দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল না। এক্ষেত্রে লেখা হয়েছে : 'সুলোচনা অথবা আদর্শ ভার্য্যা'। ইংরিজিতে : 'সুলোচনা দ্য এগজেমপ্লরি ওয়াইফ'।

সুলোচনা

অথবা

আদর্শ ভার্য্যা।

———⁘———
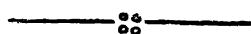
(বঙ্গবাসীদিগের সংসারিক ব্যবহারাবলম্বিত উপন্যাস।)

শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত প্রণীত।

কলিকাতা।

বি. বানুর্জ্জি কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত।

২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সন ১২৮৯ সাল।

মূল্য এক ১, টাকা। ডাকমাশুল ৵০ আনা।

আত্মীয়ের নামে লেখা পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তের উপন্যাসের টাইটেল পেজ।

ইংরিজি পরিচয়পত্রে আরও ব্যাখ্যা আছে : 'এ স্টোরি অফ বেঙ্গলি ফ্যামিলি লাইফ'—বাংলা করলে দাঁড়ায় : 'বাঙালির পারিবারিক জীবন নিয়ে একটি কাহিনী'। কিন্তু দ্বিতীয় বাংলা টাইটেলে উপন্যাসের লেখক সাহস করে আরও একটু এগিয়ে গিয়েছেন : 'বঙ্গবাসীদিগের সংসারিক ব্যবহারাবলম্বিত উপন্যাস'। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে আড়াই শ পাতার উপন্যাসের মূল্য এক টাকা, সেই সঙ্গে সেকালের ডাক খরচ সম্বন্ধেও একটা ধারণা পাওয়া যাচ্ছে : 'ডাকমাশুল ০/. আনা।' 'পোস্টেজ 2 annas।'

পরবর্তী প্রশ্ন স্বভাবতই 'শ্রী গোপালচন্দ্র দত্ত প্রণীত' ব্যক্তিটি কে? মুলপরিচয়ে পৌঁছবার আগে ভূপেন্দ্রনাথের বইতে দরিয়াটোনার দত্ত পরিবারের যে বংশলতিকা দেওয়া হয়েছে তার দিকে নজর দিলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের ভিটেবাড়ি প্রসঙ্গে আমরা জানি নরেন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ দক্ষিণরাঢ়ী কাশ্যপ গোত্র রামনিধি দত্ত তাঁর পুত্র রামজীবন ও পৌত্র রামসুন্দরকে নিয়ে বর্ধমান জেলার দরিয়াটোনা থেকে কলকাতায় চলে আসেন।

এই রামসুন্দর দত্তের পাঁচপুত্র—রামমোহন, রাধামোহন, মদনমোহন, গৌরমোহন ও কৃষ্টমোহন। জ্যেষ্ঠ রামমোহন দত্তই ভুবনবিদিত স্বামী বিবেকানন্দর প্রপিতামহ। কনিষ্ঠ কৃষ্টমোহনের সেজ ছেলে গোপালচন্দ্র ; অতএব শরিকী সম্পর্কে গোপালচন্দ্র হলেন নরেন্দ্রনাথের পিতৃদেব বিশ্বনাথের খুড়ো বা কাকা।

এই প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের রচনা থেকে বেশ কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি। বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদের অনুসন্ধিৎসা নিয়ে গ্রন্থরচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ একসময় সিমুলিয়া দত্তদের আদি কুলগুরু আন্দুল-মৌরীর শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারাপ্রসন্নবাবু তখন ভূপেন্দ্রনাথকে জানান যে তাঁর মাতৃদেবী গোপালচন্দ্র দত্তকে দেখেছিলেন। আরও জানান, তাঁদের শিষ্যবংশের খাতায় রামনিধির প্রপৌত্র মদনমোহনের নাম পাওয়া যায়, সন ১২৬৩ (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ)। ভূপেন্দ্রনাথের মন্তব্য, এই তারিখটি একটু

গোলমেলে, কারণ ভিটেবাড়ির পার্টিশন মামলার কাগজপত্রে মদনমোহনের মৃত্যু তারিখ ১৮৪৩ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানে অবশ্য এই মতপার্থক্যের তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

আমরা এখন জানতে চাই উপন্যাসের টাইটেল পেজে উল্লিখিত গোপালচন্দ্র সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য। স্বামীজির ছোটভাই আমাদের হতাশ করেননি। তিনি একই বইতে জানিয়েছেন, "গোপালচন্দ্র দত্ত একজন বিদ্বান ও যশস্বী জননায়ক হয়েছিলেন।"

আরও খবর, গোপালচন্দ্র ডাকবিভাগে বড় পদে চাকরি করতেন এবং চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি কৃষ্ণদাস পালের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর হন। গোপালচন্দ্র বেথুন সোসাইটির শুরু থেকে আজীবন সভ্য ছিলেন এবং ১০ নভেম্বর ১৮৫৯ থেকে ২০ এপ্রিল ১৮৬৯ প্রায় দশ বছর সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, গোপালচন্দ্র ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ বেথুন সোসাইটীতে 'বাংলার শিক্ষিত শ্রেণী—তাঁদের অবস্থা ও দায়িত্ব' সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

গোপালচন্দ্রের বড় জ্যাঠামশাই রামমোহনের দুই পুত্র ও সাতকন্যা। পুত্রদের নাম দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। এই দুর্গাপ্রসাদই বিশ্বনাথের পিতা এবং পরবর্তীকালে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। পরবর্তীকালে বারাণসীতে তিনি নাকি কোনো মঠের অধ্যক্ষ হন।

আরও একজন সন্ন্যাসীর নাম দেখা যায় দত্তদের বংশলতিকায়, তিনি গোপালচন্দ্রের দাদা নবীনের বড় ছেলে—আদালতি বংশলতিকায় এঁর নামোল্লেখ নেই। বলা হয়েছে, এঁর ছোটভাই নীলমণি।

সন্ন্যাসের প্রতি দত্তপরিবারের আসক্তি সম্পর্কে উল্লেখ প্রয়োজন এই কারণে যে 'সুলোচনা' উপন্যাসেও ঘুরে ফিরে এক সন্ন্যাসীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অঙ্কিত হয়েছে। কাহিনীতে এঁর নাম স্পষ্ট নয়। "সন্ন্যাসী কহিলেন—আমার নাম জানিবার আর আবশ্যক কি, আমার সাংসারিক নাম আমি ত্যাগ করিয়াছি। এখন আমার সম্প্রদায়ী উদাসীনেরা আমাকে অঘোরস্বামী বলিয়া ডাকে।"

'সুলোচনা' উপন্যাসে অঘোরস্বামীর ভূমিকা এতোই নাটকীয় ও অপ্রত্যাশিত যে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে উপন্যাসের সাসপেন্স নষ্ট করতে চাই না। তবে এই চরিত্রটির পিছনে সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদের পুত্র, বিবেকানন্দের পিতা ঔপন্যাসিক বিশ্বনাথের যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমর্থন রয়েছে সেবিষয়ে কোনোরকম সন্দেহের অবকাশ নেই। তাৎক্ষণিক কৌতূহল নিবারণের জন্য বিশ্বনাথের রচনা থেকে সামান্য একটু নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

"কর্ম ভিন্ন কেবল চক্ষু মুদিয়া ভাবনায় কোন ফল নাই। কর্মের অর্থ অনেক। কেবল আপন শরীরকে যাতনা দেওয়া কর্ম নহে। সংসারের সুখোন্নতি, পরের ইষ্টসাধন ও অন্যায়, অনিষ্টসাধন হইতে বর্জিত থাকা, নিজের শরীর পালন ও শরীর পবিত্র রাখা, ক্ষুৎপীড়িতের ক্ষুধানিবৃত্তি, তৃষ্ণাতুরকে স্নিগ্ধবারি দান, শীতপীড়িতকে বস্ত্র দান, নগ্নভিক্ষুকের লজ্জা নিবারণ, রোগীর রোগের সেবা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান—এই সকল কর্ম।

"যাঁহারা এই রূপ কর্মসাধন করিতে যত্ন পান না তাঁহাদের ঈশ্বরধ্যানের অধিকার নাই। তাঁহাদিগের ঈশ্বর আরাধনা লৌকিক আড়ম্বর মাত্র। অনেকে ধর্মের জন্য এক কপর্দক ক্ষতি স্বীকার করেন না—কোন অংশে এক তিল বিলাস ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকেন না—কোনো আকাঙক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন না ও ত্যাগ করিবার চেষ্টাও পান না—তাঁহাদিগের ধর্মের ভেক ধারণ করা শঠতার রূপান্তর মাত্র।

"আবার আর এক শ্রেণীর প্রবঞ্চক আছেন তাঁহাদিগের মুখে দিবানিশি ধর্মসম্বন্ধীয় কাহিনী শুনিতে পাইবে। ইহাদিগের ধর্মালোচনা কেবল নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ ও নিজের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রাখিবার উপায়ন্তর মাত্র। ইহাদিগের ধর্মকথনের এই পর্যন্ত উপকার দৃশ্য হয় যে ইহারদ্বারা প্রকাশ পায় যে কত প্রকার সুললিত ভাষায় কত প্রকার সুযুক্তি দেখাইতে পারা যায় ও এক এক লোকের কি পর্যাপ্ত বচননিপুণতা আছে ও তাহারা কত প্রকার বাক্যপ্রণালী প্রয়োগ করিতে পারে।"

উপন্যাসের আরও একটি বক্তব্যের ওপর আলোকপাত প্রয়োজন হতো

না যদি না স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী পিতামহের বৈরাগ্যময় জীবন সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই অবহিত হতাম।

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সুরথনাথ প্রশ্ন করিলেন, "দিবানিশী ভজন সাধন করিলেই কি মনুষ্যের মুক্তি সম্ভাবনা, না তাহার সহিত আর কোন কর্তব্যকর্ম আছে?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"বাপু এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া অসাধ্য। মনুষ্যের যে প্রণালীতে জন্ম তাহাতে তাঁহার জন্মদাতার ও গর্ভিণীর শারীরিক ও মানসিক ও ধর্ম নৈসর্গিক গুণসমুদয় তাঁহাতে বর্ত্তায়। সত্যপরায়ণ, নির্লোভী নিরাকাঙক্ষী হিংসাদ্বেষ কাম ক্রোধ শূন্য হইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করেন না। এই রিপুগুলির বীজ তাহার শোণিতে মিশ্রিত আছে এবং সংসারে থাকিয়া তাহা অন্যের সংসর্গে এবং পৃথিবীর ব্যবহার দেখিয়া দিন দিন উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

"কি সংসারী কি ব্রহ্মচারী সকলেরই এক অনাদি পবিত্র আত্মার চিন্তা কর্ত্তব্য যেহেতুক তদ্দ্বারা কেবল নিজের প্রত্যক্ষ মঙ্গল সাধন হইবে তাহা নহে, মনুষ্যের আত্মা অত্যুৎকৃষ্ট সুনির্মল পবিত্র আত্মার আদর্শ দেখিয়া সেই উচ্চতা কালে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু মনকে পবিত্র করা, রিপু সমুদয়কে কোমল করিয়া নিয়মাধীনে রাখা, এক জন্মের কর্ম, এটী এক দিনের কর্ম নহে, এক বৎসরের কর্ম নহে কিছু কাল অধ্যবসায়ের সহিত অভ্যাস করিলে হয় ত সিদ্ধ হওয়া যায়, হয় ত হওয়া যায় না।

"যেমন রোগীকে ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্বে তাহার শরীর অন্তর্গত মলমূত্রাদি নিষ্কৃতি করিতে হয়—যেমন দেবদেবীর অর্চনার পূর্বে একটি পবিত্র বেদি নির্মাণ করিতে হয় তেমনি ঈশ্বর আরাধনার পূর্বে মনকে পরিশুদ্ধ করা সত্যপরায়ণ হওয়া কপটতা ত্যাগ করা সাংসারিক কৌশল বর্জিত হওয়া আবশ্যক। সাংসারিক সুখে কিছুমাত্র বঞ্চিত হইব না অথচ সময়ে এক এক বার চক্ষু মুদিত করিব—সে উপাসনা নহে—এবং যে সেই রূপ উপাসক সে ঈশ্বরের নামে আপন সৃষ্ট কোন দেবতার আরাধনা করে।

"অপবিত্র মনে অপবিত্র চিত্তে কি প্রকারে পবিত্র নির্মল আত্মার আরাধনা করা সাধ্য। কি উপায়ে অর্জ্জিত অর্থের আগমন হইবে—কাহার স্থাপ্য

হরণ করিব—কাহাকে প্রলোভন দর্শাইয়া নিজাধীনে আনিয়া তাহার সর্বস্ব হস্তগত করিব—যাঁহার অহর্নিশ এই চিন্তা—যিনি নিজ বিলাস ভোগে অধীর হইয়া অন্যকে স্ত্রী কন্যা লইয়া সংসার করিতে দেন না—যিনি ঐহিক পদমর্যাদা, প্রভুত্ব আকাঙক্ষায় মুগ্ধ হইয়া কোন প্রবঞ্চনা প্রতারণা মিথ্যা কল্পনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, তিনি কি ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারেন? সংসারে থাকিলেই কুক্রিয়াতে রত হইতে হইবে এটি সাংসারিক লোকের ছল মাত্র।"

সুলোচনা নিয়ে বিশেষ কৌতূহলের কারণ, এই উপন্যাসে বিবেকানন্দ-পিতৃদেব বিশ্বনাথ কিছু ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশ্বনাথ দত্তের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আমরা অন্যান্য সূত্র থেকে তেমন কিছু জানতে না পারায় সুলোচনা উপন্যাসটিই আমাদের প্রধান ভরসা।

এই উপন্যাসের অন্দরমহলে প্রবেশের আগে একটা কথা স্মরণ রাখা ভাল যে লেখকের ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতা প্রায়ই গল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। কখনও কখনও মনে হয়, প্রত্যেক উপন্যাসই একধরনের আত্মজীবনী, কখনও লেখকের জ্ঞানত এবং প্রায়ই অজ্ঞানত। ইদানিং তাই ব্যক্তিজীবনের চাবিকাঠি খুলে উপন্যাসের অনালোকিত গর্ভগৃহে প্রবেশের চেষ্টা শুরু হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের সমস্ত ঘটনাবলী যে উপন্যাস লেখক সরলভাবে নকল করে যান তা নয়, কখনও কখনও অতিসাবধানে লেখক তাঁর আত্মজীবনকে লুকিয়ে রাখতেও সচেষ্ট হন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিটি যেন তাঁর ছায়া। কখনও সামনের, কখনও পিছনের, কখনও পাশের। নিষ্ঠুর সত্যটি হল কেউ কখনও তার নিজের ছায়াকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন না।

এইভাবে চিন্তা করে সুলোচনা উপন্যাসের পাঠোদ্ধার করলে কি স্বামীজির পিতামহ (দুর্গাপ্রসাদ), পিতামহী শ্যামাসুন্দরী, পিতা বিশ্বনাথ,

মাতা ভুবনেশ্বরী, পিতামহের ভাই কালীপ্রসাদ, পত্নী বিশ্বেশ্বরী, তাঁদের পুত্র তারকনাথ ও পুত্রবধূকে ছায়াচিত্রর মতন খুঁজে পাওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বহু উপন্যাস সত্যঘটনার কার্বন কপি না হয়েও, প্রকৃত ঘটনাস্রোতের গতিরেখা নিশ্চিতভাবে এঁকে যায়।

বহুক্ষেত্রে এই ধরনের অনুমানের কোনো মানে হয় না। কিন্তু যেখানে উপন্যাসের লেখক স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দর পিতৃদেব এবং দত্তদের শরিকি মামলার নথিপত্রের বাইরেও ভিটেবাড়িতে এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা চলমান ছিল এবং যেখানে এক যুগনায়ক ভূমিষ্ঠ হয়ে শৈশব, বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করেছিলেন সেখানে ভক্তদের, অনুরাগীদের ও দুনিয়ার সংখ্যাহীন মানুষের সীমাহীন কৌতূহল নিতান্ত স্বাভাবিক। এই কারণেই বিবেকানন্দ-অনুরাগীরা 'সুলোচনা' উপন্যাসের পটভূমি, চরিতাবলী ও ঘটনাবলী বার-বার খুঁটিয়ে দেখবেন।

নিবেদিতার এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে তাঁর পারিবারিক স্মৃতি অবগাহন করতে করতে একবার বলেন, তাঁর পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের বিবাহ হয়েছিল তিন বছর বয়সে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে। এঁদের জ্যেষ্ঠা সন্তান একটি কন্যা, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। পরবর্তী সন্তান বিশ্বনাথের জন্ম ১৮৩৫। বিশ্বনাথের বিবাহ যে ষোলো বছর বয়সে হয়েছিল একথাও নিবেদিতার এই পত্রে উল্লিখিত হয়েছে। স্ত্রীর বয়স তখন দশ।

গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তরা বংশানুক্রমে আইনব্যবসার সঙ্গে জড়িত। স্বামীজি কথায় কথায় বলতেন, আমাদের সাতপুরুষ উকিল! পিতামহ রামমোহন ছিলেন তখনকার সুপ্রিমকোর্টের ফার্সী আইনজীবী। এই পেশায় তিনি যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর বিশাল সম্পত্তি—সালকিয়ায় দুটো বাগানবাড়ি, খিদিরপুরে প্রচুর জমিজমা। বিধির খেয়ালে এই সালকিয়ার লাগোয়া বেলুড়েই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে কলেরায় রামমোহনের অকাল মৃত্যু হয়। সেকালের কলকাতায় দারুণ গ্রীষ্মে অশোধিত জল খেয়ে কলেরায় অকালমৃত্যু কোনো নতুন

ঘটনা নয়।

রামমোহনের বড় ছেলে দুর্গাপ্রসাদও প্রথম জীবনে এটর্নি অফিসে কাজ করতেন এবং পরবর্তীকালে কোনো এক দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়। ভিটেবাড়িতে তখনই শরিকী টেনশন যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

ভূপেন্দ্রনাথের কথায় : "দুর্গাপ্রসাদ ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি উত্তর কলকাতানিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ্ করেন। শ্যামাসুন্দরী বাংলাভাষায় বিদুষী ছিলেন। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল খুব চমৎকার। তিনি 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' নামে একটি সুবৃহৎ বাংলা কাব্যও রচনা করেছিলেন।" রূপবতী শ্যামাসুন্দরীর প্রথমা কন্যাটি সাত বছর বয়সে মারা যায়।

এই গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীর পাণ্ডুলিপি বিশ্বনাথ অনেকদিন সযত্নে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু রায়পুরে সংসার নিয়ে যাওয়ার সময় এই মূল্যবান সংরক্ষণটি নষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে দত্তপরিবারের আরও কত সংগ্রহ অদৃশ্য হয়েছে তার হিসেব নেই।

তখনকার দত্তভিটের একটা অন্তরঙ্গ ছবি ভূপেন্দ্রনাথ আমাদের উপহার দিয়েছেন। "মনে হয় বিধবা বোন যিনি স্বামীর উইলের অধিকারিণী ছিলেন, তিনিই ছিলেন সংসারের কর্ত্রী। যে কারণেই হোক তিনি আমার পিতামহীকে ভাল চক্ষে দেখতেন না।"

শ্যামাসুন্দরী একবার বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি এলে রায়বাঘিনী ননদিনী হুকুম দিলেন, পাল্কি হটাও। বিশ্বনাথ জননীকে তখনই বাপের বাড়ি ফিরতে হয়। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "স্ত্রীর এই অপমান দেখে দুর্গাপ্রসাদ বসতবাড়ি ত্যাগ করে চলে গেলেন। পরে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন।"

কালের ব্যবধান অমান্য করে সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদের স্মৃতি আজও স্বামীজির ভিটেবাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের আগন্তুক তীর্থযাত্রীরা এখন জানতে চান, বাড়ির কোন ঘরে একসময় সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদকে শেষবারের মতন বন্দি করে রাখা হয়?

কাহিনীটা এই রকম : উত্তর ভারত থেকে সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদ মাঝে

মাঝে টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে কলকাতায় আসতেন। থাকতেন তাঁর ভিক্ষাপুত্রের সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে, এই বাড়িটি একসময় তিনিই ভিক্ষাপুত্রকে দান করেছিলেন। লোকমুখে শোনা যায়, মতের পরিবর্তন হতে পারে এই আশায় ভ্রাতা কালীপ্রসাদ একবার তাঁর সন্ন্যাসী ভাইকে ভিটেবাড়িতে এনে ঘরে তালা বন্ধ করে রেখেছিলেন।

ফল ভাল হয়নি, বন্দি দুর্গাপ্রসাদ তিন দিন ক্রমাগত চিৎকার করতে লাগলেন দরজা খুলে দেবার জন্য। এক সময় তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে দেখে বয়োজ্যেষ্ঠরা শঙ্কিত হয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিতে বললেন।

বিশ্বনাথ দত্তের বাবা সেই যে গৃহত্যাগ করলেন, আর কখনও দত্ত বাড়িতে ফেরেননি। শোনা যায়, গৈরিক গ্রহণের পর বিদেশযাত্রার আগে পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দকেও ভিটেবাড়িতে পদার্পণ করতে দেখা যায়নি। মা ও দিদিমাকে দেখতে তিনি যেতেন ৭ রামতনু বোস লেনের বাড়িতে, এই রামতনু বসু ছিলেন দিদিমা রঘুমণি দাসীর পিতামহ।

সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদ কলকাতায় এলে বালক বিশ্বনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পিতার ভিক্ষাপুত্রের সিমলা স্ট্রিটের বাড়িতে যেতেন। বলাবাহুল্য দুর্গাপ্রসাদ আর কখনও স্বগৃহে আসেননি।

দুর্গাপ্রসাদের কোষ্ঠিতে একটি ইঙ্গিত পরিবারের মধ্যে বিশেষ আশা জাগিয়েছিল, জাতক ৩৬ বছর বয়সে গৃহে ফিরে আসবেন। অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, ঠিক ঐ বয়সেই দুর্গাপ্রসাদ পরিবারের জনৈক সভ্যের হাত দিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও জপমালা বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এই লক্ষণ দেখে প্রতিবেশীরা শ্যামাসুন্দরীকে পরামর্শ দিলেন, দুর্গাপ্রসাদের মধ্যাহ্নিক শয়নের সময়ে গিয়ে তাঁর পদসেবা করতে।

‘সুলোচনা’ উপন্যাসেও নায়কের বিদেশযাত্রার পূর্বে স্ত্রীর পদসেবার একটি মনোগ্রাহী ছবি এঁকেছেন বিশ্বনাথ। শ্যামাসুন্দরীর ক্ষেত্রে অবশ্য

স্বামীর সেবা প্রচেষ্টার ফল মোটেই ভাল হয়নি। পারিবারিক বর্ণনাটা এইরকম : "শ্যামাসুন্দরী স্বামীর ঘরে গিয়ে তাঁর মশারি তুলে পদসেবা করবার চেষ্টা করতেই দুর্গাপ্রসাদ চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'চণ্ডালী আমাকে স্পর্শ করেছে।' একথা বলেই তিনি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপর আর তিনি দেশে আসেন নি।"

যে রায়বাঘিনী ননদিনীর হাতে দুর্গাপ্রসাদের পত্নী শ্যামাসুন্দরী প্রায়ই নিগৃহীতা হতেন তাঁর সূত্র ধরেই দত্তদের ভিটেবাড়িতে নানারকম মামলার অনুপ্রবেশ ঘটে।

রামমোহনের এই কন্যাটির বিয়ে হয়েছিল খুবই বড়লোকের বাড়িতে। একদিন পুকুরে স্নান করতে যাবার সময় জামায়ের সঙ্গে এক গণকের দেখা হলো। এই গণকটি ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন, সর্পদংশনে শীঘ্রই তাঁর মৃত্যু হবে। সময় নষ্ট না করে নিরুপায় জামাতা সামনের এক কুমোরের দোকানে গিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা মাটির হাঁড়ি কিনলেন এবং আর কিছু না পেয়ে সেই হাঁড়ির ওপরে উইল লিখলেন যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পাবেন তাঁর বালবিধবা।

বিধির বিধানে জামাতা সত্যিই হঠাৎ মারা গেলেন। শোকাহত রামমোহন তখন সদ্যবিধবা কন্যা, মাটির হাঁড়িতে লেখা উইলটি ও কন্যার শ্বশুরবাড়ির শালগ্রামশিলাটি নিয়ে ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের ভিটেবাড়িতে ফিরে এলেন। কিছুদিনের মধ্যে বারুইপুরের চৌধুরীরা প্রয়াত জামায়ের সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আদালতে মামলা করলেন।

এই মামলা চলেছিল তিন প্রজন্ম ধরে এবং শেষপর্যন্ত রামমোহনকন্যারই জয় হয়েছিল। কিন্তু মামলার খরচ সামলাতে গিয়ে লাখ টাকার সম্পদ কমতে কমতে ষোলো হাজার টাকায় দাঁড়ায়।

উইল বা পারিবারিক সম্পত্তির পার্টিশন মামলায় সেকালের কলকাতায় এরকম আর্থিক সর্বনাশই হতো। উইল করা সম্পর্কে বিশ্বনাথ দত্তের 'সুলোচনা' উপন্যাসে সুন্দর একটি দৃশ্য আছে। সেখানে উইলের চমৎকার বাংলা করা হয়েছে 'মানসপত্র'—এই শব্দটির বদলে এখন সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি 'ইচ্ছাপত্র'।

দুর্গাপ্রসাদ সংসার ত্যাগ করার পরে সংসারের প্রধান হলেন তাঁর ছোটভাই কালীপ্রসাদ দত্ত। এঁর পত্নীর নাম বিশ্বেশ্বরী, ইনি জয়নগর ২৪ পরগনার মেয়ে। কালীপ্রসাদের নিজস্ব উপার্জন ছিল না, রোজগারের একমাত্র সূত্র দত্ত পরিবারের সম্পত্তির থেকে আয়। খাজনা এবং ভাড়া থেকে চলতো দুর্গাপ্রসাদহীন সংসার।

যথাসময়ে দত্ত ভিটেতে আরও একটি আইনি সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেকালের হিন্দু আইন অনুযায়ী সন্ন্যাসীদের পারিবারিক সম্পত্তির কী অবস্থা হবে? হিন্দু আইন মতে কেউ বারো বছর নিরুদ্দিষ্ট থাকলে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আদালতের আদেশ তাঁকে মৃত ঘোষণা করা যায়। স্বামীজির পিতামহ দুর্গাপ্রসাদের ক্ষেত্রেও এই পথ অনুসরণ করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, এই মামলাটির কাগজপত্র এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সিমলে দত্ত পরিবারের পরবর্তী প্রজন্মের স্পষ্ট অভিযোগ, কালীপ্রসাদ তাঁর সন্ন্যাসী দাদার ছেলেকে তেমনভাবে দেখাশোনা করেননি, ফলে অত্যন্ত অযত্ন ও অবহেলায় বিশ্বনাথের ছোটবেলা কেটেছিল।

ভূপেন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর বাবার ধনবান মামার বাড়ির কিছু খবরাখবর আমাদের দিয়েছেন। শ্যামাসুন্দরীর পিতৃদেব সেকালের ডাকসাইটে ব্যক্তিত্ব রাজীবলোচন ঘোষ ছিলেন ভারত সরকারের তোষাখানার দেওয়ান। এঁর আর্থিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ছড়া ও গান নাকি একসময় প্রাচীন কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় লোকের মুখে মুখে ফিরত।

ছ'বছর বয়সে দুর্গাপূজার সময় মামার বাড়িতে গিয়ে বিশ্বনাথ নাকি চরম অপমানের পাত্র হন। তাঁর জামাকাপড় ভাল না থাকায়, বালকটি যে এবাড়ির ভাগ্নে তা কয়েকজন অভ্যাগতর কাছে মামার বাড়ির লোকরা চেপে গিয়েছিলেন। নিদারুণ মনোকষ্ট পেয়ে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে বালক বিশ্বনাথ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে ফিরে এসেছিলেন এবং শোনা যায় এরপর তিনি আর কোনোদিন মামার বাড়িতে পা দেননি।

কাকা কালীপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ জননী সম্পর্ক সম্বন্ধে এত কিছু বলার কারণ, 'সুলোচনা' উপন্যাসে সেকালের যৌথপরিবারের নিজস্ব উপার্জনহীন কর্তা ও তাঁর ভ্রাতৃবধূর বেশ কিছু বিস্ময়কর ছবি আছে। তফাত এই, সুলোচনার স্বামী সংসারত্যাগী নন, ভাগ্যসন্ধানে ও কর্মসূত্রে তিনি বাংলা থেকে বেশ দূরে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। উপন্যাসের নায়ক সেকালের প্রথা অনুযায়ী নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেননি। যাঁরা দত্তভিটের তখনকার সাংসারিক ছবিটি মাথায় রাখবেন, তাঁদের মনে হতে পারে, উপন্যাস লেখক বিশ্বনাথ দত্ত কি তাঁর কাকা কালীপ্রসাদ ও জননী শ্যামাসুন্দরীর বিচিত্র ঘটনাগুলি পরবর্তীকালেও বিস্মৃত হননি?

সংসারত্যাগী দাদার নিঃসহায় স্ত্রী-পুত্রর সঙ্গে ভাই কালীপ্রসাদ কী ধরনের ব্যবহার করেছিলেন তার আরও কিছু বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে। কালীপ্রসাদ একবার মামলার খরচ চালানোর জন্যে ভ্রাতৃবধূ শ্যামাসুন্দরীর বেশ কিছু গহনা নিয়ে গিয়ে দোকানে বন্ধক রেখে নগদ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

বিবেকানন্দ-পিতার উপন্যাসেও এমন একটি দৃশ্য আছে যেখানে উপার্জনহীন গৃহকর্তা তাঁর ভ্রাতৃবধূর গহনা চাইছেন। দত্ত ভিটেবাড়িতে গহনা বার করে দেওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য অত সহজ হয়নি। শ্যামাসুন্দরী যখন গহনা ফেরত দেবার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন তখন অনন্যোপায় কালীপ্রসাদ বালক বিশ্বনাথের নামে কয়েকটি তালুক লিখে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, চোদ্দ বছরের বালক বিশ্বনাথকে লাঠিয়াল সহ তালুকের দখল নিতে যেতে হয়েছিল। পরে দেখা গেল তালুকসংক্রান্ত দলিলে বহু গোলমাল আছে।

কালীপ্রসাদের লোভ ও বোকামির শেষ ছিল না। এই বাড়িতে ভুবনেশ্বরীর বিয়ের আগে কালীপ্রসাদ এক ভণ্ড তান্ত্রিকের খপ্পরে

পড়েছিলেন। তিনি নাকি কয়লাকে হিরেয় রূপান্তরিত করতে পারেন কিছু পয়সা পেলে। কালীপ্রসাদ দত্ত সরল মনে এই অষ্টসিদ্ধ যোগীর পিছনে তখনকার দিনে আঠারো হাজার টাকা খরচ করেন।

বিশ্বনাথের বয়স যখন সতেরো তখন মাতামহ রাজীবলোচন ঘোষের দেহাবসান ঘটে। পিতৃসান্নিধ্যে বঞ্চিত নাতিকে তিনি একটি বাগানবাড়ি লিখে দিয়ে যান, কিন্তু কিছুদিন পরেই বিশ্বনাথের বড়মামা বাড়িতে এসে ভাগ্নের কানে কানে কী বললেন, বিশ্বনাথ সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পত্তি মামাকে লিখে দিলেন।

পরবর্তী সময়ে স্বামীজির মা অল্পবয়সী স্বামীর এই কাজকে সমর্থন করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, মামাকে লিখে না দিলে, দত্তবাড়ির শরিকরা এই সম্পত্তি বিশ্বনাথের কাছ থেকে হাতিয়ে নিতেন।

মধু রায় লেনে সিমুলিয়ায় দত্তপরিবারের একটা যৌথ সম্পত্তি ছিল। কালীপ্রসাদের অনুরোধে বিশ্বনাথ এই সম্পত্তিতে তাঁর ভাগটা কাকাকে লিখে দিয়েছিলেন। স্বভাবতই ভুবনেশ্বরী প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, এইভাবে সব সম্পত্তি লিখে দিলে নিজের ছেলে, মেয়ে, বউয়ের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

কিন্তু সংসারবিরাগী বাবার অনুপস্থিতিতে যে কাকা তাঁকে ছোটবেলায় মানুষ করেছেন তাঁর প্রতি বিশ্বনাথের আনুগত্য ছিল প্রশ্নহীন। ছোট বয়সে যিনি আমাকে দেখেছেন তিনি চাইলে দেহের মাংস পর্যন্ত কেটে দিতে পারি, এই হল কৃতজ্ঞ বিশ্বনাথের মনোভাব।

কাকার দেহাবসান পর্যন্ত বিশ্বনাথের এই মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে তিনি বড়ছেলে নরেনের কাছে নিজের মনের কথা লুকিয়ে রাখেননি, গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি বর্ণনা করতেন, কাকা এবং তাঁর পরিবারের কাছে তিনি কীভাবে নিগৃহীত ও অত্যাচারিত হয়েছিলেন। 'সুলোচনা' উপন্যাসের পাঠক বসুপরিবারের তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ ভজহরির মধ্যে সিমুলিয়ার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের কালীপ্রসাদকে খুঁজে পেলেও পেতে পারেন।

বিশ্বনাথ দত্তের উপন্যাসটি একটি কায়স্থ পরিবারকে কেন্দ্র করে। এই উপন্যাসের প্রথম পুরুষ কেনারামও অনেকটা দত্ত পরিবারের রামমোহনের মতন। ইনিও ছিলেন আধা-উকিল। উপন্যাসের কেনারাম আইনের ব্যাপারে কখনও কাউকে কুপরামর্শ দিতেন না, কেউ এমন কথা বলতে পারত না যে কেনারামের পরামর্শে তার ক্ষতি হয়েছে। এই কেনারামও রামমোহনের মতন বুদ্ধি ও কৌশলে নিজের পৈতৃক ভদ্রাসনের সুবিস্তার ঘটিয়েছিলেন।

আরও এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য। দত্তপরিবারের প্রথম চারপুরুষ সকলেই রাম—রামনিধি, রামজীবন, রামসুন্দর, রামমোহন। আর বিশ্বনাথের লেখা উপন্যাসের আদিচরিত্র কেনারাম ও প্রধান চরিত্র রামহরি।

পিতৃদেব কেনারাম বসুর আশি বছর বয়সে মৃত্যুর সময় জমিজমা বাগবাগিচা ও তালুক ছাড়াও নগদ নিতান্ত কম ছিল না। তাছাড়া সম্পত্তির বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এমন এক সময়ে যখন বাৎসরিক চার হাজার টাকা আয়ের লোকরা নিজেদের বড়মানুষ বলে গণ্য করতেন।

'সুলোচনা' উপন্যাসের কোন চরিত্রের মধ্যে লেখক বিশ্বনাথ দত্ত লুকিয়ে আছেন? উপন্যাস শেষ করে পাঠক-পাঠিকারা অবশ্যই তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। আপাতত বলা যেতে পারে, একটি নয়, দুটি চরিত্রে তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলি বারবার উঁকি মারছে। একটি অবশ্যই নায়ক রামহরি—সেই চরিত্রে আছে তাঁর জীবনসংগ্রাম ও নানা সংঘাত। গল্প একটু এগোলেই কিন্তু মনে হয়, রামহরির একমাত্র সন্তান সুরথনাথের মধ্যেও লেখক বিশ্বনাথ উঁকি মারছেন। বিশ্বনাথের বাল্য, যৌবন ও জীবনসায়াহ্নের ঘটনাবলি একটু বিস্তারিত জানা থাকলে চরিত্রবিচার সহজতর হতে পারে।

বাল্যে বিশ্বনাথের লেখাপড়া নিয়ে দত্ত পরিবারের কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। পাড়াপড়শিদের প্রশ্নে ধৈর্যহীন হয়ে নিজের মুখরক্ষার জন্য অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবশেষে কালীপ্রসাদ পাঠিয়েছিলেন আজকের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে, সেকালে যার নাম ছিল গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল। বালকটির জুতো ছিল না, খালিপায়ে প্রতিদিন সিমলা থেকে আহিরিটোলায় যাতায়াত করতে হত। এক মাস্টারমশায় জিজ্ঞেস করলেন, জুতো নেই কেন?

সরলমনে গরিব ছেলেটি উত্তর করল, "আমার বাবা বারাণসীতে থাকেন। তিনি আমার জন্যে জুতো পাঠাবেন। এখনও জুতো আসেনি, এলেই পরবো।" আমরা জানি পিতা দুর্গাপ্রসাদ তখন বারাণসীতে মঠাধীশ। গৌরমোহন আঢ্যের ইস্কুলেই বিশ্বনাথের শিক্ষক ছিলেন রসিকচন্দ্র চন্দ্র। বিধির বিধানে পরবর্তীকালে এঁরই পুত্র কালীপ্রসাদ চন্দ্র স্বামী অভেদানন্দ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কালীবেদান্তি ছিলেন স্বামীজির প্রিয়বন্ধু ও গুরুভাই। স্বামীজি তাঁর এই গুরুভাইকে আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের জন্য আহ্বান করেছিলেন।

'জুনিয়র' ও 'সিনিয়র' পরীক্ষা পেরিয়ে কোনো এক সময়ে বিশ্বনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হলেন। পরবর্তী ঘটনাবলি কিছুটা ধোঁয়াশায় ঢাকা। কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, অর্থোপার্জনের জন্য বিশ্বনাথ কিছুদিন ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছিলেন, কিন্তু তেমন সুবিধে করতে পারেননি।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওকালতিজীবনও আমাদের আয়ত্তের বাইরে থেকে যেত। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী উচ্চ আদালতের রেকর্ড ঘেঁটে কিছু আলোকপাত করে গিয়েছেন। আর আছে কলকাতা হাইকোর্টে বিশ্বনাথের বিধবা ভুবনেশ্বরী দাসীর আবেদনপত্র যেখানে মায়ের সঙ্গে সই করেছেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ

দত্ত। এই আবেদনের তারিখ কলকাতায় 'সুলোচনা' প্রকাশের প্রায় সাড়ে চার বছর পরে।

মামলা মোকদ্দমার ছায়া থেকে সিমুলিয়ার দত্তরা কখনও নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। সন্ন্যাসী দুর্গাপ্রসাদের বিষয়-সম্পত্তি অধিকারের জন্য হাইকোর্টের মামলায় দীর্ঘ বারো বছর তাঁর কোনো সংবাদ বা সন্ধান না পাওয়ার অভিযোগে তাঁকে আইনমতে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে বিশ্বনাথ দত্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে খোঁজখবরের জন্য ব্যারিস্টার সুধীরচন্দ্র মিত্র একসময় মাননীয় প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হন। ফণীভূষণের ৪ ডিসেম্বর ১৯৫২ তারিখের লিখিত বিবরণ সব সন্দেহের অবসান ঘটায়। ব্যাপারটা এই রকম :

আদালতের কাগজপত্রে বিশ্বনাথের ইংরিজি বানান Bisso Nath Dutt: ১৪ মার্চ ১৮৬৬ প্রধান বিচারপতি বার্নেস পিককের কাছে এটর্নি ও প্রক্টর হিসেবে তালিকাভুক্ত হবার জন্য তিনি আবেদন করেন। প্রক্টর শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'মকদ্দমার তদ্বিরকারি আম-মোক্তার'। হিসেব অনুযায়ী পুত্র নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন তিন বছর।

আদালতের আবেদনপত্রের বাঁদিকে লেখা হয়েছে "তাই হোক" (বি ইট সো)—যে বিচারক বিশ্বনাথের আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন তাঁর নাম মিস্টার জাস্টিস ওয়ালটার মরগ্যান। তখন কলকাতা হাইকোর্টের লেটারস্ পেটেন্ট ১৮৬২ অনুযায়ী বিচারকের সংখ্যা তেরো জন। মরগ্যান পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের চীফ জাস্টিস হন।

পিটিশনের সঙ্গে জমা দেওয়া পরীক্ষকদের সার্টিফিকেট (১২ মার্চ ১৮৬৬) থেকে দেখা যায় এটর্নি মিস্টার হেনরি জর্জ টেম্পল-এর কাছে বিশ্বনাথ আর্টিকেল্ড ছিলেন। এঁর নামানুসারেই সম্ভবত ৬ ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রিটের বিখ্যাত টেম্পল চেম্বার্স ভবনের নামকরণ হয় যেখানে প্রায় এক শতাব্দী পরে আমি ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল মহোদয়ের বাবু বা 'ক্লার্ক' হিসেবে যোগ দিই।

দেখা যাচ্ছে, মিস্টার চার্লস এফ পিটারের কাছে বিশ্বনাথ দত্তের আর্টিকেল্‌ড ক্লার্কশিপের শুরু ১১ এপ্রিল ১৮৫৯—শেষ ৩১ জুলাই ১৮৬০। প্রায় ছ'মাসের ব্যবধানে (২৯ জানুয়ারি ১৮৬১) তিনি আর্টিকেলড্‌ হন মিস্টার হেনরি জর্জ টেম্পলের কাছে। এই বিখ্যাত এটর্নির অধীনে তিনি থাকেন ১০ অক্টোবর ১৮৬৪ পর্যন্ত। এটর্নি হিসেবে নথীভুক্ত হবার আবেদনের সঙ্গে দুটি চরিত্র সার্টিফিকেট (দুটিরই তারিখ ৭ জানুয়ারি ১৮৬৫) দেন শ্রী গ্রীশ (গিরিশ) চুন্দার (চন্দ্র) বনার্জি ও শ্রী দিগম্বর মিটার। এই গিরিশই পরবর্তীকালে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বনার্জির পিতৃদেব। দিগম্বর মিটার পরে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন।

প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণের রিপোর্টে পরলোকগত বিশ্বনাথের বিধবা ভুবনেশ্বরী দাসীর (Bhubannessary Dassee) ১১আগস্ট ১৮৮৬র লেটারস অফ অ্যাডমিনিসট্রেশনের আবেদনের বিবরণ আছে। এই আবেদনপত্রে সম্মতি জানিয়ে সই করেছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পরের দিনই (১২ আগস্ট ১৮৮৬) এই আবেদন গৃহীত হয়। আবেদনপত্রের তিন নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে বিশ্বনাথের বিধবা ছাড়া তিন পুত্রসন্তান রয়েছে, এদের নাম নরেন্দ্রনাথ (২২ বছর) ও নাবালক মহেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ। প্রথম প্যারাগ্রাফ থেকে স্পষ্ট যে বিশ্বনাথ দত্ত কোনো উইল রেখে যাননি—তাঁর দেহাবসান হাইকোর্ট রেকর্ড অনুযায়ী ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪।

কলকাতা কর্পোরেশনের ডেথ রেজিস্টারে বিশ্বনাথের মৃত্যুদিন শনিবার ২৩ ফেব্রুয়ারি, বয়স ৫২, মৃত্যুর কারণ বহুমূত্র রোগ, মৃত্যুকালীন বাসস্থান ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট। (পীড়ার পূর্বে নিবাস : একই।) সংবাদদাতা হিসেবে ইংরিজিতে সই করেছেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কর্পোরেশন রেকর্ড অনুযায়ী মৃত্যু রেজিসট্রির তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪।

আইনজ্ঞ হিসেবে বিশ্বনাথের কর্মজীবন সম্পর্কে নানারকম কাহিনী আজও বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে আছে। অ্যাটর্নি হওয়ার পরেই তিনি আশুতোষ ধরের সঙ্গে ধর অ্যান্ড দত্তর অংশীদার হয়েছিলেন। পরে তিনি এই যৌথ ব্যবসায়ে উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

অনুসন্ধানী লেখক চিত্রগুপ্ত দত্তবাড়ির আদালতি কাগজপত্র অনেক খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পান। বিশ্বনাথ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : "আয় আশানুরূপ হলেও বেহিসেবী এবং অপরিণামদর্শী হওয়ায় তিনি দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সুদূর সেন্ট্রাল প্রভিন্সেসে, যার পরবর্তী নাম মধ্যপ্রদেশ। প্রবাসে থাকাকালীন তিনি কিছুদিন পাঞ্জাবেও ওকালতি করেছিলেন।"

১৮৭৯ সালে বিশ্বনাথ কলকাতায় ফিরে এসে আবার আইন প্র্যাকটিশ শুরু করেন। পরবর্তীকালে স্বামীজির কাকা তারকনাথের বিধবা জ্ঞানদাসুন্দরী যে মামলা করেন সেই আবেদনে অভিযোগ, বিশ্বনাথ দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে ১৮৭১ সালের মাঝামাঝি কলকাতা ছেড়ে চলে যান। তাঁর বিরুদ্ধে পাওনাদারদের কয়েকটি ডিক্রি জারির আশঙ্কায় তিনি সাত বছর প্রবাসে কাটান।

জ্ঞানদাসুন্দরীর অভিযোগের জবাবে ভুবনেশ্বরী আদালতে যে বক্তব্য দাখিল করেন তার মর্মার্থ : "আমার স্বামী বিশ্বনাথ দত্ত, এই মামলার বাদী জ্ঞানদাসুন্দরীর স্বামী তারকনাথ দত্ত এবং তারকের সহোদর ভাই কেদারনাথ দত্ত ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। আমার স্বামী বিশ্বনাথ শেষজীবনে কলকাতা ছেড়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চলে গিয়ে কয়েক বছর সেখানে আইনজীবীর পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে আমি আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসতবাড়িতেই ছিলাম। আমার এবং আমার

of the said Biswanath Dutt deceased intended to have jurisdiction throughout the whole of British India be granted to your petitioner limited during the minority of the infant sons of the said deceased on your petitioner furnishing such security for the due administration thereof as to this Honorable Court will seem proper.

And your Petitioner shall ever pray &c

Norendra Nath [illegible]
Petitioner's Attorney

ভুবনেশ্বরী দাসী
Explained by me
[illegible] Interpreter

I the petitioner in the above petition named do declare that what is stated therein is true to the best of my knowledge information and belief

ভুবনেশ্বরী দাসী
Explained by me

[illegible] identified by me
[illegible]

[illegible] Interpreter
11-8-86.

I Norendra Nath Dutt the eldest son of Biswanath Dutt deceased named in the foregoing petition do hereby consent to my mother the said Sreemutty Bhubanessury Dossee obtaining Letters of Administration to the Estate and Effects of the deceased abovenamed should it please your Lordships to grant to her the same

Narendra Nath Datta

আদালতে রক্ষিত বিবেকানন্দ জননী ভুবনেশ্বরী দাসীর আবেদন পত্র, একই কাগজে সম্মতিস্বাক্ষর ভুবনবিদিত পুত্রের। তারিখ ১১ আগস্ট ১৮৮৬—শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পাঁচদিন আগে। মূল আবেদনে ইংরিজি বানান Norendra Nath Dutt, কিন্তু স্বামীজি সই করেছেন Narendra Nath Datta.

পোষ্যদের ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ আমার স্বামী পাঠাতেন। একথা অত্যন্ত অসত্য ও অমূলক যে তারকের আনুকূল্যে আমার ও আমার ছেলেমেয়েদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হত, বিশেষ করে যখন আমার স্বামী প্রবাসে ছিলেন। তবে, একথা সত্যি যে আমার স্বামীর অনুপস্থিতে তারকনাথ সংসারের কর্তা হিসেবে আমাদের দেখাশোনা করতেন।"

বিবেকানন্দজননীর আদালতে এইসব নিবেদন বিশ্বনাথের দেহান্তের কয়েকবছর পরে। আশ্চর্যের ব্যাপার, 'সুলোচনা' উপন্যাসে বিশ্বনাথ এই ধরনের ছবিই এঁকেছেন। ভাই কাজের সূত্রে বিদেশ গিয়েছেন, সেখানে বেশ ভাল উপার্জন করেন এবং সেই টাকা অভিভাবক দাদার কাছে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তিনি ও তাঁর পরিবার তা হজম করে ফেলেন। ভ্রাতৃবধূর দৈনন্দিন জীবনে কষ্টের অভাব নেই।

ঔপন্যাসিক বিশ্বনাথ কি মানসচক্ষে অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখে ফেলেছিলেন? দত্ত পরিবারের বৃহৎ পারিবারিক বিরোধের বিবরণ দেওয়ার পূর্বে জ্ঞাতিদের সম্বন্ধে আরও কিছু বিবরণ সংগ্রহ করা মন্দ হবে না। দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই কিছুটা জেনেছি। কালীপ্রসাদের দুই পুত্র—কেদারনাথ ও তারকনাথ। কেদারনাথের এক কন্যা ও চার পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র (হাবুবাবু ও তমুবাবু) সঙ্গীতজগতের নামকরা ব্যক্তিত্ব। জেনে রাখা ভাল জগদ্বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ সায়েব এ-বাড়িরই শিষ্য। রামকৃষ্ণভক্ত হাবুবাবু, ঠাকুরের দেহাবসানের পরে তাঁর অস্থি দিয়ে একটি জপমালা তৈরি করেছিলেন। এঁদের ছোটভাই শরৎচন্দ্র ১৬ বছরে মারা যান।

কেদারনাথের ভ্রাতা তারকনাথের স্ত্রীই পরবর্তীকালে স্বামীজির মায়ের নামে মামলা আনেন। এঁদের একপুত্র ও ছয় কন্যা। তারকনাথ একসময় প্রেসিডেন্সি কলেজে যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বসত সেখানে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বি এল পাশ করে তিনি হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা শুরু করেন। তারকনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির হয়ে ওকালতি করতেন, সেই সূত্রে তাঁর মেয়ের বিয়েতে দেবেন্দ্রনাথ ও বিখ্যাত ঠাকুররা দত্তবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসতেন। হয়তো বাংলার যৌথপরিবারে

এমন ব্যাপার সেযুগে প্রায়ই ঘটতো।

ভুক্তভোগী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দুঃখ করেছেন, "পারিবারিক কাহিনীর গোপন তথ্য এখানে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য, হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারের অভিশাপ যে কত নিষ্করুণ তা ব্যক্ত করা। যাঁরা এই একান্নবর্তী পরিবার প্রথার পবিত্রতা সম্পর্কে গলাবাজি করে থাকেন তাঁরা হয় এর বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত নন, নতুবা পারিবারিক কলহ বিবাদ ও বিয়োগান্ত ঘটনাবলী উপেক্ষা করে থাকেন। ব্যবসায়িক ও শিল্পনীতিক সমাজে এই প্রথা এখন অচল। বর্তমান সমাজে এই প্রথা চালুরাখার সপক্ষে কোন কারণই থাকতে পারে না।"

সিমুলিয়ার দত্তবাড়ির অবস্থান কলকাতার হৃদয়ের পল্লীতে, যাকে বাংলার এথেন্স বলা হতো। কারণ যথেষ্ট। এই এথেন্সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রমেশচন্দ্র দত্ত, তরু দত্ত, অরু দত্তর জন্ম। পুরো উত্তর কলকাতা ধরলে এক সহস্র নামেও বিশিষ্টদের তালিকা শেষ হবে না। দত্তদের বংশে বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের মন্তব্য : "নরেন্দ্রনাথের পিতৃপুরুষের বংশে প্রভূত বিত্তশালী, সন্ন্যাসী, সরকারি চাকুরে, জনকল্যাণমূলক কার্যে ও দেশ সেবায় আত্মনিয়োগকারী মহান ব্যক্তিরা জন্মেছেন। আবার সাধারণ গৃহীর বেশে কেউ কেউ গুপ্তযোগীরূপে জীবনযাপন করেছেন।"

কলকাতা হাইকোর্টে জ্ঞানদাসুন্দরী বনাম ভুবনেশ্বরীর মামলার শুনানি শুরু হয় বিশ্বনাথের দেহাবসানের কয়েক বছর পরে ১৮৮৭ সালের গোড়ায়।

এই মামলায় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টারের জেরার সম্মুখীন হন ৮ মার্চ ১৮৮৭।

এই মামলার বীজবপন ও ধীরে ধীরে বিষবৃক্ষের রূপ ধারণ কীভাবে হলো তার কিছু বিবরণ রয়েছে আমার 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' বইয়ের প্রথম অংশে। সেই বিবরণের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

শুধু এইটুকু বলা যায় বিচারপতি ম্যাকফারলেন তাঁর রায়ে বলেন, বিশ্বনাথ, যিনি পাওনাদারদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কলকাতা

ছেড়ে চলে যান, তিনি ১৮৭৯ সালে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে ফিরে এসে যৌথপরিবারেই আশ্রয় নেন। মধ্যবর্তী সময়ে তিনি পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশে ওকালতি করেন। তবে প্রমাণিত হয়েছে, প্রবাসে উপার্জনকালে বিশ্বনাথ দত্ত তাঁর স্ত্রীকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। এই মামলায় বিতর্কিত বিষয়-সম্পত্তি জ্ঞানদার স্বামী তারকনাথ কি তাঁর ভ্রাতৃবধূ ভুবনেশ্বরীর বেনামীতে কিনেছিলেন অথবা তা বিবেকানন্দ জননী ভুবনেশ্বরী নিজেই কিনেছিলেন তাঁর স্বামী বিশ্বনাথের পাঠানো টাকায়? শেষ পর্যন্ত উচ্চ আদালতের রায়, জ্ঞানদাসুন্দরী তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যাঁরা এই মামলা সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চান তাঁরা জেনে রাখুন, তারকনাথের একটি চিঠি তাঁর স্ত্রীর মামলাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই চিঠিতে তারকনাথ নিজেই পরিবারের একজনকে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন, "শরিকী সম্পত্তির প্রকৃত ক্রেতা তিনি নন, ভুবনেশ্বরী।"

আরও প্রমাণ হয়, ১৮৭৯ সালে কেনা সম্পত্তি কালেকটরেট অফিসে নথিভুক্ত করার সময় তারকনাথ সানন্দে ভুবনেশ্বরীর হয়ে আদালতে উকিলের কাজ করেছিলেন। পরের বছর অবশ্য ভুবনেশ্বরী তাঁর স্বামীকেই অ্যাটর্নি নিযুক্ত করেছিলেন।

এই পরবর্তী সময়টি 'সুলোচনা' উপন্যাসের পক্ষে খুবই মূল্যবান। সম্ভবত এই সময়েই 'সুলোচনা' রচিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ ভুল করে বলেছেন, বইয়ের প্রকাশকাল ১৮৮০। আসলে উপন্যাসের প্রকাশের বছর ১৮৮২।

১৪ মার্চ ১৮৮৭ আদালতের রায়ে পরাজিত হয়ে জ্ঞানদাসুন্দরী কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। ১০ নভেম্বর ১৮৮৭ আপীল আদালতে প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি আর্থার উইলসন ও বিচারপতি রিচার্ড টটেনহ্যাম পূর্বতন রায় বহাল রেখে দিলেন।

এই মামলা চলার সময় টানা একবছর নরেন্দ্রনাথকে নিয়মিত কলকাতা হাইকোর্টে ছুটতে হয়েছিল। শোনা যায় তিনি পায়ে হেঁটে হাইকোর্টে যেতেন এবং পরে মায়ের কাছে সবিস্তারে সব ঘটনার বিবরণ দিতেন। আমাদের এই দেশে মহামানবরা সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়েও পার্থিব

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেন না। এই ১৮৮৭ সাল সন্ন্যাসী ও সাধক বিবেকানন্দর জীবনে স্মরণীয় সময়। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে বিরজাহোম করে নরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম সন্ন্যাস নাম বিবিদিষানন্দ গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরের কোনোসময় চিরতরে গৃহত্যাগ করেন।

বিশ্বনাথের উপন্যাসে বড় ভাই অনেকটা দত্তবাড়ির উপার্জনহীন কর্তা কালীপ্রসাদের মতন।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্বামী গম্ভীরানন্দের বর্ণনা : "কালীপ্রসাদ একদিকে ছিলেন অমিতব্যয়ী, অপরদিকে তেমনি ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বনাথের আয়ের উপর রাখিতেন পূর্ণ দাবি। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তিনি তো নষ্ট করিতেনই, অধিকন্তু বিশ্বনাথের অর্থেও ভাগ বসাইতেন। শেষদিকে বিশ্বনাথবাবু তাঁহার কলিকাতার এটর্নি অফিসের উপর নজর রাখিতে পারিতেন না। জনৈক বন্ধুর উপর উহার ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হন। বন্ধু এই সুযোগে বিশ্বনাথবাবুর নামে ঋণ করিয়া সেইসব অর্থ আত্মসাৎ করিতে থাকেন। ...বিশ্বনাথের জীবনসন্ধ্যায় যৌথপরিবারে মনোমালিন্য বর্ধিত হওয়ায় তাঁহাকে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া স্ত্রীপুত্রসহ পৃথক অন্নের ব্যবস্থা করিতে হয় এবং তজ্জন্য অস্থায়ীভাবে ৭ নং ভৈরব বিশ্বাস লেনের এক ভাড়া-বাড়িতে চলিয়া যাইতে হয়। নরেন্দ্র তখন (১৮৮৩?) বি. এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ...ইহারই কোন এক সময়ে তিনি পিতার আদেশে পিতৃবন্ধু নিমাইচন্দ্র বসু মহাশয়ের অফিসে এটর্নির কাজ শিখিবার জন্য শিক্ষানবিশরূপে ভর্তি হইয়া প্রতিদিন পিতা ও খুল্লতাতের সহিত অফিসে বাহির হইতে থাকেন।"

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য আরও স্পষ্ট। "কাকা ও কাকীমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে" একান্নবর্তী পরিবার থেকে ছিন্ন হওয়ার কোনো ইচ্ছা বিশ্বনাথের ছিল না। তাই ভুবনেশ্বরীর প্রতি অন্যায় ও অসম ব্যবহার চলল দীর্ঘদিন।

বিশ্বনাথের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে কাকার পরিবার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করবার জন্যে তাঁকে পৃথক করে দেন। পৃথক হবার পর আমাদের পরিবার সাময়িকভাবে ৭নং ভৈরব বিশ্বাস লেনে বাড়ি ভাড়া করে বসবাস করেন। সেখানে থেকেই নরেন্দ্রনাথ বি এ পরীক্ষার জন্য পড়া তৈরি করেছিলেন।

'সুলোচনা' উপন্যাসের কাহিনীতে যে অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তা আছে তা এখানে ফাঁস করে সাসপেন্স নষ্ট করাটা যুক্তিযুক্ত নয়। তবু মূল গল্পের পটভূমির আরও একটু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

কিন্তু তার আগে বিশ্বনাথের জীবনের অন্তিমপর্ব ও তার থেকে তাঁর স্ত্রীপুত্রদের দুঃখজনক শিক্ষা সম্বন্ধে দু একটা কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

অভিজ্ঞ আইনজীবী ছিলেন বিশ্বনাথ, তাঁর খ্যাতি এতোই ছিল যে দেহাবসানের কিছু আগে হায়দ্রাবাদের নিজামের এজেন্টরা একটা মামলায় বিশ্বনাথকে হায়দ্রাবাদে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন। "স্থির হয়েছিল যে. তিনি মাঘমাসের শেষে হায়দ্রাবাদে রওনা হবেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি।"

বাংলার বাইরে থাকাকালে বিশ্বনাথ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন—পরবর্তীকালে স্বামীজিও এই ব্যাধির শিকার হন।

আমাদের ধারণা স্বামীজির এই রোগ আমেরিকায় ধরা পড়েনি, তাঁর ডায়াবিটিস ধরা পড়ে প্রথমবার দেশে ফেরার পথে কলম্বোয়। কিন্তু রোমাঁ রোলাঁর মতে স্বামীজির ডায়াবিটিসের লক্ষণ দেখা যায় সতেরো-আঠারো বছর বয়সে। তবে স্বামী গম্ভীরানন্দর সিদ্ধান্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশে পড়ার সময় তাঁর প্রায়ই ম্যালেরিয়া হতো। প্রমদাদাস মিত্রকে নরেন বাবাজী সম্পর্কে লেখা একখানি চিঠিতে 'পুরনো রোগের' উল্লেখ থেকে গবেষক শৈলেন্দ্র নাথ ধরের আশঙ্কা ইঙ্গিতটা ডায়াবিটিসের দিকে।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ বইতে বিশ্বনাথের অন্তিমপর্বের বর্ণনা এই রকম : "মৃত্যুর একমাস পূর্বে তিনি হৃদরোগেও আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী শয্যাগ্রহণ করেন। ইহার পরেই একটি

কার্যস্থলে যাইতে হয়। সেখান হইতে ফিরিয়া পত্নীকে বলেন যে, মক্কেল তাঁহাকে বহুদূরে আলিপুরে দলিলপত্র দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল, তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেছেন। অতঃপর রাত্রে আহারের পর বুকে ঔষধ মালিশ করাইয়া তামাক সেবন করিতে করিতে তিনি কিছু লেখাপড়ার কাজে মন দেন ; নয়টায় উঠিয়া বমি করেন এবং তারপরেই রাত্রি দশটায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়।"

স্বামীজির ইংরিজি জীবনী গ্রন্থ 'দ্য লাইফ'-এ বলা হয়, বি এ পরীক্ষার ফল বেরুবার আগে পিতা বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। শৈলেন্দ্রনাথ ধর অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন বিশ্বনাথের মৃত্যুর অন্তত তিন সপ্তাহ আগে বি এ পরীক্ষার ফল বের হয়। ঐ বছর বি এ পরীক্ষা শুরু ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৩, গেজেটে ফল প্রকাশ ৩০ জানুয়ারি ১৮৮৪। বিশ্বনাথের দেহাবসান ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪।

অভিজ্ঞ আইনজীবী হয়েও বিশ্বনাথ কোনো উইল করেননি। ফলে মক্কেলদের কাছ থেকে পাওনাগণ্ডা আদায়ের জন্যও ভুবনেশ্বরী ও নরেন্দ্রনাথকে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। সময় ও অর্থব্যয় হলেও এর একটা সুবিধা আমরা পেয়েছি, হাইকোর্টে ভুবনেশ্বরীর আবেদনপত্রে ভুবনেশ্বরী দাসীর বাংলা স্বাক্ষর এবং তার তলায় ইংরিজিতে পুত্র নরেন্দ্রনাথের স্বাক্ষরের অমূল্য দলিলটি, যা আজও কলকাতা হাইকোর্টে সংরক্ষিত আছে।

১১ আগস্ট ১৮৮৬তে লেটার্স অফ অ্যাডমিনিসট্রেশনের এই আবেদনে ভুবনেশ্বরী বলেন, মৃত্যুর আগে তাঁর স্বামী কোনো উইল করেননি। এইরকম কোনো দলিল তাঁর অফিসে বা বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই আবেদনের সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স বাইশ, অন্য দুই ভাই নাবালক। বিশ্বনাথের কয়েকজন মক্কেল যাঁদের কাছে টাকা পাওনা আছে তাঁদের নাম ঠিকানার বিবরণ এই আবেদনে আছে। তাঁদের নিয়ে কোনো অনুসন্ধান আজও হয়নি।

আবেদনপত্রে মায়ের বাংলা স্বাক্ষর সনাক্ত করে পুরো নাম সই করেন নরেন্দ্রনাথ। জানান, মায়ের দরখাস্ত তিনি পূর্ণ সমর্থন করছেন। এই

মামলায় ভুবনেশ্বরীর অ্যাটর্নি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাস, ভুবনেশ্বরীকে সনাক্ত করেন কালীচন্দ্র দত্ত এবং ইংরিজি অনুবাদের বাংলা ব্যাখ্যা করে শোনান অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনটারপ্রেটার।

ঔপন্যাসিক বিশ্বনাথ সুলোচনার উপাদান কতখানি নিজের পরিবার থেকে সংগ্রহ করেছেন? নায়কের আদিপুরুষদের কথা বলতে গিয়ে 'মূলগায়িন' বলে একটি শব্দ বিশ্বনাথ ব্যবহার করেছেন।

দত্তরা এসেছিলেন বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার দত্ত-দরিয়াটোনা থেকে, চলতিভাষায় কোথাও দেরেটোন, কোথাও দাড়িয়াটোন। দরিয়াটোনার দত্তরা মুঘল আমল থেকেই বিখ্যাত, দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থদের যে ত্রিশটি সমাজ ছিল দরিয়াটোনার দত্তরা তাঁদের অন্যতম। কোনো নবাব বাহাদুর প্রীত হয়ে গ্রামের নাম দত্ত-দরিয়াটোনা বলে ঘোষণা করেন। স্বামীজির পূর্বপুরুষ রামনিধি এই দত্ত-দরিয়াটোনা থেকে কলকাতায় এসে গড়-গোবিন্দপুরে বসবাস শুরু করেন।

বিশ্বনাথের উপন্যাসের নায়ক রামহরির ঠিকানা : শর্ষা গ্রাম, জয়পুর পরগণা, জেলা নবদ্বীপ। আদিপুরুষ কেনারাম বসু, যাঁর সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকারা ইতিমধ্যেই কিছুটা জানতে পেরেছেন। কেনারামের একটি উক্তি থেকে লেখকের মনোভাব কিছুটা আন্দাজ করা যায় : "বাপের নাম জানিনে পিতামহের নাম জানিনে—কিন্তু চিনের বাদশার চোদ্দপুরুষের পরিচয় জানবার জন্য ব্যগ্র!"

কেনারাম বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র ভজহরি তেরোটি পুত্রকন্যার পিতা। নায়ক রামহরি দ্বিতীয়পুত্র, তাঁর একটি মাত্র সন্তান সুরথনাথ। অসামান্যা স্ত্রী সুলোচনার নামেই উপন্যাসের নামকরণ। সুলোচনার পিছনে কি বিবেকানন্দ গর্ভধারিণী উঁকি মারছেন? না বিশ্বনাথ জননী শ্যামাসুন্দরী? ব্যক্তিজীবনে শ্যামাসুন্দরীর একটি মাত্র পুত্র ; ভুবনেশ্বরী চারপুত্র ও ছয়কন্যার জননী।

'সুলোচনা' উপন্যাসে নায়ক রামহরি ও সুলোচনার একমাত্র পুত্র সুরথনাথ। চরিত্রটির ওপর লেখক সব ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন। একমাত্র সন্তানকে পৈত্রিক বাড়িতে স্ত্রীর কাছে রেখে রামহরি বসু একদা কর্মসন্ধানে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন।

বাড়ির কর্তা ভজহরি বসু সবসময়েই এত ব্যস্ত যে "মাথা চুলকাইবার" অবকাশ হতো না। এইপ্রসঙ্গে লেখকের ব্যঙ্গোক্তি: "শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, নিত্যক্রিয়া সমাপন, মুহুর্মুহু তাম্রকূট ধূমপান, দণ্ডে দণ্ডে তীব্র মুখব্যাদান করিয়া হায়ি তোলা ইত্যাদি কর্মসমূহ একজন পুরুষের পক্ষে সাধ্য নহে।"

বসুদের যৌথ পরিবারে দু'জন গুরুত্বপূর্ণ কর্মী—নশীরাম গুরুমহাশয় ও ভোলো খানসামা। মুহুরি নশীরাম কেনারামের রেখে যাওয়া সম্পত্তির দেখভাল করতেন ও পাওনা টাকা আদায় করতেন। রেগে গেলে তিনি ভজহরিকে বলতেন, "আমি না থাকলে তোমার প্রত্যহ চারকাটা মুড়ি, দুবেক চালের ভাত কোথা থেকে হবে?"

রামহরি যেমন লেখাপড়ায় পটু তেমনি নম্র ও সুশীল। সাহেবী কোম্পানিতে একটা সামান্য কাজ নিয়ে প্রবাস যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন।

বিদায়কালে দাদা ভজহরিকে প্রণাম করে রামহরি অন্তঃপুরে গেলেন এবং দেখলেন প্রিয়তমা ভার্যা ধুলোয় পড়ে অশ্রুনয়নে ক্রন্দন করছেন, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন। সেকালের বাঙালি পরিবারের যেসব পুরুষ কর্ম উপলক্ষে বিদেশ যেতেন তাঁদের মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি এই উপন্যাসে পাওয়া যাচ্ছে। রামহরি তাঁর স্ত্রীকে প্রিয়পুত্র সুরথনাথের লেখাপড়ায় নজর রাখতে বললেন, সেই সঙ্গে বললেন, "আমি দাদার কাছে টাকা পাঠাবো। আর তোমার জন্যে লুকিয়ে প্রহ্লাদ সেনের (বন্ধু) কাছেও টাকা পাঠাব।" ...বন্ধুর বিধবাভগ্নী "ক্ষমাদিদি এসে তোমার হাতে টাকা দিয়ে যাবে।" ...পত্নী সুলোচনা আবার ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রবাসে রামহরি যে কাজ করতেন তার মাইনে তেমন বেশি নয়। নায়ক

ভাবছেন, এতো কম অর্থের জন্যে কেন বিদেশে আসা? বিশ্বনাথ যে তাঁর নিজস্ব প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা এইখানে বেশ ভালভাবে কাজে লাগিয়েছেন তা স্পষ্ট।

এই সময় একদিন দিল্লির প্রসিদ্ধ বণিক রঘুরামজী কুঠিওয়ালার সঙ্গে রামহরির যোগাযোগ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে মাড়ওয়ারি বণিকদের বাণিজ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অতি চমৎকার একটা ছবি বিশ্বনাথেব এই উপন্যাস থেকে আমাদের বাড়তি প্রাপ্তি। সমস্ত ভারতবর্ষে রঘুরামজীর কুঠি ও কারবার, তখনকার দিনে তাঁর অর্থের পরিমাণ চার পাঁচ কোটি, যা একুশ শতকের গোড়ায় প্রায় হাজার কোটি টাকার মতন।

ব্যবসা ছাড়াও রঘুরামজীর ছিল "সুবিস্তারিত রোকড়ের ও বেণেতি কার্য।" ধনপতি কুঠিয়ালরা সেযুগে নিজের দেশের লোক ছাড়া কাউকে দায়িত্বপূর্ণ চাকরি দিতেন না বলেই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু বিশ্বনাথের উপন্যাস থেকে স্পষ্ট হচ্ছে এঁদের দু'একজন কৃতী বাঙালি কর্মীও থাকতেন।

চাকরির ইন্টারভিউতে রঘুরামজীর কাছে রামহরির সরল স্বীকারোক্তি, যে উদ্দেশ্যে দেশত্যাগী হয়েছিলেন তা সিদ্ধ হবার কোনো পথ দেখছেন না। রঘুরামজীর স্মরণীয় মন্তব্য : "বাঙালি লোক ঝাঁকে ঝাঁকে এ অঞ্চলে আসছে। এরা শুনেছি লেখাপড়া জানে, কিন্তু এদের কর্মকাণ্ড দেখলে লেখাপড়ার কোনো ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বিশ পঁচিশ টাকার একটা চাকরি পেলেই এরা কৃতার্থ হয়। কিন্তু দেখো আমাদের দেশের লোক এমন নয়—বাঁধা মাইনের চাকরি পাবার জন্যে এরা মরে গেলেও চেষ্টা করে না। এরা সকলেই কারবার করে খায়।"

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বনাথ বর্ণিত বাঙালির বাণিজ্যমানসিকতা দেড়শ বছর আগের ভারতবর্ষে যা ছিল একুশ শতকেও তাই রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, সঙ্গতিহীন মাড়ওয়ারিরা কুঠি থেকে চটা সুদে কুড়ি পঁচিশ টাকা কর্জ করে বাংলায় যাচ্ছেন এবং দু'বছর পরে ধারের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছেন। তারপর উত্তর ভারতের ভাগ্যসন্ধানী বণিকদের নির্ভরযোগ্য

জীবনযাত্রা বর্ণনা, কলকাতার রাস্তায় এঁরা কাপড়ের গাঁট পিঠে করে বেড়ান। এঁরাই ক্রমশ হাউসের দালাল হন, কেউ কেউ নিজে কুঠিয়াল হন।

রঘুরামজীর প্রশ্ন : "তোমরা বল কাপড় বিক্রি ও দালালি ইতর কাজ—তবে কি মনে করো সাহেবের মুন্‌সিগিরি সম্মানের কাজ?"

যে রঘুরামজীর ব্যবসায় রামহরি অবশেষে কাজ নিলেন তা আকারে বৃহৎ। হিন্দুস্থানের এমন জায়গা নেই যেখানে তাঁর কুঠি বা কারবার নেই। দিল্লির সদর কুঠিতে প্রায় পাঁচশত কর্মচারী।

রঘুরামজীর ব্যবসার অতি আকর্ষণীয় বিবরণ রয়েছে এই উপন্যাসে, যা কেবল পাঠক-পাঠিকার ভাল লাগবে তা নয়, একালের বিজনেস ঐতিহাসিকদেরও কাজে লাগবে। মাড়ওয়ারি অফিসে তথাকথিত দেশওয়ালী কর্মীরা কিরকমভাবে তাদের মনিবের পয়সা আত্মসাৎ করত তার ছবিও রয়েছে। আর আছে শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি!

একটি চমৎকার চরিত্র হুকুমচাঁদ সুখদয়াল, মীরাটে কুঠিয়াল। এই মীরাটেই অনেকদিন পরে লেখকের প্রিয় সন্তান যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিসেবে নানা ইতিহাস রচনা করবেন তা কে জানত?

সেকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিল না। আমরা দেখেছি নাগপুর থেকে রায়পুর যেতে ভুবনেশ্বরী ও সন্তানদের একমাস লেগেছিল। দিল্লি থেকে কলকাতা আসতে পঁচিশ দিন লেগে যেতো সেইসময়। ফলে গল্পের রামহরি যে সাত আট বছর বাড়ি এলেন না, কেবল চিঠি লিখলেন এবং টাকা পাঠালেন সেটা তেমন কিছু আশ্চর্যজনক নয়।

কিন্তু যৌথপরিবারে স্ত্রীপুত্রের প্রকৃত অবস্থা রামহরি জানতে পারতেন না। স্ত্রী সুলোচনার কাছ থেকে যেসব চিঠি পেতেন তা অস্পষ্ট এবং কিছু কিছু মুছে দেওয়া।

সুলোচনা ভাল বাংলা লিখতেন, অথচ চিঠিগুলো বোধ হয় অন্য কারুর হাতে পড়তো এবং তিনি লেখার ওপর চিত্রবিচিত্র কেটে দিতেন। বিশ্বনাথের উপন্যাসের এই অংশ পাঠ করলে স্পষ্ট হয়, যৌথ পরিবারে প্রোষিতভর্তৃকা ভুবনেশ্বরী কিভাবে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতেন এবং সন্তানদের নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর কেমন অসহায় অবস্থা হতো। আজকের

যুগের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে যৌথপরিবারের এই ব্যাপারটা নিতান্ত অসম্ভব এবং অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁরা যৌথপরিবারের ঘটনাবলি সে যুগের লেখকদের রচনা থেকে পুনরুদ্ধার করছেন তাঁরা জানেন কোনো কিছুই সে যুগে অসম্ভব ছিল না।

সুলোচনার শুভানুধ্যায়িনী, স্বামীর বন্ধুর অগ্রজা, গ্রামের বিধবা ক্ষমা দিদির মন্তব্য : "ওমা শুনছি দশ পনেরো দিন অন্তর আঁজলা-আঁজলা টাকা পাঠায়, কিন্তু মেজো ছুঁড়ির হাল দেখে কান্না পায়—রুক্ষ্ম মাথা, ময়লা কাপড়—আর দিন দিন যেন পোড়া কাঠখানা হয়ে যাচ্ছে।"

একই সঙ্গে নজর দেওয়া যাক, বিদেশে কর্মরত বিশ্বনাথের যৌথ পরিবারে-ফেলে-আসা স্ত্রীর ছবি! পরবর্তীকালে পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর স্বামী বিবেকানন্দ বইতে বলেছেন, তিনি মায়ের মুখ থেকে শুনেছেন, এমন সময়ও গেছে যখন ভুবনেশ্বরীকে একটিমাত্র শাড়ি পরে কাটাতে হয়েছে অথচ জায়েদের পরনে যথেষ্ট কাপড় থাকতো।

ভূপেন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, সেকালের অনেক অ্যাটর্নির মতন বিশ্বনাথ আদালতের নীলাম থেকে কলকাতায় সম্পত্তি ক্রয় করে তা আবার বিক্রি করতেন। কিন্তু প্রত্যেক সম্পত্তিই তিনি ভুবনেশ্বরীর নামে ক্রয় করতেন।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটভাইকে বলেছিলেন, আপার সার্কুলার রোডে মানিকপীরের দরগা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পিতৃদেব কিনেছিলেন ভুবনেশ্বরীর নামে। জননী স্বয়ং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে বলেছিলেন, কারবালা ট্যাঙ্ক রোডের দরগা থেকে প্রত্যহ তিনি পাঁচ টাকা থেকে আট টাকা প্রণামী পেতেন।

বিশ্বনাথ একসময় স্ত্রীর নামে সুন্দরবনে এগারো হাজার বিঘার বিস্তৃত তালুক কেনেন। কিন্তু খুড়শ্বশুর কালীপ্রসাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বধূকে বলেন 'তোমার কি বাবার তালুক'। ভুবনেশ্বরী বেশী কথা বলতেন না। এই গালি শুনে নরেন্দ্রজননী সম্পত্তির পাট্টাটি মাটিতে ছুড়ে ফেলে দেন। আমরা জানি, বিশ্বনাথ পরে বুঝতে পারেন তাঁর স্ত্রীর দুঃখ, পীড়া ও বেদনা। তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে একদিন প্রকাশ করলেন অভিযোগ, "আমি এত টাকা রোজগার

করি, আর আমার স্ত্রী পেটভরে খেতে পায় না।”

এসব বলা সত্ত্বেও বিশ্বনাথ যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, ফলে ভুবনেশ্বরীর কষ্ট শেষ হয়নি। কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটল যথাসময়ে। পারিবারিক সম্পত্তির ন্যায্য অংশ থেকে বঞ্চিত করার জন্য কাকার পরিবার বিশ্বনাথকে পৃথক করে দিলেন। এই সময়ে তিনি সাময়িকভাবে সপরিবারে ৭ ভৈরব বিশ্বাস লেনের ভাড়াবাড়িতে উঠে যান।

প্রায় একই পরিস্থিতিতে সুলোচনা উপন্যাসের যৌথপরিবারে কী হল এবং কীভাবে জটীল সমস্যার অপ্রত্যাশিত সমাধান হল তা এখানে ফাঁস করতে চাই না, তাতে উপন্যাসপাঠের আনন্দ ও আকর্ষণ কমে যেতে পারে। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে বসে একজন কথাসাহিত্যিক যে কাল্পনিক উপন্যাস লিখছেন তার প্রায় সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হচ্ছে একই বাড়ির বাস্তবতা থেকে।

শুভার্থিনী ক্ষমা দিদি সুলোচনাকে চুপি চুপি বলছেন, “তুই বলে এই ঘর করিস, আমরা হলে এতোদিনে কাপড় ফেলে পালাতুম।”

এরপরে ক্ষমাদি খবর দিচ্ছেন, “রাম বলেছে বেশি টাকা না পাঠিয়ে তোমার নামে একখানা তালুক কিনবে।”

সুলোচনার উত্তর : তালুকের নাম শুনে তো আমার পেট ভরবে না।...বাপের এক মেয়ে বটে---কিন্তু রোজ রোজ কে আব্দার শুনবে গা! লোক বলে, তুই বড় মানুষের মেয়ে, বড় মানুষের বউ, তোর দশা এমন কেন? তোর ভাবনা কিসের? লোকে তো ঘরের কথা জানে না—তা বলবো কি বলো। রোজ রোজ বাবাকে কত বলে পাঠাবো বলো—আবার তিনি মনে করেন তাঁর মেয়ে কত সুখে ভাসছে।”

বিশ্বনাথ এই ডায়ালগে রামতনু বসু লেনে নিজের শ্বশুরবাড়ির কথা বলেছেন কিনা তা পাঠ-পাঠিকারা বিবেচনা করে দেখবেন। কুঞ্জবিহারী দত্তর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাইমণি, তাঁর স্বামী গোপালচন্দ্র ঘোষ। গোপালচন্দ্রের একমাত্র সন্তান রঘুমণি। এঁর স্বামী নন্দলাল বসুই বিশ্বনাথের শ্বশুর। ‘সুলোচনা’ উপন্যাসে রামহরির শ্বশুরের নাম নিধিরাম সরকার। তিনি সম্মৌলিক কায়স্থ।

ক্ষমাদিদি মারফৎ দুঃখিনী সুলোচনা তাঁর প্রবাসী স্বামীর কাছে যে খবর পাঠিয়েছিলেন তা আমাদের এই তুলনামূলক আলোচনার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। "যদি তিনি আমাদের জ্যান্ত দেখতে চান একবার যেন ফিরে আসেন—তাঁর যক্ষের ধন নিয়ে কি স্বর্গে যাবো?"

সুরসিকা ক্ষমাদিদির প্রতিশ্রুতি তিনি রামহরিকে খবর পাঠাচ্ছেন—"জনকনন্দিনী ধুলোয় পড়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন— এইবার বুঝি সীতা ঠাকরুণ প্রাণত্যাগ করেন।"

উপন্যাসকে অবলম্বন করে বাস্তবের ছবি আঁকা অপরাধ না হলে, বিশ্বনাথ তাঁর উপন্যাসে রামহরির তরুণ পুত্র সুরথনাথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা কৌতূহলের উদ্রেক করে। সুদীর্ঘকায় কিন্তু কৃষ অথচ বাহুদ্বয়ের ও উরুদেশের অস্থি স্থূল ও সবল। গৌরাঙ্গ, মস্তকটি সুগঠিত ও সুগোল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কোমল কেশাবৃত ললাট প্রশস্ত ও সুবিস্তারিত। ভ্রূযুগল সুবক্র ধনুকের ন্যায় ঘন কেশরঞ্জিত, নেত্রদ্বয় সুদীর্ঘ ও ভাসমান।...গ্রীবা সমুন্নত ও স্কন্ধদ্বয় সুবিস্তারিত, দুই বাহু লম্বমান করিলে প্রায় দুই জানু স্পর্শ করিত। সুরথনাথের বয়স ষোড়শ বর্ষ। ঠিক যে বয়সে স্বয়ং বিশ্বনাথ বিবাহ করেছিলেন উত্তর কলকাতার রামতনু বসু লেনের ভুবনেশ্বরীকে।

উপন্যাসে বসু পরিবারের ছেলেপুলেদের নামগুলি মজার—'ছেঁড়া', 'ভাঙ্গা,' 'গোঁড়া,' 'খেঁদি', 'ভুতী', 'পদী', ইত্যাদি।

পরবর্তী পর্বে রামহরি দেশে ফিরেছেন, সুলোচনা ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে নিজের দুঃখের কথা বলতে লাগলেন। "ছেলেটির হাত ধরে পথের ভিখারিনী হয়ে বেড়াব?"

রামহরি তখনও যৌথপরিবারে বিশ্বাস হারাননি। "দেখো মেজো বউ, লোকে তোমার কথা শুনলে বলবে তুমি ঘর ভাঙতে চাও, আর তুমি দাদার ছেলেমেয়ের হিংসা করো। না হলে তোমার কান্নাকাটির কোনো কারণই তো দেখতে পাইনে।"

বিবেকানন্দপিতার উপন্যাসের সুবিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পুত্র

সুরথনাথের বিবাহবর্ণনা।

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে বিবাহ উপলক্ষে যে বেহিসেবী কাণ্ডকারখানা চলত তার হৃদয়গ্রাহী কিন্তু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবাহবাসরের সঙ্গে স্বয়ং বিশ্বনাথের বসুপরিবারে বিবাহের তুলনীয় কিছু আছে কি না তা এতদিন পরে কারও পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয় ; তবে পাঠকপাঠিকারা মানসচক্ষে একটা ধারণা করে নেবার স্বাধীনতা অবশ্যই দাবি করতে পারেন।

যাঁরা কল্পনার সঙ্গে ঘটনাকে মিলিয়ে দেখবার জন্য সব সময় তেমন ব্যস্ত নন তাঁরা বুঝতে পারবেন, নানা পারিবারিক উৎসবের ঘূর্ণিপাকে স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে অষ্টাদশ, উনিশ ও বিশ শতকের বাঙালি কেন অর্থসঞ্চয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজি বলেছিলেন, যারা কখনও লাখ টাকার ওপর বসলো না তারা কেমন করে বৈরাগ্যে আগ্রহী হবে?

'সুলোচনা' উপন্যাসে যৌথ পরিবারের নানা সমস্যা ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে। লেখক নিপুণভাবে নানা ঘটনার মাধ্যমে যে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছেন তা একমাত্র ভুক্তভোগীর পক্ষেই বর্ণনা করা সম্ভব।

মূল উপন্যাসে যেমন সমস্যা আছে তেমন সমাধানসূত্রও রয়েছে। যথাসময়ে আসরে উপস্থিত হয়েছেন এক সন্ন্যাসী। বাল্যকালে গৌরমোহন মুখার্জির ভিটে থেকে বেরিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসগ্রহণকারী পিতৃদেব দুর্গাপ্রসাদের কথাই কি অজান্তে বিশ্বনাথের কল্পনায় উপস্থিত হয়েছে? বড়ই কঠিন প্রশ্ন। তবে গল্প-উপন্যাসে আজও 'উইশফুল থিংকিং'-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়নি। নিপুণ পাইলটের মতন আকাশচারী বিমানকে নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনার বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সন্ন্যাসীর পুত্র এবং সন্ন্যাসীর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত।

আড়াইশ পৃষ্ঠার 'সুলোচনা' উপন্যাস পড়া শেষ করে কোনো সন্দেহই থাকে না ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সুলোচনা সম্বন্ধে যা লিখে গিয়েছেন তা সত্য, এই উপন্যাস স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃদেবেরই রচনা।

ভূপেন্দ্রনাথ পারিবারিক সূত্র থেকে বলেছেন, আর্থিক অনটনেই এই

উপন্যাস ছাপানো হয় জ্ঞাতি কাকা গোপালচন্দ্রের নামে। কিন্তু উপন্যাস প্রকাশকাল [১৮৮২] বিবেচনা করলে আন্দাজ করা যায়, এই সময় স্বামীজির ভিটেবাড়িতে যে গৃহবিবাদ পাকিয়ে উঠছে, মামলা মোকদ্দমার মাধ্যমে তা পরিবারের আর্থিক সর্বনাশ অবধারিত করবে এবং তার রেশ চলবে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের শেষ শনিবার পর্যন্ত।

পটভূমি হিসেবে এইটুকু বলা যায়, হাইকোর্টের আপীলে জিতেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

মামলায় হেরে গিয়েও জ্ঞানদাসুন্দরী বাড়ির অংশ অধিকার করে বসে আছেন। পরবর্তীকালে সর্বস্ব হারিয়ে তিনি স্বামীজির কাছে অর্থভিক্ষা করছেন। স্বামীজি তাঁকে অর্থ না দিয়ে থাকতে পারলেন না।

৬ আগস্ট ১৮৯৯ স্বামীজি তাঁর বিদেশিনী অনুরাগিনী মিসেস সারা বুলকে লিখছেন : "দুশ্চিন্তা? সম্প্রতি তা যথেষ্ট। আমার খুড়িকে আপনি দেখেছেন তিনি আমাকে ঠকাবার জন্যে তলে-তলে চক্রান্ত করেন। তিনি ও তাঁর পক্ষের লোকজন আমাকে বলেন, ৬০০০ টাকায় বাড়ির অংশ বিক্রয় করবেন, আর তা আমি সরল বিশ্বাসে ৬০০০ টাকায় কিনি। তাঁদের আসল মতলব, তাঁরা বাড়ির অধিকার দেবেন না, এই বিশ্বাসে যে, আমি সন্ন্যাসী হয়ে জোর করে বাড়ির দখল নেবার জন্য কোর্টে যাব না।"

স্বামীজি অবশ্য হাল ছাড়েন নি। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, মায়ের অপমান যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। মামলার জন্যে মঠের তহবিল থেকে তিনি ৫০০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেজন্যে কিছু সমালোচনাও হয়, তবে স্বামীজি সেই দেনা শোধও করেন।

সংখ্যাহীন মামলায় জর্জরিত স্বামীজির বিধবা জননী ভুবনেশ্বরী। ১৯০২ জুন মাসে মর্ত্যলীলার শেষ শনিবার স্বামীজি বেলুড়মঠে বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়িতে গিয়েছিলেন। বোনের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষাও করেছিলেন, তারপর উদগ্রীব হয়ে পারিবারিক কুরুক্ষেত্রের সমাধানসূত্র খুঁজতে বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভিটেবাড়ির শরিক হাবুল দত্ত। স্বেচ্ছায় বিবাদ মিটিয়ে নেবার কথা বললেন হাবুল দত্ত।

স্বামীজি সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। বললেন, যদি মীমাংসা হয় তা হলে আরও হাজার টাকা দেবেন। হাবু দত্ত ও তমু দত্ত রাজি। প্রিয় বন্ধু ও গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন হাবুলের সঙ্গে অ্যাটর্নি পল্টুবাবুর কলকাতা অফিসে গেলেন।

দুই পক্ষের অ্যাটর্নিদের মধ্যে বারবার আলোচনা চললো। ২রা জুলাই (স্বামীজির মহাসমাধির মাত্র দুদিন আগে) শান্তিরামের কাছ থেকে নিয়ে পল্টুকে হাবু দত্ত ও তমু দত্তর দাবি অনুযায়ী চারশ টাকা দেওয়া হল। অর্থাৎ আপাতত শেষ হল দীর্ঘদিনের সংঘাত। নিবেদিতার এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, শেষ দেখার সময়ে স্বামীজি তাঁকে বলেন, মামলারও নিষ্পত্তি হয়েছে আপসে—এবিষয়ে তাঁর কোনো খেদ নেই। অর্থাৎ অভাগিনী মায়ের সব সমস্যা অবিশ্বাস্যভাবেই সমাধান করে গেলেন আমাদের চিরপ্রণম্য স্বামী বিবেকানন্দ।

অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দকে বুঝতে গেলে সুলোচনা অবশ্যই পঠনীয়।

স্বামীজির বিচিত্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শতাব্দীর দূরত্ব পেরিয়ে পিতৃদেব রচিত উপন্যাসের সামাজিক গুরুত্ব অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দর বাবা-মা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে আরও জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তাঁদের কাছে অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'সুলোচনা' উপন্যাসটি নিতান্ত ছোট প্রাপ্তি নয়।

বাবাও সন্ন্যাসী, ছেলেও সন্ন্যাসী : একনজরে বিশ্বনাথ দত্ত

১৮৩৫	বিশ্বনাথ দত্তের জন্ম। পিতা দুর্গাপ্রসাদ, মাতা শ্যামাসুন্দরী (ঘোষ)।
১৮৩৬	পিতা দুর্গাপ্রসাদের ২২ বছর বয়সে গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ।
?	শিক্ষা, গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়, পরবর্তীকালে যার নাম ওরিয়েন্টাল সেমিনারি।
?	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮৪১	ভাবী-পত্নী ভুবনেশ্বরী বসুর জন্ম। (পিতা নন্দলাল বসু, মাতা রঘুমণি।)
১৮৫১	বিবাহ ভুবনেশ্বরী (বসু)—স্ত্রীর বয়স ১০।
?	প্রথম পুত্রের জন্ম (শৈশবে মৃত)
?	প্রথম কন্যার জন্ম (শৈশবে মৃত)
১৮৫৬	কন্যা হারামণির জন্ম (এঁর মৃত্যু ২২ বছরে, মতান্তরে ২৬ বছরে)।
১৮৫৯	অ্যাটর্নি চার্লস এফ পিটারের অধীনে আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক।
১৮৬০	চার্লস পিটারের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।
১৮৬১	অ্যাটর্নি হেনরি জর্জ টেম্পলের অধীনে আর্টিকেল্‌ড ক্লার্কশিপ। এই অফিসে তাঁর সহকর্মী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা ভুবনমোহন দাশ।
১৮৬৩	পুত্র নরেন্দ্রনাথের (ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম। (স্বামীজির মহাসমাধি ১৯০২)। ভূমিষ্ঠ হবার পরে দুর্গাপ্রসাদের ভগ্নী বলেন, "সেই চেহারা, সেই সবই, দুর্গাপ্রসাদ কি আবার ফিরে এল?" আনন্দিত বিশ্বনাথ নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি পর্যন্ত দান করেন।
১৮৬৪	অ্যাটর্নি হেনরি জর্জ টেম্পল-এর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।

১৮৬৫ ব্যারিস্টার ডবলু সি বনার্জির পিতা গিরিশচন্দ্র বনার্জি ও দিগম্বর মিটারের কাছ থেকে চরিত্র সার্টিফিকেট।

১৮৬৬ অ্যাটর্নি ও প্রক্টর হিসেবে নথিভুক্ত হবার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন ও অনুমতি লাভ।

১৮৬৭ কাকা কালীপ্রসাদের মৃত্যু। অন্য মতে কালীপ্রসাদের মৃত্যু ১৮৬৯, মৃত্যুশয্যায় শাস্ত্রপাঠ করেন তরুণ নরেন্দ্রনাথ। এঁর স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী, পুত্র কেদারনাথ ও তারকনাথ। বিশ্বেশ্বরীর মৃত্যু ৯৭ বছর বয়সে ১৫ ডিসেম্বর ১৯১২।

১৮৬৮ অ্যাটর্নি আশুতোষ ধরের সঙ্গে পার্টনারশিপে 'ধর অ্যান্ড দত্ত' অ্যাটর্নি ব্যবসার শুরু।

১৮৬৯ পুত্র মহেন্দ্রনাথের জন্ম (এঁর মৃত্যু ১৯৫৬)।

১৮৭১ দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে কলকাতার বাইরে ভাগ্যসন্ধানে যাত্রা।

১৮৭২ ওকালতি লখনৌ (বার লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় উল্লেযোগ্য ভূমিকা)

১৮৭৬ ওকালতি লাহোর, সেখানে বঙ্গীয় সমাজে প্রথম ঘটে দুর্গাপূজা।

১৮৭৭ তখনকার সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস পরে মধ্যপ্রদেশ রায়পুরে ভাগ্যসন্ধানে এলেন বিশ্বনাথ, ১৪ বছরের পুত্র নরেন্দ্রনাথ তখন থার্ড ক্লাশের ছাত্র।

ভুবনেশ্বরী, পুত্র নরেন্দ্রনাথ, মহেন্দ্রনাথ ও কন্যা যোগীন্দ্রবালার রায়পুরে যোগদান কয়েকমাস পরে। কলকাতা থেকে নাগপুর ৭১০ মাইল। নাগপুর থেকে গোরুর গাড়িতে রায়পুর—পথে বিস্তীর্ণ জঙ্গল, সেখানে ডাকাত ও বাঘের উপদ্রব। এঁদের সহযাত্রী পরবর্তীকালে বিখ্যাত হরিনাথ দে'র পিতা রায়পুরের উকিল রায়বাহাদুর ভূতনাথ দে। তাঁর স্ত্রী এলোকেশী।

একই বছরে ভুবনেশ্বরী দুই আত্মীয়াকে ৫০০ টাকা করে দিয়ে বিধবা বামাসুন্দরী ও বিন্দুবাসিনীর কাছ থেকে গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের ভিটেবাড়ির এক আনা ছ গণ্ডা দু'কড়া দু ক্রান্তি ভাগ কিনলেন।

পরবর্তীকালে অভিযোগ, ভিটেবাড়িতে বিধবা বামাসুন্দরী ও বিন্দুবাসিনীর শেয়ার ভুবনেশ্বরীর বেনামে কেনেন বিশ্বনাথের খুড়তুতো ভাই তারকনাথ।

১৮৭৯ সপরিবারে কলকাতার যৌথপরিবারে প্রত্যাবর্তন। নরেন্দ্রনাথ ঐ বছরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বাবার কাছ থেকে রুপোর ঘড়ি পেলেন। পুত্র নরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ এ ক্লাশে ভর্তি হলেন।

১৮৮০ ৪ঠা সেপ্টেম্বর কনিষ্ঠপুত্র ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম (মৃত্যু ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬১)

গৌরমোহন দত্তের দৌহিত্রী শচীমণি দাসীর যৌথ সম্পত্তি বিভাজনের জন্য হাইকোর্টে মামলা।

১৮৮১ স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পুত্র নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পাশ করলেন।

নভেম্বর : ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে পুত্র নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ।

১৮৮২ ১৫ জানুয়ারি দক্ষিণেশ্বরে নরেন ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ।

এপ্রিল : সুলোচনা উপন্যাসের প্রকাশ ; লেখকের জায়গায় জ্ঞাতিকাকা গোপালচন্দ্র দত্তের নাম।

৮ই অক্টোবর কন্যা হারামণির মৃত্যু ২৬ বছরে (মতান্তরে ২২ বছর)

১৮৮৩ বাস্তুভিটা ছেড়ে পৃথক অন্ন ও ৭ ভৈরব বিশ্বাস লেনে বাড়িভাড়া।

বি এ পাশ করার আগেই নরেনকে বি. এল পড়ার জন্য কলেজে ভর্তি ও চাঁদনি থেকে কোটপ্যান্টের অর্ডার। বন্ধু অ্যাটর্নি নিমাই বসুর অফিসে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশি শুরু।

১৮৮৪ ৩০ জানুয়ারি নরেন্দ্রনাথের বি. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল।

২৩ ফেব্রুয়ারি সাতকড়ি মৈত্রের বরাহনগর বাসভবনে নরেন্দ্রনাথ গানবাজনার পরে সবে শয্যাগ্রহণ করেছেন, এমন

সময় বন্ধু 'হেমালী' রাত্রি প্রায় দুইটার সময় খবর দিল, পিতা বিশ্বনাথ অকস্মাৎ ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন বিশ্বনাথের মরদেহ একটি ঘরে শায়িত। অন্য মতে, নরেন্দ্রনাথ সোজা নিমতলা ঘাটে চলে আসেন। এইসময় মহেন্দ্রনাথের বয়স পনেরো। কর্পোরেশন ডেথ রেজিস্টারে নরেন্দ্রনাথের সই রয়েছে। মৃত্যুর কারণ : ডায়াবিটিস।

১৮৮৫ শরিকী বিরোধে স্বামীর ভিটেবাড়ির পরিবেশ বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠায় ভুবনেশ্বরী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ৭ রামতনু বসু লেনে নিজের মায়ের কাছে চলে গেলেন।

কিন্তু কয়েক মাস পরে আবার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটে ফিরে এসে দেখেন পরলোকগত স্বামীর খুড়তুতো ভাই উকিল তারকনাথ দত্ত একটি পাকা ঘর তৈরি শুরু করেছেন। মায়ের নির্দেশে, তারকনাথের বেআইনি কাজ নিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে উত্তেজনাময় বচসা।

মার্চ : নরেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম অসুখ, তাঁকে শ্যামপুকুরে আনা হল।

১৮৮৬ ২৫শে ফেব্রুয়ারি উকিল তারকনাথের মৃত্যু ৪৮ বছর বয়সে।

১৫ জুলাই তারকনাথের বিধবা জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী হাইকোর্টে ভুবনেশ্বরী দাসীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন, অভিযোগ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়ির কিছু অংশ ভুবনেশ্বরীর বেনামে তাঁর স্বামীই কিনেছিলেন।

১১ আগস্ট হাইকোর্টে ভুবনেশ্বরীর আবেদন : প্রয়াত স্বামীর মক্কেলদের কাছ থেকে অনাদায়ী টাকা আদায়ের ছাড়পত্রের জন্য। মায়ের বাংলা সই সনাক্ত করলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১২ আগস্ট হাইকোর্টে ভুবনেশ্বরীর আবেদন মঞ্জুর—আদালত থেকে বেরিয়েই নরেন্দ্রনাথ ছুটলেন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে—গলায় ক্যানসার রোগে ঠাকুর সেখানে মৃত্যুশয্যায়।

১৬ আগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রাত্রি ১টা ২ মিনিটে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মর্তলীলার অবসান।

২৮ নভেম্বর জ্ঞানদাসুন্দরী ভিটেবাড়ির মালিকানা নিয়ে যে মামলা দায়ের করেছেন অ্যাটর্নি নিমাই বসুর মাধ্যমে ভুবনেশ্বরী ও নরেন্দ্রনাথ তার বিস্তারিত জবাব দিলেন।

১৮৮৭ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি উইলিয়ম ম্যাকফারলেনের কক্ষে বিচার শুরু। দু'পক্ষের সাক্ষীসাবুদ অনেক। এঁদের মধ্যে আছেন প্রতিবেশী ডাক্তার চন্দ্রনাথ ঘোষ ও দত্ত বাড়ির পুরোহিত সারদাপ্রসাদ মজুমদার।

৮ মার্চ স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। তাঁকে জেরা করলেন বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার পিউ সায়েব। পেশা কি এই প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন, আমি বেকার।

১৪ মার্চ হাইকোর্টের রায়—জ্ঞানদাসুন্দরী অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন, মামলার সব ব্যয়ভার তাঁকেই বহন করতে হবে। জ্ঞানদাসুন্দরী হাইকোর্টে আপীল ফাইল করলেন।

১৫ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি আর্থার উইলসন ও বিচারপতি রিচার্ড টটেনহ্যাম পূর্বতন রায় বহাল রাখলেন, জয় বিশ্বনাথ পত্নী নরেন্দ্রজননী ভুবনেশ্বরীর।

১৮৮৮ ২০ জানুয়ারি সম্পত্তি বিভাজনের জন্য শচীমণির মামলা আদালতের এক স্থগিতাদেশে এতোদিন ঝুলে ছিল। পূর্বতন বাঁটোয়ারা রায় কার্যকরী করার জন্যে ভুবনেশ্বরীর পক্ষে আদালতে আবেদন।

আদালতের হস্তক্ষেপে ভুবনেশ্বরী তাঁর অংশ বুঝে পেলেন।

নট আউট গুরুর নট আউট শিষ্য

স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ব্যাপারেই আলাদা, তাঁদের আচার ও আচরণও অবিশ্বাস্য। এঁদের প্রথম মিলনে বাংলার রসগোল্লার মস্ত ভূমিকা রয়েছে। ঠাকুরের ভক্ত এবং নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত তাঁর নরেনকে আধ্যাত্মিক কথা বলেননি, বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলে ভট্‌চায্যিমশাই খুব ভাল রসগোল্লা খাওয়ান।

দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ থেকেই অবিশ্বাস্য এক আন্দোলন গড়ে উঠল। বিবেকানন্দজীবনে বিস্তারিতভাবে প্রবেশের আগে গুরুটিকে একটু ভালভাবে জেনে রাখা দরকার এবং সেই সঙ্গে শিষ্যটির কী সম্পর্ক দাঁড়াল।

হিসেব মতো, ১২২৫ সালে আমাদের পরমপুরুষ ১৭৫ নট আউট, যদিও তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ এই কলকাতা শহরে মাত্র ৫০ বছর বয়সে। তারপরেও হেসে খেলে ১২৫ বছর কেমন করে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের মাসিক পাঁচ টাকা মাইনের ছোটভট্‌চায্যি বেঁচে রইলেন তা ঐতিহাসিকদের এবং সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে এক পরমবিস্ময়। ইতিহাসের ফর্মুলা অনুযায়ী ব্যাপারটা ভীষণই কঠিন, কিন্তু খেয়ালি মহাকাল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন, রানি রাসমণির ভবতারিণী মন্দিরের প্রায়-নিরক্ষর, জুনিয়র পুরোহিত একদিন এদেশের হৃদয়েশ্বর হয়ে উঠবেন এবং তাঁর জীবন ও বাণী সাগরপারের অনুসন্ধিৎসুদেরও আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে।

তাঁকে যুগাবতারও বলা হয়েছে, ঘরে ঘরে তাঁর জন্য মঙ্গলশঙ্খ বাজে। তাঁকে যাঁরা ঠিকমতন বুঝতে পেরেছেন তাঁরা নিশ্চিত ১৭৫ নট আউটটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের পক্ষে কিছুই নয়, তাঁর প্রধান চেলার

অতিশয়োক্তি দোষ ছিল না। সেই উনিশ শতকের শেষপ্রান্তের বেলুড় মঠের পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন, দেড় হাজার বছরের মধ্যে তাঁর পুনরাবির্ভাব হবে এবং তার আগের দেড় হাজার বছর তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন, আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে সার্ধশতবর্ষ নয়, সার্ধসহস্রবছর ধরে শ্রীরামকৃষ্ণের অপ্রতিহত ঠিকানা এই রাকমৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

গুরু তাঁর দিব্যচক্ষু দিয়ে প্রধান চেলাটিকে সযত্নে নির্বাচন করে সস্নেহে লালন করেছিলেন। হাতে তেমন সময় ছিল না, যন্ত্রণাময় ক্যানসার-কণ্টকিত রোগভোগের মধ্যেই দূরদর্শী ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞের মতো তিনি সকল ভক্তের নৈতিক সমর্থন ও উৎসাহ নিয়ে নরেন্দ্রনাথকেই নির্বাচন করেছিলেন।

অসাধ্য সাধন হয়েছিল, শিষ্য তাঁর বিস্ময়কর শক্তিতে কপর্দকহীন হয়েও প্রিয় প্রভুর নামাঙ্কিত যে আন্দোলন ও সঙ্ঘ তৈরি করলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের তা প্রথম। ভগবান বুদ্ধের ভুবনবিজয়ের পর যেন এই প্রথম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল, দেশ দেশ নন্দিত করে মন্দ্রিত হল বৈপরীত্যে ভরা এক বিস্ময়কর ব্রাহ্মণের বাণী, যিনি নৈষ্ঠিক পুরোহিত হয়েও নিজের কাজের জন্য নির্বাচন করে গেলেন এক কায়স্থ সন্তানকে। এদেশের ইতিহাসে একটা অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেল।

ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রবিদরা অকারণে অষ্টোত্তরী শতনামে মুখরিত হওয়ায় বিশ্বাস করেন না। প্রশস্তির সঙ্গে তাঁরা সমালোচনাও করে থাকেন। তাঁদের শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, বিধাতার এই সৃষ্টিতে 'পারফেকশন' অথবা নিখুঁত বলে কিছুই নেই, যা আছে তা কেবল পারফেকশনের সন্ধান—নিরন্তর সন্ধান।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান চেলাটি বয়সে তাঁর থেকে পঁচিশ বছরের ছোট—তাঁর জন্ম ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ আর নরেন্দ্রনাথের ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩। ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ মধ্যযামিনীতে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে যখন তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হল তখন প্রধান শিষ্যের বয়স মাত্র তেইশ, প্রবল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নবীন এক সন্ন্যাসীকুলের সৃষ্টি হল, তারপর

ভাগ্যসন্ধানে বিশ্বপরিক্রমা এবং অবশেষে কয়েক হাজার বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তুলনাহীন এক সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সৃষ্টি যার নাম রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন।

সময়াভাব ছিল। নির্বাচিত শিষ্যটি পঞ্চাশ বছরও বাঁচলেন না, হিসেব অনুযায়ী আচার্যের দেহাবসানের পরে মাত্র পনেরোটি বছর এবং কয়েকটি মাস। ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদের মতে অকালমৃত্যু আদর্শ সাকসেশন প্ল্যানের পরিপন্থী। অর্থাৎ নিজে পঞ্চাশ বছরে বিদায় নিয়ে, পরবর্তী দায়িত্ববানের চল্লিশ বছরের আগেই চলে যাওয়াটা ভালো কথা নয়। সত্যি কথাটা হল, রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল নয় তার প্রমাণ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের স্বল্পপরিসর জীবন।

রামকৃষ্ণ আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়েরই সগৌরব উপস্থিতি। মূল মঠ ও মিশনে ত্যাগী সন্ন্যাসীদের ওপর নির্ভরতা, কিন্তু গৃহীদের সমর্থন ছাড়া যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান নিঃসঙ্গ হয়ে উঠতে পারে তাও পুরোপুরি উপস্থিত।

১৭৫ বছরের পরও কেমন করে নট আউট? এই বিপুল প্রাণশক্তির গোপন উৎস কোথায়? তা খোঁজ করলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সন্ন্যাসী হওয়া সহজ নয়, সে এক দুর্গম জীবনযাত্রা। তবু এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে দেশজননী নিয়মিতভাবে সন্তান দান করে চলেছেন সন্ন্যাসী সঙ্ঘকে এবং তাঁদের বিপুল নিষ্ঠায় এবং দিবারাত্রের সাধনায় সন্ন্যাসজীবন সকলের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছে। নবীন এই সন্ন্যাসীসঙ্ঘের কাছে বিপুল প্রত্যাশা ছিল প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের। "শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যচরণ স্পর্শে যে মুষ্টিমেয় যুবকদলের অভ্যুদয় হয়েছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তারা আসাম থেকে সিন্ধু, হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁর উপদেশামৃত প্রচার করছে। তারা পদব্রজে ২৩,০০০ ফুট ঊর্ধ্বে হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করে তিব্বতের রহস্য ভেদ করেছে। তারা চীরধারী হয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছে।"

সন্ন্যাসী ব্যাপারটা কী তা বিবেকানন্দ একবার বিদেশিদের কাছে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন। "আমি যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তাকে বলা হয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। 'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ 'যে ব্যক্তি সম্যকভাবে ত্যাগ করেছে।' এটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। যীশুর জন্মের ৫৬০ বছর আগে বুদ্ধও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যতম সংস্কারক মাত্র। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও আপনারা সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাবেন। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বলতে চার্চ বোঝায় না এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পুরোহিত নন। পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি থাকে না, তাঁরা বিয়ে করেন না, তাঁদের কোনো সংস্থা নেই। তাঁদের একমাত্র বন্ধন গুরুশিষ্যের বন্ধন। এই বন্ধনটি ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধু শিক্ষাদানের জন্য যিনি আসেন এবং সেই শিক্ষার জন্য কিছু মূল্য বিনিময় করেই যাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে যায়, তিনি প্রকৃত শিক্ষক নন। ভারতবর্ষে এটি প্রকৃত অর্থে দত্তক গ্রহণের মতো। শিক্ষাদাতা গুরু আমার পিতার অধিক, আমি তাঁর সন্তান। সর্বাগ্রে পিতারও আগে, তাঁকে শ্রদ্ধা করব এবং তাঁর বশ্যতা স্বীকার করব, কারণ ভারতবাসীরা বলেন, পিতা আমার জন্মদান করেছেন কিন্তু গুরু আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, সুতরাং পিতা অপেক্ষা গুরু মহত্তর। আজীবন আমরা গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করি।"

গুরু সম্বন্ধে স্বামীজির মন্তব্য আজও পাঠযোগ্য। "এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পেয়েছিলাম, তিনি অদ্ভুত লোক।" 'বৃদ্ধ' শব্দটি হিসেবিদের কানে একটু ধাক্কা দেয়, কারণ রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রর সাক্ষাৎকার ১৮৮১ সালে, গুরুর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ এবং তৎকালীন ফটোগ্রাফে তাঁকে বার্ধক্যতাড়িত মনে হয় না। শারীরিক বিপর্যটা ঘটেছিল তিরোধানের কয়েক মাস আগে কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ১৮৮৬ সালে। সদাশয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহানিদ্রায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ যে ছবিটি তোলবার জন্য দশ টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন সেটি দেখলে মন দুঃখে ভরে ওঠে।

এবার গুরু-শিষ্যের প্রথম পরিচয় নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা। নরেন্দ্রনাথের মেজ ভাই এ-বিষয়ে রসগোল্লার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা কমবয়সিদের বেশ ভালো লাগে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথের আত্মীয় ডাক্তার রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে বিসূচিকা রোগে তিনটি ছোট মেয়ে (মেয়ে ও ভাগ্নি) সাতদিনের মধ্যে মারা যায়। শোকার্ত রাম দত্ত এই সময় শান্তি সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। লোকেরা তখন হাসি ও ব্যঙ্গচ্ছলে পরমহংসদেবকে great goose বলত। রামদাদার মাধ্যমেই সিমলের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের যোগাযোগের সূত্রপাত।

রামদাদা এঁর কাছে দীক্ষা নেওয়ায় নানা নিন্দার সম্মুখীন হতেন, কিন্তু তাঁর গুরুপ্রশস্তিতে ভাটা পড়েনি। তিনি নরেন্দ্রর পড়শি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে (পরবর্তীকালে ঠাকুর যাকে আদর করে 'সুরেশ' বলে ডাকতেন) ঠাকুরের কথা বলেন। সুরেশ নরম না হয়ে পরিহাস করেছিলেন, "ওহে রাম, তোমার গুরু পরমহংস যদি আমার কথার উত্তর দিতে পারে, তবে ভালো, নইলে তার কান মলে দিয়ে আসব।"

সেকালের কলকাতার কথার স্টাইল অনুযায়ী আর একজন ডাক্তার (স্যর কৈলাসচন্দ্র বসু) একই ভাষায় বলেছিলেন, "রাম, তোমার পরমহংস যদি ভালো লোক হয় ভালো, নইলে তাঁর কান মলে দেব।" বোঝা যাচ্ছে, কান মলে দেবার ইচ্ছা প্রকাশই অবজ্ঞা প্রকাশ করবার রীতি ছিল!

বিবেকানন্দ ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন উত্তর কলকাতায় মধু রায় লেনে রামদাদার বাড়িতে। স্মরণীয় সেই দর্শনের মনোগ্রাহী বিবরণ তিনি রেখে গিয়েছেন। "বিকালে পরমহংস মশাই রামদাদার বাড়িতে এলেন। দিনটি শনিবার কি রবিবার হবে। ঘরে ও বাইরে মোট চল্লিশ জনের মতন লোক। পরমহংস মশাই পশ্চিমদিকের আলমারির বা সার্শি দেওয়া তাকের কাছে বসে আছেন, পিছনে তাকিয়া। দুটি গ্যাসের বাতি জ্বলছে।

"আমার প্রথম এইরূপ মনে হইল—দক্ষিণেশ্বর থেকে এই যে

লোকটি এসেছে, একেই কি বলে 'পরমহংস'? দেখিলাম লোকটির চেহারাতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মতো, বর্ণ খুব কালো নয়, তবে কলিকাতার সাধারণ লোকের বর্ণ হইতে কিছু মলিন। গালে একটু একটু দাড়ি আছে, কপচানো দাড়ি। চোখ দুটি ছোট—যাহাকে বলে 'হাতি চোখ'। চোখের পাতা অনবরত মিট মিট করিতেছে, যেন অধিক পরিমাণে চোখ নড়িতেছে। ঠোঁট দুটি পাতলা নয়। নিচুকার ঠোঁট একটু পুরু। ঠোঁট দুটিব মধ্য হইতে উপরের দাঁতের সারির মাঝের কয়েকটি দাঁত একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে। গায়ে জামা ছিল ; তাহার আস্তিনটা কনুই ও কবজির মাঝ-বরাবর আসিয়াছে। খানিকক্ষণ পরে, জামা খুলিয়া পাশে রাখিয়া দিল এবং কোঁচার কাপড়টি লম্বা করিয়া বাঁ কাঁধে দিল। ঘরটি বেশ গরম হইয়াছিল। একজন লোক বড় এড়ানী পাখ অর্থাৎ বড় পাখা লইয়া পিছন দিক হইতে বাতাস করিতে লাগিল। কথাবার্তার ভাষা কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের ভাষার মতো নয়, অতি গ্রাম্য ভাষা, এমনকি, কলিকাতার শহরের রুচি বিগর্হিত। কথাগুলি একটু তোতলার মতো। রাঢ়দেশীয় লোকের মতো উচ্চারণ। ন এর জায়গায় ল উচ্চারণ করিতেছে, যেমন 'লরেনকে বললুম' ইত্যাদি। সম্মুখে একটি রঙিন বটুয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে কি মসলা আছে ; মাঝে মাঝে একটু মসলা লইয়া মুখে দিতেছে।

আমাদের বয়স তখন অল্প এবং আমরা শিক্ষিত সমাজে পরিবর্ধিত, এইজন্য, ভাষা ও উচ্চারণ শুনিয়া পরমহংস মশাই-এর প্রতি মনে একটি অবজ্ঞার ভাব আসিল—এই লোকটাকে রামদাদা কেন এত সম্মান ও শ্রদ্ধা ভক্তি করেন? চুপ করিয়া বসিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে আবার ভাবিতে লাগিলাম—কেন রামদাদা এই লোকটাকে এত সম্মান করেন ; দুর্ধর্ষ সুরেশ মিত্তির এবং বুদ্ধিমান নরেন্দ্রনাথই বা কেন কয়েকবার এর কাছে গেছেন? লোকটার কি ব্যাপার?"

মহেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণর প্রথম দর্শনের যে বিবরণ রেখে গিয়েছেন তার মধ্যে আকস্মিক ভাবসমাধিরও বর্ণনা আছে।

আরও মনোগ্রাহী বর্ণনা মহেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন লীলাপ্রসঙ্গর রচয়িতা

স্বামী সারদানন্দের কাছে। স্বামী সারদানন্দ ও মহেন্দ্রনাথ পরবর্তী সময়ে কিছুদিন একত্রে লন্ডনে সময় কাটিয়েছিলেন।

একবার পুজোর সময় পরমহংসদেব ডস্ট্‌ কোম্পানির মুচ্ছুদী গৃহীভক্ত সুরেশ মিত্তিরের (১৮৫০-৯০) বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঠাকুরদালানে মারবেল পাথরের মেঝের উপর তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছিল।

"মেয়েরা ঘরে জানালা হইতে পরমহংস মশাইকে দেখিতেছিলেন। পরমহংস মশাই-এর সম্মুখে অনেক লোক দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আহার করাইতেছিলেন। পরমহংস মশাই উপু হইয়া বসিয়া আহার করিতেছিলেন। এইরূপ বসিয়া আহার করাই তাঁহার দেশের প্রথা। আমরাও দেখিয়াছি যে, পরমহংস মশাই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আহার করিতেন না, হাঁটু দুইটি উঁচু করিয়া উপু হইয়া বসিয়া আহার করিতেন।

"তিনি আহার করিতেছেন ও বলিতেছেন যে, পূর্বে তিনি বড় বিভোর থাকিতেন, বাহ্যজ্ঞান কিছুই থাকিত না, কাপড় পরার কথা মনে থাকিত না. একেবারেই বে-ভুল, বে-এক্তিয়ার হইয়া থাকিতেন, কিন্তু এখন তাঁহার সে ভাবটি কাটিয়া গিয়াছে, এখন তিনি কাপড় পরিয়া থাকেন এবং লোকজনের সম্মুখে বেশ সভ্যভব্য হইয়া বসিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া উপস্থিত লোকসকল ও যে সকল মেয়েরা জানালা হইতে দেখিতেছিলেন, একটু হাসিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ হাসিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে ও-কথা ঠিক তো বটেই।' সকলে এই বলিয়া আমোদ করিয়া তাঁহাকে একটু উপহাস করিতে লাগিলেন।

পরমহংস মশাই উপু হইয়া বসিয়া একটু একটু খাইতেছেন ও এইরূপ কথা চলিতেছে। সকলেই মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বাঁদিকের বগলের প্রতি হঠাৎ পরমহংস মশাই-এর দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখেন যে, কাপড়খানি বাঁ-বগলের ভেতর জড়ানো রহিয়াছে আর তিনি দিগ্‌বসন হইয়া বসিয়া আছেন।

"এইরূপ দেখিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, 'আরে ছ্যা! আমার ওটা গেল না ; কাপড় পরাটা আর মনে থাকে না!' এই বলিয়া তিনি

তাড়াতাড়ি কাপড়খানি লইয়া কোমরে জড়াইতে লাগিলেন। যে সকল পুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার সকলে উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলেন, মেয়েরাও জানালা হইতে হাসিয়া উঠিলেন।

"কিন্তু পরমহংস মশাই-এর ভাব এত সরল, স্নিগ্ধ ও উচ্চ ছিল যে, কাহারো মনে দ্বিধা বা সংকোচ না আসিয়া এক অতীন্দ্রিয় ভাব আসিল। কেহ কেহ বলিলেন মশাই, আপনার কাপড় পরবার দরকার নেই। আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকুন। আপনার কোন দোষ হয় না।"

এদেশে প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিকথায় স্মরণীয় মানুষদের দেহবর্ণনা খুবই কম থাকে। ফলে, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দর দৈহিক উচ্চতা কত ছিল, গায়ের রং কীরকম, মুখের ভাস্কর্য কীরকম এসব জানতেও হিমশিম খেতে হয়। পশ্চিমের লেখকরা তাঁদের স্বাভাবিক বিচক্ষণতায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই কাজগুলি প্রথমেই সেরে নেন। এই সমস্যা পরমহংসদেবের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট। সাবধানী মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান নামক ছোট্ট বইতে দাদা নরেন্দ্রনাথ ও গুরু রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু দৈহিক বিবরণ রেখে দিয়েছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ হইল ক্ষুদ্র যাহাকে বলে—হাতিচোখ। মুখে বিশেষ ওজস্বী ভাব নাই ; বাহু-সঞ্চালন অতি ধীর ও করুণাব্যঞ্জক। সাধারণ অবস্থায় কণ্ঠস্বর মৃদু, এক প্রকার কাতর স্বর বলা যাইতে পারে। দেখিলে বোধহয়, যেন জগতের সম্পর্ক হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র থাকিবার—নিরিবিলি ও একাকী থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা, জগৎ যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে।"

এবার দাদার শরীর বিবরণ। "বিবেকানন্দের চোখ হইল বিস্ফারিত ; দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ; মুখ—সুডৌল, পুরুষ। মুখে আজ্ঞাপ্রদ ভাব, defiant attitude—বাধাবিঘ্ন-তুচ্ছকারী ভাব যেন জগৎকে গ্রাহ্যই করিতেছে না। বাহু-সঞ্চালন ও তর্জনী-নির্দেশ যেন জগৎকে শাসন করিবার বা আজ্ঞা দিবার মতো, যাহাকে বলে নাপোলিঅঁ-র মতো অঙ্গভঙ্গী ও অঙ্গ-সঞ্চালন, আজ্ঞা শুনিয়া যেন সকলে স্তব্ধ হইয়া যাইবে। প্রথম দৃষ্টিতে দুই জনের ভিতর এই পার্থক্য দেখা যায়।"

এরপর মহেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ, "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিশেষ লক্ষণ হইল—বহুবিধ স্নায়ু দিয়া বহু প্রকার চিন্তা করা। শক্তি-বিকাশ করা বা যাহাতে ক্ষাত্রশক্তির আবশ্যক, এইরূপ কার্য তাঁহার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের হইল গভীর চিন্তা করা মুখ্য, শক্তি-বিকাশ করা গৌণ। এইজন্য প্রথম অবস্থায় সাধারণ লোক তাঁহাকে কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া উন্মাদ ও বাতুল বলিয়া বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করিত।"

"বিবেকানন্দের হইল শক্তিবিকাশ করাই মুখ্য, গভীর চিন্তা করা হইল গৌণ।"

মহেন্দ্রনাথের মন্তব্য : "এই দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া উভয়ের জীবনী আলোচনা করিলে, উভয় ব্যক্তির মধ্যে বেশ একটি সামঞ্জস্য দেখা যায়। এ স্থলে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অনুকরণ করেন না। একজন অপরের অনুকরণ করিয়াছিলেন—ইহা অতীব ভুল মত। উভয়েই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র ও ব্যক্তিত্ব অটুট রাখিয়াছিলেন। পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিল ; কিন্তু উভয়ের কার্যক্ষেত্র ও বিকাশ-প্রণালী ভিন্ন ছিল। উভয়েই নিজ নিজ ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। উভয়েই জগৎকে এবং জগতের সম্পর্কিত ও সংশ্লিষ্ট ভাবসমূহ নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। উভয়েই নিজ ভাবে জগতের প্রশ্ন সকল মীমাংসা করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ শক্তি বিকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ তেজঃপূর্ণ, বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ যাঁহারা, তাঁহারা কেহ কাহাকেও অনুকরণ করিতে পারেন না। নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাই হইল এইরূপ পুরুষদিগের বৃত্তি।

"মনোবিজ্ঞান দিয়া বুঝিতে হইলে দেখা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব হইল ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে চলিয়া যাওয়া। বিবেকানন্দের ভাব হইল অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে চলিয়া আসা। শ্রীরামকৃষ্ণের হইল ঈশ্বর কেন্দ্র, জীব বা মনুষ্য পরিধি। বিবেকানন্দের হইল জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র, ঈশ্বর পরিধি।"

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এই যে, যদি দুই জনের মধ্যে এইসব বিষয়ের

পার্থক্য থাকে, তবে উভয়ের ভিতর সামঞ্জস্য কোথায়?

তার উত্তর সন্ধান করেছেন মহেন্দ্রনাথ। "ইহা জানা আবশ্যক যে, শক্তির প্রবাহ যদি কেন্দ্র হইতে খুব গভীর স্তরে যায়, তাহা হইলে উপবৃত্ত—Theory of Motion—গতিবার-এর নিয়ম। এই নিয়ম সূক্ষ্ম -স্নায়ু বা সূক্ষ্ম-শরীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর কেন্দ্র হইলেও, জীবেও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় বা ঈশ্বর-দর্শন হয় এবং বিবেকানন্দের জীব বা মনুষ্য কেন্দ্র হইলেও, পরিশেষে জীবেও ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় বা ঈশ্বরদর্শন হয়। দর্শনশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র—এই দুই শাস্ত্র দিয়া পর্যালোচনা করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে বুঝা যাইতে পারে।".

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহবর্ণনার আর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র লাহোর ট্রিবিউনের খ্যাতনামা সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তিনি ১৮৮১ সালে (যে বছর নরেন্দ্রর সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ) স্টিমারে রামকৃষ্ণের সহযাত্রী হয়েছিলেন। এই জাহাজের মালিক কেশবচন্দ্র সেনের জামাতা কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ। দক্ষিণেশ্বর ঘাটে পরমহংসদেব তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে জাহাজে উঠলেন, সঙ্গে এক ধামা মুড়ি ও সন্দেশ। তিনি লালপেড়ে ধুতি ও পাঞ্জাবি পরেছিলেন—পাঞ্জাবির বোতাম খোলা ছিল।

নগেন্দ্রনাথের বর্ণনা : "শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ ছিলেন। দাড়ি রাখতেন এবং তাঁর চোখ দুটি কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মীলিত হতো না—অন্তর্মুখী ছিল। তাঁর দৈর্ঘ ছিল মাঝারি। গড়ন ছিল পাতলা, প্রায় শীর্ণ বলা যায়, এবং চেহারা ছিল অত্যন্ত ছিপছিপে।...একটু তোতলা ছিলেন, কিন্তু সেই তোতলামি শ্রুতিমধুর ছিল। তিনি খুব সরল বাংলায় কথা বলতেন এবং প্রায়ই 'আপনি' ও 'তুমি' মিলিয়ে ফেলতেন।"

এই বিবরণ মিলছে না পরমাপ্রকৃতি সারদামণির স্বামী-বর্ণনার সঙ্গে। 'শ্রীশ্রী মায়ের কথা' বইতে ঠাকুরের চেহারা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : "তাঁর গায়ের রঙ যেন হরিতালের মতো ছিল—সোনার ইষ্ট কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতাম, দেখতুম সব গা

থেকে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে।...যখনই কালীবাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত, 'ঐ তিনি যাচ্ছেন' বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলাত না। ছোট তেল ধুতিটি পরে যখন থপ থপ করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, লোকে অবাক হয়ে দেখত।"

মঠের আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজখবর করে লিখেছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ওজন ও দৈর্ঘ লিপিবদ্ধ করা হয়নি।" বিদ্যাত্মানন্দ জানাচ্ছেন, ১৯৫৫ সালে ভাস্করকে নির্দেশ দিতে গিয়ে স্বামী নির্বাণানন্দ হিসেব করেছিলেন যে ঠাকুরের দৈর্ঘ ছিল ৫ ফুট ৯$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। এই সিদ্ধান্তে আসতে তিনি নির্ভর করেছিলেন ঠাকুরের কোটপরা আলোকচিত্র এবং সেই কোটটি থেকে। কোটটি মেপে এবং কোটটির সঙ্গে আকৃতির সম্বন্ধ হিসাব করে দেহের দৈর্ঘ্য প্রতিপাদন করা হয়েছিল।

স্বামী নির্বাণানন্দ একসময় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সেবক ছিলেন। ১৯১৮ সালে উকিল অচলকুমার মৈত্রের পত্নী এক ভক্তিমতি মহিলা ঝাউতলায় কর্মরত এক প্রতিভাবান মারাঠি ভাস্করের স্টুডিওতে গিয়ে মর্মর মূর্তি নির্মাণের দায়িত্ব দেন।

এই মূর্তিটির মডেল অনুমোদন করার জন্য তখনকার প্রেসিডেন্ট মহারাজকে অনুরোধ জানালেন স্বয়ং স্বামী সারদানন্দ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রথমে তেমন উৎসাহিত হলেন না। তারপর বললেন : "ঠাকুরের কোন মূর্তি অনুমোদন করব? তাঁকে একই দিনে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে দেখেছি। কখনো দেখেছি তিনি কৃশ ও ক্ষীণকায়, একটি কোণে চুপ করে বসে আছেন। আবার খানিকক্ষণ পরে দেখা গিয়েছে, তিনি দেহ ও বেশভূষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে সর্বক্ষণ হাততালি দিতে কীর্তন করছেন। কখনো বা গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হতেন ; তখন তাঁর মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত এবং দেহ থেকে এক দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হতো। কখনো কখনো

দেখা যেত তাঁর আকৃতি স্বাভাবিক অপেক্ষা দীর্ঘতর ও বলবত্তর এবং তিনি দক্ষিণের বারান্দার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় পা ফেলে জোরে জোরে পায়চারি করছেন।"

স্বামী সারদানন্দ বিনীতভাবে বললেন, "মহারাজ, ঠাকুর যে ছবি সম্বন্ধে নিজে বলছিলেন, যে ঘরে ঘরে পূজিত হবে, আমি সেই ছবির কথা বলছি। তারই প্রতিমূর্তির মডেল তোমাকে অনুমোদন করতে যেতে হবে।"

মহারাজ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "চল যাই।"

সেইদিন বিকালবেলাই মহারাজকে ঝাউতলা স্টুডিওতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হল। এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও অন্যান্য সাধুরাও গেলেন। গোলাপমা ও যোগীনমাও গেলেন।

মহারাজ মডেলটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর শিল্পীকে দেখালেন "দেখ তুমি ঠাকুরকে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসিয়েছ।"

শিল্পী বললেন, "মহাশয়, আপনি দেখবেন যদি কেউ এইভাবে পায়ের সামনের হাতজোড় করে বসেন, তাহলে তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে যেতে বাধ্য হবেন।"

মহারাজ উত্তর দিলেন, "আমরা কখনো ঠাকুরকে এইভাবে বসতে দেখিনি। তুমি যা বলছ তা সাধারণ লোকেদের পক্ষে প্রযোজ্য। কিন্তু ঠাকুরের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। তিনি দীর্ঘবাহু ছিলেন। হাঁটু পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছত।"

প্রেসিডেন্ট মহারাজ এরপর শিল্পীকে ঠাকুরের কান সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন, "দেখ, সাধারণ মানুষের কান ভ্রূরেখার উপরে আরম্ভ হয় এবং তুমি ঠাকুরের কান সেইভাবে রূপায়িত করেছ। কিন্তু ঠাকুরের কান ভ্রূরেখার নীচে থেকে আরম্ভ হয়েছিল।"

"উপস্থিত সকলে ঠাকুরের চেহারা সম্বন্ধে এইরূপ খুঁটিনাটি বিবরণ শুনে অত্যন্ত আকৃষ্ট হলেন। মহারাজের নির্দেশ অনুসারে ভাস্কর

মডেলটি সংশোধন করতে সম্মত হলেন। তিনি বললেন, অনুগ্রহ করে এক সপ্তাহ পরে আসুন, ইতোমধ্যে আমি মডেলটি সম্পূর্ণ করে রাখব।”

এক সপ্তাহ পরে মহারাজ সদলবলে স্টুডিওতে পুনর্বার পদার্পণ করলেন। সংশোধিত মডেলটি দেখে মহারাজ গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, “এখন এটি অবিকল হয়েছে।”

বিবেকানন্দের নির্ভরযোগ্য দেহবিবরণ দিয়েছেন রোমাঁ রোলাঁ তাঁর ‘বিবেকানন্দের জীবন’ বইতে। তাঁর হিসেব মতো বিবেকানন্দের ওজন ছিল ১৭০ পাউন্ড। “দেহ ছিল মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তাহা রামকৃষ্ণের কোমল ও ক্ষীণ দেহের ছিল ঠিক বিপরীত। বিবেকানন্দের ছিল সুদীর্ঘ দেহ (পাঁচফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে অবনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চক্ষু। তাঁহার চক্ষু দেখিলে প্রাচীন সাহিত্যের সেই পদ্মপলাশের উপমা মনে পড়িত। বুদ্ধিতে, ব্যঞ্জনায়, পরিহাসে, করুণায় দৃপ্ত প্রখর ছিল সে চক্ষু ; ভাবাবেগে ছিল তন্ময় ; চেতনার গভীরে তাহা অবলীলায় অবগাহন করিত ; রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী ; সে দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও অব্যাহতি ছিল না।”

রোমাঁ রোলাঁর বর্ণনা অনুযায়ী, “বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ছিল ‘ভায়োলন সেলো’ বাদ্যযন্ত্রের মতন। তাহাতে উত্থানপতনের বৈপরীত্য ছিল না, ছিল গাম্ভীর্য, তবে তাহার ঝঙ্কার সমগ্র সভাকক্ষে এবং সকল শ্রোতার হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইত। ...এমা কাল্‌ভে বলেন, তিনি ছিলেন চমৎকার ‘ব্যারিটোন’, তাঁহার গলার স্বর ছিল চিনা গঙের আওয়াজের মতো।”

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রর প্রথম সাক্ষাৎ কবে কোথায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিনিময় ও গবেষণা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, প্রথম দর্শন ও প্রথম বাক্যলাপ একইদিনে হয়নি। বিবেকানন্দ জীবনীকার অনেক অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতেই প্রথম দর্শন। রোমাঁ রোলাঁ জানিয়েছেন, এই ভদ্রলোক সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী এবং খ্রিস্টধর্ম

গ্রহণ করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ সেবার ভজন গান শোনালেন। নবাগত গায়কের শারীরিক লক্ষণ ও ভাবতন্ময়তা লক্ষ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ আকৃষ্ট হলেন এবং খোঁজখবর নিয়ে ভক্ত রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন একে একদিন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে।

ঘোড়ার গাড়িতে সুরেন্দ্রনাথ ও দু'জন বয়স্যের সঙ্গে ১৮৮১ সালের পৌষ মাসে (নভেম্বর) নরেন্দ্রনাথ দত্ত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐতিহাসিক এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এবং নরেন্দ্রনাথ দু'জনেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এমন সৌভাগ্য সচরাচর হয় না। অযথা সময় নষ্ট না করে, আমরা স্বামী সারদানন্দ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গর স্মরণ নিচ্ছি।

"দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতর-সাধারণের মতো একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আলগা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া মনে হইল বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

"মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল। তাহার সঙ্গে দুই-চারি জন আলাপী ছোকরাও আসিয়াছিল। বুঝিলাম, তাহাদিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত--সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয় ; ভোগের দিকেই দৃষ্টি।

"গান গাহিবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বাংলা গান সে দুই-চারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন গাহিতে লাগিল—শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।

"পরে সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘন্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে। সময়ে সময়ে

এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা-নিংড়াইবার মতো জোর করিয়া নিংড়াইতেছে। তখন আপনাকে আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশে ঝাউতলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারি না' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম। খানিকটা এইরূপে কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম। ক্রমান্বয়ে ছয় মাস এইরূপ হইয়াছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখনও মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রর জন্য যেমন হইয়াছি তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে।"

একই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকান্দের স্মৃতিকথাও সংগ্রহ করেছিলেন।

"গান তো গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারান্দা আছে, তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তুরে-হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারান্ডার থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল, সুতরাং উহার ভিতরে ঢুকিয়া ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ঘরের ভিতরের বা বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত না। বারান্দার প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুরঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? লোকের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে গেল ; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন। পরক্ষণেই আবার আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন

ঋষি নবরূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি।

"আমি তো তাঁহার ওইরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ তো একেবারে উন্মাদ—না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এইসব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখন, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম, 'আমাকে খাবারগুলি দিন। আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে', তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও।'—বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকট একাকী আসিবে?' তাঁহার ওইরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা আসিব বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায় অপর সকলের সহিত আচরণে উন্মাদের মতো কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্য সত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন।...নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ওইরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম, উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র মহাত্যাগী এবং ওইজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! ওইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণ-বন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

অবিস্মরণীয় এই প্রথম সাক্ষাৎকার নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা ও বিশ্লেষণ আজও হয়নি। এ বিষয়ে ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথেরও কিছু সংযোজন আছে।

"শুনিয়াছি যে, নরেন্দ্রনাথ পরমহংস মশাই-এর নিকট যাইবার কিছু কাল পরে, কোনো এক যুবক আর একজনের সহিত দক্ষিণেশ্বরে যান। যুবকটির সঙ্গে যে লোকটি ছিলেন তাঁহার কাছে নরেন্দ্রনাথের কুশল সংবাদ পাইয়া পরমহংস মশাই বলিলেন, 'লরেন অনেকদিন আসেনি, দেখতে ইচ্ছে হয়েছে এক বার আসতে বলো।' পরমহংস মশাই-এর সহিত কথাবার্তা কহিয়া, রাত্রে তাঁহার ঘরের পূর্বদিকের বারান্ডায় উভয়ে শয়ন করিলে কিছু কাল পরেই, পরমহংস মশাই বালকের মতো তাঁহার পরনের কাপড়খানি বগলে করিয়া তাঁহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞেস করিলেন, 'তুমি কি ঘুমোচ্ছ?' যাঁহাকে ডাকিয়া পরমহংস মশাই জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি উত্তরে করিলেন, "আজ্ঞে না।" পরমহংস মশাই বলিলেন, 'দেখ লরেনের জন্য প্রাণের ভেতর যেন গামছা-নেংড়ানোর মতো মোচড় দিচ্ছে!' সে রাত্রিতে নাকি পরমহংস মশাই-এর নরেন্দ্রনাথের জন্য উৎকণ্ঠ ভাব কিছুমাত্র কমে নাই। কারণ তিনি কিছুক্ষণ শয়ন করিবার পর, আবার আসিয়া ওই কথাই বলিতে লাগিলেন যেন, নরেন্দ্রনাথের অদর্শনের জন্য বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়ায় তাঁহার ঘুম হইতেছিল না।

"পরমহংস মশাই, আমাদের গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের বাড়িতে, নরেন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে খুঁজিতে আসিতেন। কিন্তু কখনো বাড়ির ভিতর প্রবেশ করেন নাই, রাস্তায় অপেক্ষা করিতেন। তিনি বাড়ির একটু কাছে আসিলে অনেক সময় আমি অগ্রসর হইয়া যাইতাম। আমায় বলিতেন, 'লরেন কোথায় লরেনকে ডেকে দাও' আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া দাদাকে সন্ধান করিয়া ডাকিয়া দিতাম। অনেক সময় পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেন।

"পরমহংস মশাই নরেন্দ্রনাথকে আদর করিয়া 'শুকদেব' বলিয়া ডাকিতেন। শুকদেব যেন দ্বিতীয় বার জগতে আসিয়াছেন। নরেন্দ্রনাথ শুকদেবের মতো জ্ঞানী হইবে, জগতে সমস্ত কার্য করিবে, কিন্তু জগৎকে ছুঁইবে না, প্রভৃতি বহুবিধ অর্থে তিনি নরেন্দ্রনাথকে শুকদেব বলিতেন।

বাবা এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিতেন, "হ্যাঁ, হয়েছে বটে, ব্যাসদেবের বেটা শুকদেব। ম্যাকনামারার বেটা কফিন-চোর!"—অর্থাৎ ব্যাসদেবের পুত্র শুক্‌দেব মহৎ হইয়াছিলেন, এ কথা সত্য কিন্তু বড়সাহেব ম্যাকনামারার পুত্র হইল কিনা শবাধার-চোর। নরেন্দ্রনাথ সেইরকম হইবে। তখনকার দিনে 'কফিন-চোর' কথাটির বড় প্রচলন ছিল। নরেন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যতে একজন শ্রেষ্ঠ লোক হইবে, এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া তিনি বিদ্রূপ করিয়া এইরূপ বলিতেন। তিনি বিরক্ত হইতেন না, বরং খুশি হইতেন।

"নরেন্দ্রনাথ ছুটি পাইলে, নিজে নৌকা বাহিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ের সময় নরেন্দ্রনাথ গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইত, এইজন্য বাবা অনেক সময় বিরক্ত হইতেন। তিনি বলিতেন, 'যাতায়াতের একখানা গাড়ি করে গেলেই তো হয়। এরকম ঝড়-তুফানে গঙ্গা দিয়ে যাবার কি দরকার? রাম তো টানা গাড়ি করে যায়।—একেই বলে ডানপিটে ছেলে মরণ গাছের আগায়। এরকম ডানপিটেমি করার কি দরকার?' কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এ সকল কথায় বিশেষ কান না দিয়া, নিজের মনোমত দুই-একটি বন্ধু সঙ্গে লইয়া নৌকা করিয়া অনেক সময় দক্ষিণেশ্বরে যাইত। হেদোর পুকুরে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে নৌকার দাঁড় টানিতে বেশ পারদর্শী হইয়াছিল। আহিরীটোলার ঘাটে একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, অনেক সময় নিজেরাই মাঝিদের দাঁড় লইয়া টানিতে টানিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইত। এইরূপ যাওয়াতে কতকটা নৌকা বাহিয়া আমোদ করা হইত। এবং পরমহংস মশাইকে দর্শন করিতে যাওয়াও হইত।

"তখনকার দিনে দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি করিয়া যাইবার পথ অতি কষ্টকর ছিল। গরানহাটা হইতে বরানগরের বাজার পর্যন্ত গাড়ি যাইত, তাহার পর, সমস্ত পথটা হাঁটিয়া যাইতে হইত।

"নরেন্দ্রনাথ সব সময় পরমহংস মশাইকে বলিত, 'তুমি মুক্‌খু লোক, লেখাপড়া জান না, তোমার কাছে আবার দর্শনশাস্ত্রের কথা কি শিখব? আমি এসব বিষয় ঢের জানি।' কখনো কখনো তর্কের ছলে তাহার কথার

মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইত। অপরে ইহাতে বিরক্ত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন। পরমহংস মশাই হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'ও আমাকে গাল দেয়, কিন্তু ভেতরে যে শক্তি আছে, তাকে গাল দেয় না।' পরমহংস মশাই-এর কী গুণগ্রাহী ভাব, কী উদার ভাব। সংকীর্ণ ভাব, গুরুগিরির ভাব—এসব কিছুই তাঁহার ছিল না। এইজন্য তিনি ঝাঁঝালো ও তেজী নরেন্দ্রনাথের এত প্রশংসা করিতেন এবং তাহাকে এত ভালোবাসিতেন। ইহাকেই বলে কদর দান, গুণের আদর করা।

"নরেন্দ্রনাথ এইরূপ ঝাঁঝালো মেজাজে পরমহংস মশাই-এর সহিত সমান সমান ভাবে তর্ক করিত। পরমহংস মশাইও তাতে হাসিয়া আনন্দ করিতেন। এক ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথের অনুকরণ করিয়া পরমহংস মশাই-এর সহিত কথা কহিতে গিয়াছিলেন। পরমহংস মশাই অমনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'লরেন বলে—লরেন বলতে পারে, তা বলে তুই বলতে যাসনি। তুই আর লরেন এক না।' এই বলিয়া তাঁহাকে ধমক দিয়াছিলেন।"

মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, নরেন্দ্রনাথ একবার এক যুবককে বলেছিলেন, "ওঁর কাছে যাই, সমাজ বা অন্য বিষয় শেখবার জন্য নয়।...ওঁর কাছে spirituality (ব্রহ্মজ্ঞান) শিখতে হবে। এটা ওঁর কাছে আশ্চর্যরকম আছে।"

তবু মাঝে-মাঝে গুরু-শিষ্যে তর্কবিতর্ক চলত। এমনকি নরেন্দ্রনাথ মুখঝামটা দিয়ে পরমহংসমশাইকে বলেছেন, "তুমি দর্শনশাস্ত্রের কি জানো? তুমি তো একটা মুখ্খু লোক।"

পরমহংস মশাই হাসতে হাসতে বলতেন, "লরেন আমাকে যত মুক্খু বলে, আমি তত মুক্খু লই।...আমি অক্ষর জানি।"

শুরুতে গুরু-শিষ্য যতই তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি হোক, এঁরা দুজনে মিলেই বিশ্ববিজয় করেছেন। একালের ভারতবর্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর চেলা বিবেকানন্দ সমস্ত বাধা অতিক্রম করে যে নট আউট রয়েছেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের ১৭৫তম জন্মজয়ন্তী এবং স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ উৎসব তারই ইঙ্গিত করে।

রসগোল্লার লোভে শিষ্যের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন। তারপর মাত্র কয়েক বছর, এরই মধ্যে পরস্পরকে প্রথম আবিষ্কার এবং ভাবের আদানপ্রদান। এরই মধ্যে দুরারোগ্য ব্যধির আক্রমণ, তবু যাবার আগে প্রিয় শিষ্যের প্রতি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত তিনি ও উপলব্ধি। শেষ পর্ব কাশীপুরে ১২৯৩ সালে শ্রাবণমাসের শেষ দিনে। কৃষ্ণাপ্রতিপদে নরেন্দ্রনাথের আচার্য যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে মহাপ্রস্থানের পথে পা দিয়েছিলেন। তারপর বহু বছর ধরে তাঁর অন্ত্যলীলা সম্পর্কে সর্বস্তরে অন্তহীন আলোচনা চলেছে। কবি, পুঁথিকার, সন্ন্যাসীসন্তান, গৃহীভক্ত এবং অনুরাগীরা যেসব ইতিবৃত্ত রেখে গিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ গবেষকরা নিরন্তর লিখে চলেছেন নানা ভাষায়। সবিষয়ে তথ্যানুসন্ধানীদের প্রধান অবলম্বন স্বামী সারদানন্দের অমর সৃষ্টি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ নামক পাঁচ খণ্ডের সুবিশাল গ্রন্থ।

স্বামী সারদানন্দের এই বইটি বাংলা জীবনীসাহিত্যে এক দিকচিহ্ন, তবু যা সাবধানী পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না তা হ'ল কাশীপুর উদ্যানবাটীপর্বের কিছু উল্লেখ পঞ্চম খণ্ডে থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিমকালের কোনও বর্ণনা এই বইতে নেই।

লীলাপ্রসঙ্গকে যাঁদের কাছে অসমাপ্ত বলে মনে হয়েছে তাঁদের কাছে অনুরোধ সম্প্রতি বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস, ইউ. এস. এ. থেকে লীলাপ্রসঙ্গের যে পূর্ণাঙ্গ ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে অনুবাদক স্বামী চেতনানন্দের মহামূল্যবান ভূমিকাটি পড়ে দেখুন। স্বামী চেতনানন্দ সবিনয়ে আমাদের জানিয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের তেইশ বছর পরে স্বামী সারদানন্দ পরমপূজ্য ঠাকুরের জীবনকথা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৯০৯ সালে বাংলা উদ্বোধন পত্রিকায় যে

ধারাবাহিক জীবনকথা প্রথম প্রকাশিত হয় তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯১৯ সালে। লীলাপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে যে সংবাদটি কৌতূহলোদ্দীপক তা হলো প্রথমে লেখা হয় তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড, তারপর দ্বিতীয়, প্রথম এবং সর্বশেষে পঞ্চম খণ্ড। লীলাপ্রসঙ্গের পঞ্চম খণ্ড যে অসম্পূর্ণ তা স্বামী সারদানন্দের অজানা ছিল না, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার অনুপ্রেরণা তিনি অন্তর থেকে অনুভব করেননি, তাই ওই পথে আর এগনো হয়নি।

শেষজীবনের এই শূন্যস্থানটি পূরণের জন্য রামকৃষ্ণ পুঁথির কবি অক্ষয়কুমার সেন থেকে শুরু করে এক শতাব্দী পরে স্বামী প্রভানন্দ পর্যন্ত অনেক যথেষ্ট ধৈর্যপূর্ণ গবেষণা করেছেন, তবু এইসব রচনায় অনুসন্ধিৎসুর মন পরিপূর্ণ হয় না। অন্য সমস্যা আছে, বিভিন্ন স্মৃতিকথার বিবরণে কিছু কিছু সংঘাতও রয়েছে। সময়ের দীর্ঘদূরত্বে, বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে কোনটা সত্য এবং কোনটা অনিচ্ছাকৃত প্রমাদ তা ঠিকভাবে বলা ইদানিং কঠিন হয়ে উঠেছে।

যেমন ধরুন শ্রাবণসংক্রান্তির রবিবার ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিলগ্নে নরেন্দ্রনাথ কি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন? পরের দিন ১৬ আগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্মশানযাত্রার আগে দ্য বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স দুটি গ্রুপ ফটো নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক এই ছবির একটিতে অর্ধশত শোকার্তজনের উপস্থিতি, কেন্দ্রস্থলে নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু পুঁথিতে বলছে, ঠাকুরের যাতে ঘুম আসে তার জন্য পদসেবায় স্বয়ং শ্রীনরেন্দ্র নরবর। প্রভুকে অতঃপর সুস্থ দেখে নরেন্দ্র দোতলা থেকে একতলায় নেমে গেলেন বিশ্রামের জন্যে। ঘরে সেবকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে জেগে রইলেন শশী যিনি পরবর্তীকালে সব গুরুভাইদের মত অনুযায়ী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ নামের জন্য যোগ্যতম বিবেচিত হয়েছিলেন।

এই শশী যে স্বামী সারদানন্দের সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই তা ভক্তমহলে সবাই জানেন। কাশীপুরে তখন রাত্রি ১টা বেজে ২ মিনিট। এক বিদেশিনী কুমারী লরা এফ গ্লেন (ভগিনী দেবমাতা), ১৯০৯ সালে মাদ্রাজমঠে এসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে কাশীপুর সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলেন। শশী

মহারাজ তাঁকে জানান, "অকস্মাৎ রাত একটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ একপাশে ঢলে পড়লেন। তাঁর গলা থেকে ক্ষীণ শব্দ বেরুতে থাকে।...নরেন্দ্র চট করে ঠাকুরের পা দুখানি বিছানার ওপর রেখে দৌড়ে নিচে নেমে গেল, যেন ঠাকুরের দেহের এই পরিণতি সে সইতে পারছিল না।"

তা হলে শেষমুহূর্তে নরেন্দ্রর উপস্থিতি সম্পর্কে দুটো মতামত পাওয়া যাচ্ছে। সময় সম্পর্কেও রয়েছে কিছু মতপার্থক্য—রাত একটা, একটা দুই এবং ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত (ঠাকুরের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের স্রষ্টা, নরেন্দ্রনাথের দিদিমা রঘুমণিদেবীর মামাতো ভাই) তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃত্তান্তে জানিয়েছেন, তখন রাত্রি ১টা বেজে ৬ মিনিট। মহাসমাধির সময় রামদাদা কাশীপুরে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং তাঁর বর্ণনা ঠিক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নয়।

শ্রাবণের শেষ রবিবারে কাশীপুরের ঘটনাবলী সম্পর্কে যেখানে যতটুকু জানা যায় তা একত্রিত করার সবচেয়ে কঠিন কাজটি করেছেন স্বামী প্রভানন্দ তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা গ্রন্থে। এই বইয়ের প্রধান তথ্যসূত্র কথামৃত রচনাকার শ্রীম'র অপ্রকাশিত ডায়েরি যা এই লেখক দেখবার ও ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

কিন্তু তারপরেও কিছু অনুসন্ধানকার্য চালু রয়েছে। যেমন গবেষক শ্রীনির্মলকুমার রায়, প্রমাণ করেছেন ঠাকুরের চিকিৎসক দুর্গাচরণ ব্যানার্জি বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পিতৃদেব নন। ঐসময়ে একই নামে তালতলায় আর একজন চিকিৎসক ছিলেন। এঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ চিকিৎসার জন্যে যেতেন, কিন্তু তাঁব বাড়ির হদিশ পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধানকর্মে অশেষ ধৈর্য ছিল প্রয়াত নির্মলকুমার রায়ের। তাঁর মতে, কলকাতায় অন্তত ১৪টি বাড়ি, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ কোনও না কোনও সময়ে গিয়েছিলেন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। খোদ কলকাতায় রামকৃষ্ণস্মৃতিধন্য আরও ১৭টি বাড়ির হদিশ পাওয়া যায়নি, এরই মধ্যে রয়েছে তালতলায় ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি।

মহাপুরুষদের শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে নির্ভরযোগ্য অথচ রুদ্ধশ্বাস গ্রন্থ রচনার রেওয়াজ রয়েছে পাশ্চাত্যে।

এদেশে কয়েকবছর আগে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন অসুখ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন ডাঃ তারকনাথ তরফদার। এই লেখককে না দেখলেও তাঁর ছবি দেখেছি, তরুণ এই গবেষকের প্রবন্ধের নাম 'অন্তিমশয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর'। ডাঃ তরফদার বলেছেন, দুর্গাচরণ ব্যানার্জির চেম্বারে রোগী শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন ঘটেছিল ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

ইদানীং আরও কিছু সংবাদ এসেছে বিদেশ থেকে। মার্কিন দেশের সন্ন্যাসী স্বামী যোগেশানন্দর ইংরিজি বই (প্রথম প্রকাশ ১৯১২) 'সিক্স লাইটেড উইনডোজ্' এদেশে বিক্রি হয় না, কিন্তু অনুসন্ধানীদের অবশ্যপাঠ্য। যোগেশানন্দ সাবধানী লেখক, তাঁর স্মৃতিকথায় প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছেন, ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সন্ন্যাসীরা আত্মজীবনী রচনা করেন না, কারণ সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে, আত্মশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে, বিরজা হোমের শেষে সন্ন্যাসীরা নবজীবনে প্রবেশ করেন, পূর্বাশ্রমের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্কহীন। পশ্চিমে যেসব খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসী এই ধরনের কাজ করেছেন, তাঁদের অনেকে বইয়ের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন, চার্চের প্রবীণতরদের নির্দেশেই সঙ্ঘের প্রয়োজনে তাঁরা নিজেদের জীবনকথা রচনায় হাত দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মঠের এই সন্ন্যাসী তাঁর স্মৃতিকথার শুরুতে বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের ক্রশকালচারাল মিলনের প্রথমপর্বে কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয় তার কিছু কিছু লিখিত নিদর্শন থাকলে পরবর্তীকালের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসী উভয়েরই কাজে লাগতে পারে।

স্বামী যোগেশানন্দ তাঁর ইংরিজি বইতে দীর্ঘকাল আমেরিকা প্রবাসী প্রাণবন্ত সন্ন্যাসী স্বামী নিখিলানন্দের মুখে কাশীপুরে রবিবারের সেই রাত্রি সম্পর্কে যা শুনেছেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বামী নিখিলানন্দ এই কাহিনি শুনেছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ, ঠাকুরের পরমপ্রিয় এবং স্বামী বিবেকানন্দর আমৃত্যু অনুরাগী স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছ থেকে। এঁকেই আদর করে স্বামী বিবেকানন্দ ডাকতেন 'গ্যাঞ্জেস' বলে (ওঁর ডাকনাম গঙ্গাধর) এবং ভগ্নী নিবেদিতা তাঁর কালজয়ী দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্যের জন্য ডাকতেন 'দ্য ফেমিন স্বামী' বলে। স্বামী অখণ্ডানন্দ বিবেকানন্দর

দেহত্যাগের পরও পঁয়ত্রিশ বছর (১৯৩৭ সাল পর্যন্ত) বেঁচেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির তারিখের এই কাহিনিটি বাংলা কোনও পত্রিকা বা বইতে আজও আমার নজরে পড়েনি। স্বামী নিখিলানন্দ যখন তাঁর আপনজনদের কাছে এই কথা বলে গিয়েছেন তখন তা অবিশ্বাস করার কথা ওঠে না।

১৮৮৫ রবিবার ১৫ আগস্ট পরমহংসদেবের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ, কোনও কিছুই ক্যানসার রোগাক্রান্ত গলা দিয়ে প্রবেশ করতে চায় না। আগেকার নিয়মকানুন না মেনে ঠাকুর কিছুদিন আগে ডাক্তারের নির্দেশে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া পান করতে রাজি হয়েছেন। শর্ত একটি ছিল, "যে দোকান থেকে মাংস কিনে আনবি সেখানে যদি কালীমূর্তি না থাকে তবে কিনবি না।" একজন সেবক প্রতিদিন সকালে গিয়ে সেই অনুযায়ী মাংস কিনে আনতেন। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীসারদামণির স্মৃতিকথায় পাওয়া যাচ্ছে : "কাশীপুরে কাঁচা জলে মাংস দিতুম, কখনও তেজপাতা ও অল্প মশলা দিতুম, তুলোর মতন সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।...মাংসের জুস হ'ত। দুটো কুকুর তার ছিবড়ে খেয়ে এই মোটা হ'ল।" কাশীপুর উদ্যানবাটিতে যে একটি রাঁধুনি বামুন আনানো হয়েছিল তার উল্লেখ আছে মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর দিনলিপিতে। আরও জানা যায়, রাঁধুনিটি এসেছিল ঠাকুরের গ্রাম থেকে, কিন্তু রান্নাবাড়া সে প্রায় কিছুই জানত না।

স্বামী যোগেশানন্দের ইংরাজি বইতে ঠাকুরের শেষদিনের বর্ণনা : মর্তলীলার শেষদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তিনি ডিম সেদ্ধ খাবেন। (অবশ্যই হাঁসের ডিম, মুরগী তখন বাঙালির ঘরে নিষিদ্ধ।) অবাক কাণ্ড, কারণ এই ধরনের ইচ্ছে আগে তিনি কখনও প্রকাশ করেননি। সেই মতো দুটো ডিম সেদ্ধও করা হয়েছিল, কিন্তু সারাদিন ধরে যেসব বিপর্যয় গেল তার পরে এই ডিম তাঁর খাওয়া হয়নি। এরপরেই স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথন. মধ্যরাতে যখন সব শেষ হয়ে গেল, তখন নরেন্দ্র বললেন, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে, কী করা যায়? এই বিবরণ শুনে স্বামী নিখিলানন্দ পরে বলেছিলেন, এই সময়ে তো খিদে পাবার কথা নয়। স্বামী অখণ্ডানন্দর উত্তর : "যা হয়েছিল তা বলছি। ডিম সিদ্ধর খবর পেয়ে

খিদেয় পাগল নরেন্দ্রনাথ ডিম দুটি খেয়ে ফেলে নিজেকে সামলালেন।" অখণ্ডানন্দের মতে, নরেন ও রামকৃষ্ণ যে একাত্ম হয়ে গিয়েছে, এইভাবে ডিম খাওয়াটা তারই নিদর্শন।

কাশীপুরে দীর্ঘদিন ধরে বিরতিহীন সেবাকার্যে নিয়ত জর্জরিত হয়ে বারোজন ত্যাগী সন্তানের শরীরে তখন কিছুই ছিল না। কে কতক্ষণ রোগীর পাশে ডিউটি দেবে, কে কলকাতায় ডাক্তারের কাছে যাবে, কে পথ্য সংগ্রহ করে এনে কীভাবে তা প্রস্তুত করবে তা বুঝিয়ে দেবে, এসবই ঠিক করে দিতেন নেতা নরেন্দ্রনাথ। ঘড়ির কাঁটার মতন কাজ হ'ত, কিন্তু সময়ের নির্দেশ মানতে চাইতেন না শশী ও তাঁর ভাই শরৎ (সারদানন্দ)।

ঠাকুরের সেবার সময় শশীর খাওয়াদাওয়ার কথা মনেই থাকত না, বারবার ছুটে আসতেন অমৃতপথযাত্রীর শয্যাপার্শ্বে। এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রভানন্দ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'ঠাকুর' কথাটি তাঁর দেহাবসানের পরে সৃষ্টি হয়, ভক্তগণ জীবিতকালে বলতেন 'পরমহংসদেব', অন্যেরা 'পরমহংসমশাই', অনেকে ব্যাঙ্গ করে 'গ্রেটগুজ্'!

কাশীপুর থানার ডেথ রেজিস্টারেও ইংরিজিতে লেখা, 'রাম কিষ্টো প্রমোহংস', নিবাস : ৪৯ কাশিপুর রোড, জাতি : ব্রাহ্মণ, বয়স ৫২, পেশা : 'প্রিচার' অর্থাৎ প্রচারক। মৃত্যুর কারণ : গলায় আলসার, অর্থাৎ ক্ষত। সংবাদদাতা গোপালচন্দ্র ঘোষকে 'বন্ধু' বলে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই 'বন্ধু'টি আসলে ভক্তমহলের সুপরিচিত বুড়োগোপাল, যিনি পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রাবণের শেষ রাতে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ত্যাগী সন্তানদের আর একটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা রেখে গিয়েছেন স্বামীজির মধ্যমভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলি' গ্রন্থে।

শোকার্ত সময়ে চা খাওয়া সম্বন্ধে শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) একটি গল্প বলতেন, "ওহে, শিবরাত্রির উপোস করে, আমাদের চা খেতে কোনও দোষ নেই। কেন জান? যেদিন তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের) দেহত্যাগ হয় সকলেই বিষণ্ণ, খাওয়া-দাওয়া কিছুই হল না। কেই বা উনোন জ্বালে। আর কেই বা রান্না করে। অবশেষে দরমা জ্বালিয়ে কেটলি

করে জল গরম করে চা হ'ল আর ঢক ঢক করে খাওয়া গেল। অমন শোককর দেহত্যাগের দিনেও চা খেয়েছিলুম, তা শিবরাত্রির উপোস করে চা কেন খাওয়া চলবে না বল?"

প্রসঙ্গত বলি, স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত একবার প্রিয় শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি এত চা খেতে শিখলে কোথা থেকে?" স্বামী সারদানন্দ হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমার ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে। তোমাদের বাড়িতে যে চায়ের রেওয়াজ ছিল সেইটা মঠে ঢুকিয়ে দিলে আর আমাদের চা-খোর করে তুললে! তোমরা হচ্ছ একটা 'নারকটিক' ফ্যামিলি!"

কঠিন সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কঠিনতম দুঃখের মোকাবিলার দুর্লভ শিক্ষা পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্ররা। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরম অবজ্ঞাভরে তাঁরা তাই বলতে পেরেছেন, আমার তো জন্মই হয়নি, সুতরাং মৃত্যু হবে কী করে?

তবু দুরন্ত দুঃখ এবং প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা, হৃদয়বান সন্ন্যাসীকেও ক্ষণকালের জন্য অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে, স্বামীজি নিজেই একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, "কী বলেন মশাই, সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয় থাকবে না?"

বৈরাগ্য ও ভালবাসার, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের পরস্পরবিরোধী শক্তি, রামকৃষ্ণতনয়দের ব্যক্তিজীবন ও সন্ন্যাসজীবনকে এক আশ্চর্য রঙিন আভায় বারবার আলোকিত রেখেছিল। এই জন্যেই বোধ হয় যখন আমরা শুনি, ঠাকুরের দেহাবসানের পর শোকার্ত নরেন্দ্রনাথ আত্মহননে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন আশ্চর্য হই না। প্রেমের ঠাকুর এবং সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দু'জনেই আমাদের বোধের ঊর্ধ্বে থেকে যান।

শুরুতেই আরও কয়েকটা সহজ কথা বলে রাখা ভাল। দক্ষিণেশ্বরে অনেকদিন শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য জানিয়েছেন, সুস্থ অবস্থায় তিনি আধসের থেকে দশ ছটাক চালের ভাত খেতেন। ব্যাধি বলতে আমাশয়, প্রায়ই পেট গোলমাল হ'ত।

আরও রিপোর্ট, একবার বায়ুবৃদ্ধি রোগে কাতর হলে, আগরপাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর চিকিৎসা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্ন, "হ্যাঁরে তামুক খেলে কী হয়?" কবিরাজ শেষপর্যন্ত পরামর্শ দেন, ছিলিমের ওপর ধানের চাল ও মৌরী দিয়ে তামাক খেও। ঠাকুর সেই পরামর্শ মেনে চলতেন। কিন্তু ধূমপানের সঙ্গে ক্যান্সারের নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে ডাক্তার ও নাগরিক তখনও সচেতন হননি।

যথেচ্ছ ধূমপানটা হয়ে উঠেছিল সেকালের বঙ্গীয় জীবনের অঙ্গ। প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথ যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েই ধূমপান শুরু করেন তার ইঙ্গিত রয়েছে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত নামক গ্রন্থে। "পাঠাগারদ্বার আবদ্ধ থাকিত, অর্থাৎ যখন-তখন তামাক খাইতেন বলিয়া পিতা (বিশ্বনাথ দত্ত) কহিতেন—বাবাজি বুঝি ঠাকুরকে ধূপধুনা দিতেছেন, তাই দ্বার বন্ধ। কিন্তু লেখাপড়ায় উন্নতি দেখিয়া কিছু বলিতেন না।"

ঠাকুরের ধূমপানপ্রীতিকে ভক্ত জনেরা তাঁর দেহাবসানের পরেও নতমস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আজও বেলুড়মঠে সন্ধ্যায় ঠাকুরের শেষ সেবাটির নাম 'হুঁকোভোগ'। সুগন্ধী তামাক প্রজ্জ্বলিত কলকেতে স্থাপন করে ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রাতের বিশ্রামের জন্য দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতেও হুঁকো কলকের অন্য ব্যবহার হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ত্যাগী ভাইরা যখন ধুনি জ্বালিয়ে সন্ন্যাসীদের মতন অঙ্গে ভস্ম লেপন করতেন তখন অন্য ছাইয়ের অভাবে হুঁকোর টিকের ছাই ব্যবহার করতেন। এই অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের যে ফটোগ্রাফটি কালের অবহেলা সহ্য করে আজও টিকে আছে তা বিশেষজ্ঞদের মতে কাশীপুরে গৃহীত হয় ১৮৮৬ সালে। এইটাই এখনকার সংগ্রহে নরেন্দ্রনাথের প্রথম ছবি, কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে কে এই ছবি তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন, ফটোগ্রাফার কে—তা আজও স্পষ্ট নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সংখ্যা হাতে গোনা হলেও ছবির বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই। ঠাকুরের যে ছবিটি এখন সারা বিশ্বে বন্দিত তা যে ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডে'র

শিক্ষানবিশ অবিনাশচন্দ্র দাঁয়ের তোলা এবং স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ বিশেষ সাহায্য না করলে সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণের এই অমূল্য ছবিটি আমরা পেতাম না তা গ্রন্থিত হয়েছে।

আমরা জানি, অসাবধানতাবশতঃ অবিনাশ দাঁয়ের হাত থেকে কাঁচের নেগেটিভাটি পড়ে তা ফেটে যায়, কিন্তু ফটোগ্রাফার খুব সাবধানে পিছনের অংশটি গোলাকৃতিতে কেটে ফেলে মূল ছবিটি রক্ষা করেন। পিছনের অর্ধ গোলাকার দাগটি ভারি সুন্দর মানিয়ে গিয়ে ছবিটিকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত লেখক বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল কাশীপুর পর্বে এই পদ্মাসনাস্থ ধ্যানমূর্তি সম্পর্কে ঠাকুরের নিজস্ব মন্তব্য আমাদের জন্য সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন। ঠাকুর বলছেন, "ভবনাথের জেদে ছবি তোলাতে বিষ্ণুঘরের রকে বসে এমন সমাধিস্থ হই যে, ফটো উঠালেও ধ্যানভঙ্গ হ'ল না দেখে, আমি মরে গেছি ভেবে ফটোওয়ালা অবিনাশ যন্ত্রপাতি ফেলে পালায়।"

কাশীপুরে শ্রাবণের শেষরাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত না গভীর সমাধিমগ্ন তা স্থির করতে সেবকরা অক্ষম হন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন, "তাই আমরা আসায় বুক বাঁধিয়া, এই জাগিবেন, এই উঠিবেন, ভাবিয়া সারারাত্রি প্রভুকে ঘিরিয়া তাঁহার অপূর্বভাব দেখিতে লাগিলাম।"

অন্তিমশয্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবন্ধে ডাঃ তারকনাথ তরফদার শ্রীরামকৃষ্ণের একটা মেডিক্যাল হিস্ট্রি খাড়া করার চেষ্টা চালিয়েছেন। কথামৃতে এই অসুখের প্রথম উল্লেখ ২৪ এপ্রিল ১৮৮৫ : গলায় বিচি, শেষ রাত্রে কষ্ট হচ্ছে, মুখ শুকনো লাগছে। ডাক্তার তরফদারের আন্দাজ, অসুখের সূত্রপাত সম্ভবত বেশ কিছু আগে। অন্তিম রোগের প্রথম লক্ষণ, গলায় বিচি, ১৫-১৬ মাস পরে জীবনাবসান।

কথামৃত ও অন্যান্য সূত্র থেকে ডাক্তার গবেষকের রচনা থেকে আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি।

২৬মে ১৮৮৫ : পানিহাটি মহোৎসবে মাতামাতির পর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

১৩ জুন ১৮৮৫ : ফের গলায় বিচির উল্লেখ, সেই সঙ্গে সর্দি গয়েরে 'বিশ্রী গন্ধ'।

২৮ জুলাই ১৮৮৫ : কথামৃত অনুযায়ী রামকৃষ্ণের কণ্ঠে শেষ গান। কিন্তু কাশীপুরে তিনি দু'এককলি গেয়েছেন।

আগস্ট ১৮৮৫ : গলা থেকে প্রথম রক্তক্ষরণ শুরু। খেতে বা গিলতেও কষ্ট।

১১ আগস্ট ১৮৮৫ : ধর্মপ্রচারে অত্যধিক কথা বলায় এই রোগ। ডাক্তারি ভাষায়, 'ক্লার্জিম্যানস থ্রোট', এই দিন কিছুক্ষণের জন্যে মৌনীভাব।

৩১ আগস্ট ১৮৮৫ : রাত্রে সুজির পায়েস খেতে কোনো কষ্ট হ'ল না। অর্থাৎ খাবার খেতে কষ্ট শুরু হয়েছে। খেয়ে ঠাকুরের আনন্দ : "একটু খেতে পারলাম, মনটায় বেশ আনন্দ হল।" তবে রাত্রে গায়ে ঘাম।

১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ : ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ ল্যারিনজোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ : প্রখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার দেখলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ : ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ : শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় এলেন। কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

১ অক্টোবর ১৮৮৫ : রাত্রে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, ঘুম নেই।

২ অক্টোবর ১৮৮৫ : শ্যামপুকুরের বাড়িতে এলেন।

৪ অক্টোবর ১৮৮৫ : রক্তপাত, প্রথমে কাঁচা, পরে কালো ঘন।

১২ অক্টোবর ১৮৮৫ : ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার নিয়মিত চিকিৎসা শুরু করেন।

১৫-১৭ অক্টোবর ১৮৮৫ : এর মধ্যে কোনো একদিন ডাঃ সরকার ও তাঁর বন্ধু সমাধির সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করেন।

৪ নভেম্বর ১৮৮৫ : ঠাকুর গুরুতর পীড়িত।

৮ নভেম্বর ১৮৮৫ : রক্তমেশা কফ পরীক্ষা—এই রিপোর্টের বিবরণ কারও কাছে নেই।

২৯ নভেম্বর ১৮৮৫ : ডাক্তার সরকারের সিদ্ধান্ত, রোগ ক্যানসার। এর আগে সেপ্টেম্বরে কবিরাজরা বলেছেন 'রোহিণী' রোগ।

রোগ লক্ষণ বিচার করে ড়াঃ তরফদারের অনুমান, "রামকৃষ্ণদেবের অসুখ প্রাথমিকভাবে 'হাইপোফ্যারিন্‌কস' (অথবা তার পরে 'অরোফ্যারিন্‌কস') অংশে শুরু হয়েছিল, স্বরযন্ত্রে নয়।"

শ্যামপুকুরের বাড়ি ছাড়বার জন্যে বাড়িওয়ালা প্রবল তাগাদা লাগাচ্ছিল। নতুন বাড়ির খোঁজ হচ্ছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, আমি কি জানি? কাশীপুরনিবাসী ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী একটা বাড়ির খবর দিলেন। রানী কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী, ঠিকানা : ৯০ কাশীপুর রোড, মাসিক ভাড়া ৮০্।

যে তথ্যটি অস্বস্তিকর ও অপ্রচলিত, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বর ফিরে গিয়ে জীবনের শেষ ক'টি দিন সেখানে অতিবাহিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মন্দিরের পরিচালকদের অনুমতি মেলেনি।

কাশীপুর উদ্যানবাটির বাড়ি ভাড়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশ চিন্তিত করেছিল, ভক্তরা প্রতিমাসে চাঁদা তুলুক তা তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর। তখন গৃহীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রর ডাক পড়ল। ঠাকুর তাঁকে 'সুরেন্দর' বা 'সুরেশ' মিত্র বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "দেখ সুরেন্দ্র, এরা সব কেরানি-মেরানি ছাপোষা লোক, এরা এত টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন?...বাড়ি ভাড়ার টাকাটা তুমি দিও।"

সুরেন্দ্র সানন্দে রাজি হয়ে যান এবং বাড়ির মালিকের সঙ্গে চুক্তিপত্রে ছ'মাসের গ্যারান্টর হন। ৮০ টাকা ছাড়াও কাশীপুরপর্বে তিনি মাসে ২৩০্ দিতেন। মদ খেয়ে রাত্রে গোলমাল করতেন বলে সুরেন্দ্রকে এক সময় দক্ষিণেশ্বরে পাঠানো হয়েছিল। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন, "দক্ষিণেশ্বর যাইয়া দেখেন, ঠাকুর নহবৎখানার নিকট বকুলতলায় দণ্ডায়মান। প্রণাম করিবামাত্র কহেন, ও "সুরন্দর! খাবি, খা, বারণ করিনে, তবে পা না টলে, আর জগদম্বার পাদপদ্ম হতে মন না টলে ; আর খাবার আগে নিবেদন

করে বলিস, মা তুমি এর বিষটুকু খাও, আর সুধাটুকু আমাকে দাও, যাতে প্রাণভরে তোমার নাম করতে পারি।"

মাসিক টাকা ছাড়াও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের শোয়ার ঘরের খসখস পর্দা, ফুলের মালা, ফল প্রভৃতির খরচও বহন করতেন সুরেন্দ্র। মহাসমাধির পর বরাহনগরে বাড়িভাড়া (১১ টাকা) এবং খাওয়াদাওয়া বাবদ মাসিক ১০০৲ সুরেন্দ্রনাথই দিতেন।

কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে যে প্রচুর মশা ছিল তা জানা যাচ্ছে। দোতলার ঘরে ঠাকুর শায়িত, লণ্ঠন জ্বলে ও একটা মশারি টাঙানো। গিরিশ ও শ্রীমকে ঠাকুর বললেন, "কাশি কফ বুকের টান এসব নেই। তবে পেট গরম। ঘরেই পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে যেতে পারব বলে মনে হয় না।" সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সেবক লাটু (পরে স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "যে আজ্ঞা মশাই, হামি ত আপনার মেস্তর হাজির আছি।"

লাটুর (পূর্বনাম রাখতুরাম) মাধ্যমে আমরা জানি, একদিন টাকা-পয়সার হিসেব রাখা নিয়ে কথা উঠল। নরেন বললেন, এত হিসেব রাখারাখি কেন? এখানে কেউ তো চুরি করতে আসেনি? লাটু বললেন, হিসেব রাখা ভাল।

গোপালদার ওপর হিসেব রাখার দায়িত্ব পড়ল। লাটু (স্বামীজি এঁকে প্লেটো বলে ডাকতেন) জানিয়েছেন, গেরস্তর পয়সা ঠাকুর বেফজল খরচ হতে দিতেন না। একবার দক্ষিণেশ্বরে একটা প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে কেউ তিন-চারটে কাঠি নষ্ট করেছিল। তক্তা থেকে নেমে ঠাকুর নিজেই দেশলাই ধরালেন এবং বললেন, "ওগো, গেরস্থরা অনেক কষ্টে পয়সা বাঁচিয়ে তবে সাধুকে দেয়, সে পয়সার বাজে খরচ হতে দেওয়া উচিত কি?"

ঠাকুরের গলার অসুখ সম্পর্কে লাটু মহারাজ আরও দুটি কথা বলেছেন। একবার দেশে ঠাকুরের দাদার বিকার হয়েছিল, ঠাকুর তাঁকে জল খেতে দিতেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, মরবার সময় তোমার গলা দিয়ে জল গলবে না। দেখো। আর একবার কাকা কানাইরামের বড় ছেলে হলধারী (রামতারক চট্টোপাধ্যায়) দাদার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত

উঠবে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন। হলধারী ঠাকুরের অবতার রূপ বিশ্বাস করতেন না।

কাশীপুর উদ্যানবাটিতে অনেক মজার ঘটনা ঘটেছে। একটা শুনুন কালীর (পরে স্বামী অভেদানন্দ) মুখে।

"নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল। আমি নরেন্দ্রনাথকে সেই অবধি আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় দেখিতাম ও ভালবাসিতাম। নরেন্দ্রনাথও আমায় আপনার সহোদরতুল্য ভালবাসিত। তাহা ছাড়া আমি যে তাহাকে শুধু ভালবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম। বলিতে গেলে আমি ছায়ার মতো সর্বদা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গে থাকিতাম ও নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। তাহা ছাড়া নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।

"আত্মজ্ঞান লাভ করা-সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের আহারাদি-সম্বন্ধে যে সকল কুসংস্কার (prejudice) আছে তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিল। শরৎ, যোগেন, তারকদাদা ও আমি এই বিষয় লইয়া তাহার সহিত বিচার করিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ বলিল, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে সকলের হাতে খাওয়া চলে। তখন কেউ কাকেও ঘৃণা করে না। যতদিন কুসংস্কার থাকবে ততদিন ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।"

স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, "আমরা কেহই মুসলমানের হাতের রান্নাকরা খাদ্য পূর্বে কখনও খাই নাই। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের ন্যায় জাতিবিচার মানিত না। তাহার মত ছিল উদার, তাই সে সকলের হাতের রান্না খাদ্য খাইয়াছে। সেইদিন নরেন্দ্রনাথ আমাদের বলিল : 'চলো, আজ তোমাদের কুসংস্কার ভেঙে আসি'। আমি তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে রাজি হইলাম এবং শরৎ ও নিরঞ্জন আমার কথায় সায় দিল। সন্ধ্যার সময়ে কাশীপুর বাগান হইতে পদব্রজে নরেন্দ্রনাথ আমাদের লইয়া বিডন স্ট্রিটে (বর্তমানে যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার হইয়াছে) পীরুর রেস্টুরেন্টে উপস্থিত

হইল। নরেন্দ্রনাথ ফাউলকারীর অর্ডার দিল এবং আমরা সকলে বেঞ্চিতে নীরবে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ফাউলকারী আসিলে আমরা সকলে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুসংস্কার ভাঙিতেছি ও ঘৃণা দূর করিতেছি এই ধারণা হৃদয়ে রাখিয়া তাহার অল্পমাত্র গ্রহণ করিলাম। নরেন্দ্রনাথ মহানন্দে প্রায় সমস্তটাই আহার করিল। আমরা একটুতেই সন্তুষ্ট। নরেন্দ্রনাথের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং তাহার খাওয়া শেষ হইলে সকলে মহানন্দে পুনরায় কাশীপুরের বাগানে ফিরিয়া আসিলাম।

"তখন রাত্রি প্রায় দশটা। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আমি শশব্যস্তে শ্রীশ্রীঠাকুরেরর সেবা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুক্ষণ আমাদের কাহাকেও কাশীপুরের বাগানে দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন ছিলেন দেখিলাম। আমাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন : 'কিরে, কোথায় সব গিয়েছিলি?'

আমি বলিলাম : 'কলকাতায় বিডন স্ট্রিটে পীরুর দোকানে।'

—'কে কে গিছ্‌লি?'

আমি সকলের নাম করিলাম। তিনি সহাস্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সেখানে কি খেলি?'

আমি বলিলাম : 'মু—র ডালনা।'

তিনি বলিলেন : 'ক্যামন লাগলো তোদের?'

আমি : 'আমার ও শরৎ প্রভৃতির খুব ভাল লাগেনি। তাই একটুখানি মুখে দিয়ে কুসংস্কার ভাঙলাম।'

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছিস। ভাল হ'ল, তোদের সব কুসংস্কার দুর হয়ে গেল।'

আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।"

ঠাকুরের ডাক্তারি বিবরণের দিকে আবার নজর দেওয়া যাক।

১২ ডিসেম্বর ১৮৮৫ : ঠাকুরের কাশি নেই, কিন্তু পেট গরম। কচি পাঁঠার সুরুয়া খেলেন।

২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৫ : ডাক্তারি ওষুধ ছাড়াও দৈব ওষুধের প্রয়োগ।

এই ওষুধ এসেছিল শ্রীরামপুর থেকে। শ্রীমকে "দেখিয়ে" ঠাকুর বলেন, ইনি দাম দেবেন। কিন্তু নবগোপাল ঘোষ ও চুনীলাল ইতিমধ্যেই দাম দিয়ে দিয়েছেন।

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত এই পর্যায়ে লিখেছেন, ব্যাধির বিভীষিকা দেখালে রামকৃষ্ণ হেসে উঠতেন, বলতেন, "দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।"

চণ্ডীগড় থেকে প্রকাশিত স্বামী নিত্যাত্মানন্দের বহুখণ্ডের বই শ্রীম-দর্শনে, কাশীপুরের যে বর্ণনা আছে তা এইরকম : পশ্চিমের জানলার তিন চার হাত পূর্বে ঠাকুরের বিছানা। তাঁর শিয়র থাকত দক্ষিণ দেওয়ালের গায়ে। বাঁদিকে তিন হাত দূরে খড়খড়ির জানলা। মেঝেতে মাদুরের ওপর পাতা শতরঞ্চি, তার ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানা।

১লা জানুয়ারি ১৮৮৬ : সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ দোতলা থেকে নিচেয় নেমে এসে অকাতরে যে আশীর্বাদ বিলিয়েছিলেন তা কল্পতরু উৎসব মারফত এখন লিজেন্ডে পরিণত হয়েছে। মঠ ও মিশনে এই অভাবনীয় ঘটনাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। যে যা চেয়েছে তা দেওয়া ছাড়াও যে কিছু চায়নি তাকেও রামকৃষ্ণ বলেছেন, তোমার চৈতন্য হোক।

লীলাপ্রসঙ্গে এর ব্যাখ্যা : "রামচন্দ্র প্রমুখ কোনো কোনো ভক্ত এই ঘটনাটিকে ঠাকুরের 'কল্পতরু' হওয়া বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, ভাল বা মন্দ যে যাহা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাহাকে তাহাই প্রদান করে। কিন্তু ঠাকুর তো ওইরূপ করেন নাই, নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয় প্রদানের পরিচয় ওই ঘটনার সুব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

আশ্চর্য বিষয় ঠাকুরের যেসব ভক্ত পরে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তাঁদের একজনও কল্পতরুর দিনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। নরেন্দ্রনাথ আগেরদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঠাকুরের সেবা করে ক্লান্ত হয়ে উদ্যানবাটির এক তলায় ঘুমোচ্ছিলেন।

পরের দিন ২ জানুয়ারি ১৮৮৬ শনিবার যে ঠাকুরের শরীরের অবস্থার প্রবল অবনতি হয়েছিল তা ডাক্তার গবেষকরা খুঁজে বার করেছেন। পরের দিন রবিবার অন্তত দু'বার রক্তক্ষরণ। এর ক'দিন আগে তিনি কবিরাজের দেওয়া হরিতালভস্ম সেবন করেন, কিন্তু তা বমি হয়ে যায়।

১১ই জানুয়ারি ১৮৮৬: কবিরাজ নবীন পালের ওষুধ প্রয়োগ। বাগবাজারের এই কবিরাজ শ্যামপুকুরেও এসেছিলেন এবং মর্তলীলার শেষ দিনে (১৫ আগস্ট) কাশীপুরে এসে তাঁর অসহনীয় শারীরিক যন্ত্রণার কথা শোনেন।

১৩ জানুয়ারি ১৮৮৬ : ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেন, গলা থেকে কাঁধ পর্যন্ত সমস্ত ডান দিক ফুলে গিয়েছে। ওজন বেশ কমেছে। একমাত্র 'কোনিয়াম' প্রয়োগে সুফল।

২৮ জানুয়ারি ১৮৮৬ : ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় রিপোর্ট : 'গলার স্বর একেবারে বন্ধ', প্রায় দু-আড়াই সের রক্তক্ষরণ ও বাড়াবাড়ি হয় এদিন রাত্রে।

শ্যামপুকুরে এসে খরচের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত বলরাম বসুকে বলেছিলেন, "তুমি আমার খাবার খরচটা দিও। আমি চাঁদার খাওয়া পছন্দ করি না।" বলরাম বসু কৃতার্থ হয়েছিলেন।

এরপরের বিবরণ শোনা যাক স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা' থেকে। "কাশীপুর বাগানে ক্রমশ সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।...রামবাবু প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তরা খাইবার খরচ কমাইবার জন্য সেবকের সংখ্যা যাহাতে অল্প হয়- সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, দুইজন সেবক থাকিলেই যথেষ্ট হইবে, অপর সকলে নিজ নিজ বাড়িতে থাকিবে।

"এই সংবাদ যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কর্ণে উপস্থিত হইল তখন তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমার এখানে আর থাকবার ইচ্ছে নেই। ইন্দ্রনারায়ণ জমিদারকে টানবো নাকি?—না, বড়বাজারের মাড়ওয়ারীটাকে ডেকে আনব। সেই মাড়োয়ারী অনেক টাকা নিয়ে একবার এসেছিল, কিন্তু

সে টাকা আমি গ্রহণ করিনি।' তাহার পর বলিলেন, 'না, কাকেও ডাকার প্রয়োজন নেই। জগন্মাতা যা করেন তাই হবে।'

"তখন নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি আমরা সকলে বসিয়া আছি, তিনি আমাদিগকে বলিলেন, 'তোরা আমাকে নিয়ে অন্যত্র চল। তোরা আমার জন্য ভিক্ষে করতে পারবি? তোরা আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি, সেখানেই যাব। তোরা ক্যামন ভিক্ষে করতে পারিস দ্যাখা দেখি। ভিক্ষার অন্ন-বস্ত্র শুদ্ধ। গৃহস্থের অন্ন খাবার আর আমার ইচ্ছে নেই।"

ভিক্ষেতে বেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের নানা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কেউ চাল, আলু, কাঁচকলা ভিক্ষা দিল, কেউ বলল, "হোঁৎকা মিনসে, চাকরি করতে পারিস্‌নি, আবার ভিখিরি সেজে ভিক্ষে করতে বার হয়েছিস।" কেউ বলল, "এরা ডাকাতের দল, সন্ধান নিতে এসেছে।" কেউ গুণ্ডার লোক বলে তাড়া করল। শ্রীমা ভিক্ষার চাল থেকে তরল মণ্ড রেঁধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন, "ভিক্ষান্ন খেয়ে আমি পরমানন্দ লাভ করলাম", তিনি বললেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীমকৃষ্ণের স্বাস্থ্যবিবরণও অনুসন্ধানী ডাক্তার তারকনাথ তরফদার পরম যত্নে সাজিয়েছেন।

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ : বৈদ্য মহাফেজের নির্দেশ—বুড়িগোপানের পাতা চিবনো, সাতপুরু কলাপাতা দিয়ে ঘা বাঁধতে হ'ল।

৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ : কানের দিকে ফুলো বেড়েছে। নিত্য আহার পাঁচ-ছটাক বার্লি।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ : গাঁদা পাতার পুলটিস লাগানো হ'ল।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ : ঘায়ের মুখ নীচের দিকে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ : ঠাকুরের জামরুল খাবার ইচ্ছে, কিন্তু খেতে পারলেন না।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ : ঘি দিয়ে ক্ষতের ড্রেসিং।

মার্চ মাসের ২৫ তারিখে অপরাহ্নে ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের নবম অধ্যক্ষ ডাক্তার জে এম কোট্‌সকে সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরে এলেন।

পরবর্তী বর্ণনাটুকু স্বামী প্রভানন্দের রচনা থেকে : "অপরাহ্ণকাল। ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত মেডিকেল কলেজের প্রধান চিকিৎসক ও অধ্যক্ষ ডাঃ কোট্‌স সাহেবকে নিয়ে কাশীপুর বাগানবাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন।"

এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন, "যদিচ প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতেছে, তথাপি প্রায় আট মাস হইতে যায় আশামতো উপশম না দেখিয়া ভক্তগণ বড়ই উদ্বিগ্ন হন ; এবং কি রোগ, বা কি উপায়ে শান্তি হইতে পারে, এই আশায় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞ ডাক্তার কোট্‌স সাহেবকে আনয়ন করেন।"

ডাঃ কোট্‌সের পুরো নাম Dr. J. M. Coates। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁর পরিচায়ক উপাধি M.B.B.S., M.D., L.F.P.S.G.। তিনি মেডিকেল কলেজের নবম অধ্যক্ষ। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একাজে যোগদানের পূর্বে তিনি ছিলেন মিলিটারিতে এবং সেখানে তিনি Brigadier Surgeon-এর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ডাঃ কোট্‌স জবরদস্ত সাহেব। তিনি রামবাবুর সঙ্গে বাগানবাড়ির দোতলার হলঘরের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। জুতো-পায়ে গটমট করে তিনি ঘরে ঢুকে পড়লেন। নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেবক শশী। তাঁর হাতে ডাক্তারি ব্যাগটি তিনি ধরবার জন্য এগিয়ে দেন। শশী আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। খ্রিস্টান সাহেবের ব্যাগ স্পর্শ করতে তাঁর দ্বিধা লক্ষ্য করে কোট্‌স সাহেব রেগে অগ্নিশর্মা হন। তিনি চেঁচিয়ে বলতে থাকেন : You go from here. you ullu. উপস্থিত অন্য একজন ডাক্তারের ব্যাগ ধরেন। এদিকে শশীর প্রতি সাহেব ডাক্তারের রূঢ় আচরণ লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর মর্মাহত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলতে থাকেন, 'আহা! থাক্ থাক্।'

ডাঃ কোট্‌স মাদুরের উপর বসেছিলেন। ঠাকুরের ব্যবহার্য তাকিয়া ডাক্তারকে দেওয়া হয়েছিল ঠেসান দিয়ে বসবার জন্য। এদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দেখে মাস্টারমশাই তাকিয়া নিয়ে ঠাকুরের পিঠের পিছনে স্থাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ তাতে হেলান দিয়ে বসেন। তারপর তাকিয়া সরিয়ে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের হাত ধরে বলেন, তাকিয়ার উপর হেলান দিয়ে বসতে। ঠাকুরের মিষ্ট আচরণ দেখে

ডাক্তারের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। হৃষ্টচিত্ত ডাক্তার কোট্‌স বলেন : He (Sri Ramakrishna) is naturally a gentleman.

অতঃপর 'ডাক্তারসাহেব গলদেশ চাপিয়া পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলে, ঠাকুর যেন শিহরিয়া উঠেন এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁর স্বভাবসমাধিতে নিমগ্ন হন। ডাক্তার তখন ইচ্ছামত পরীক্ষা করিয়া কহেন—ইহাকে ক্যান্সার অর্থাৎ কণ্ঠনালীর ক্ষতরোগ বলে। বহুদিন ব্যাপিয়া অবিরাম ঐশ্বরিক কথায় গলমধ্যস্থ সূক্ষ্ম শিরা ও ঝিল্লীর উত্তেজনায় ইহার উৎপত্তি। আমাদের দেশে ইহাকে ধর্মযাজকের কণ্ঠরোগ কহে। আমাদের উগ্র ঔষধ এ-অবস্থায় ক্লেশদায়ক, সুতরাং বর্তমান চিকিৎসাই শুভ।'

আর ডাক্তারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সম্বন্ধে রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, 'তিনি (ডাক্তার কোট্‌স) তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসাতীত বলিয়া ব্যক্ত করেন।' শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ভাগবৎ-প্রসঙ্গ শুনবেন। তাঁর অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে বলেন যে ঈশ্বর এক বৈ দুই নন। তিনিই সর্বভূতে বিরাজ করছেন।

স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় আরও এক টুকরো তথ্য। তিনি বলেছিলেন, কোনো বিলাতফেরত ডাক্তারর অসুখের সময় তাঁর কাছে এসেছেন। ঠাকুরের শরীর বিশেষ অসুস্থ দেখে তিনি বললেন, "আপনার শরীর অসুস্থ, তা না হলে আমি আপনার কাছে অনেক শিখতে পারতুম, আপনিও আমার কাছে অনেক শিখতে পারতেন।" কথাপ্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ তিনবার এই কথাটি আবৃত্তি করাতে ঠাকুর উত্তর দেন, "তোমার কাছে আমার কিছুই শিখবার নাই।" ডাক্তার কোট্‌স বিদায় নেবার পর ঠাকুরের নির্দেশে তাঁর বিছানাপত্রে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেওয়া হয়! শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা স্পর্শ করে 'ওঁ তৎ সৎ' মন্ত্র জপ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ দেখে উপস্থিত ভক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় হেসে ওঠেন। উপস্থিত মাস্টারমশাই প্রমুখ ভক্তগণও হাসতে থাকেন।

সাহেব ডাক্তারের ফি নিয়ে তিনটি লোকশ্রুতি। প্রথম মত, কল্পতরুর দিনে ঠাকুরের কৃপাধন্য ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় (ভাই ভূপতি) ডাক্তার

কোট্‌সকে বত্রিশ টাকা দেন। স্বামী প্রভানন্দর ফুটনোট : "৪ মার্চ ১৮৮৬ তারিখের বিবরণী থেকে জানা গেছে ভূধর চাটুজ্যে এই টাকা দিতে চেয়েছিলেন। ইনি শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য, এঁদের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে (২০৩/১/১ বিধান সরণি) ঠাকুর গিয়েছিলেন। তৃতীয় মতে ডাক্তার কোট্‌স ভিজিট নেননি, তিনি এই অর্থ ঠাকুরের সেবার জন্য ব্যয় করতে বলেছিলেন।

ডাক্তার কোট্‌স যেদিন কাশীপুরে এলেন সেই রাত্রে কিন্তু বেশ বাড়াবাড়ি হ'ল। রোগীর দম বন্ধ হবার উপক্রম। ডাঃ কোট্‌স অবশ্য বলেই গিয়েছিলেন, রোগ চিকিৎসাতীত।

শনিবার ৮ মার্চ, ১৮৮৬ দোলপূর্ণিমার দিনে কাশীপুর উদ্যানবাটির এক হৃদয়গ্রাহী ছবি এঁকেছেন স্বামী প্রভানন্দ। রামচন্দ্র দত্তের স্ত্রী এলেন ঠাকুরের পায়ে আবির দিতে, বসে বসে পাখার হাওয়া করলেন। কোন্নগর থেকে হাজির হলেন মনোমোহন মিত্র। এঁরই বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালচন্দ্র ঘোষ (পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দের) বিবাহ হয়। পরবর্তীকালে মনোমোহন 'আমার জীবনকথা' নামে স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেননি। দোলের দিন ঠাকুরের জন্য মনোমোহন এনেছিলেন, পুন্নাগের ডাল। ঠাকুর কয়েকটি ডালপালা নাকের কাছে ধরেন, কিন্তু এর রুক্ষ গন্ধ সহ্য করতে পারেননি। মনোমোহনের দলে সেদিন ভগ্নী বিশ্বেশ্বরীও ছিলেন।

সেদিনের আরও এক ঘটনা নজর এড়ানো উচিত নয়। বড়বাজারের ব্যবসায়ী মাড়োয়ারি ভক্তরা সদলে এসেছিলেন। বড়বাজারেই শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময় সংবর্ধিত হয়েছিলেন, আজও তাঁরা প্রণাম করলেন এবং 'জয় সচ্চিদানন্দ' বলতে বলতে বিদায় নেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাই হাইকোর্টের উকিল অতুলচন্দ্র মাঝে-মাঝে ঠাকুরের নাড়ি দেখতেন। অতুলের নাড়িজ্ঞানের প্রশংসা করতেন ঠাকুর। 'নাড়িজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞান এত অতুলের। যেন তেঁহ ধন্বন্তরি বেশে মানুষের।'

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের লীলামৃতে লেখা হয়েছে, অতুল একসময় ঠাকুরকে বলেন, "নরেন এখনও ওকালতি পরীক্ষায় সচেষ্ট, অথচ উকিল

ও ডাক্তারদের সম্বন্ধে ঠাকুরের ধারণা তেমন ভাল নয়।" অতুলের অনুযোগের দু'চারদিন পরে হঠাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ পাগলের মতো এক বস্ত্রে নগ্নপদে গিরিশ-ভবনে উপস্থিত। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন— অবিদ্যামাতার মৃত্যু ও বিবেক পুত্রের জন্ম-অশৌচে এই অবস্থা। এরপর কাশীপুর উদ্যানে যাইয়া চিরদিনের মতো আত্মনিবেদনছলে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইলেন।

বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এই পর্বে ঠাকুরকে দেখেন। ঠাকুর তাঁর ক্ষতস্থান দেখিয়ে বলেন, "দেখ দেখি, এইটা ভাল করে দাও না।" ডাঃ দত্ত ওষুধপত্র দেন, তিনি ঠাকুরের রোগকে ক্যান্সার মনে করেননি।

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারের ডাইরি অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণকে লাইকোপোডিয়াম ২০০ দিয়ে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। ২২ মার্চ রাত্রে ভারমিশেলি সেদ্ধ দুধ খেলেন। ৩০ মার্চ তিনি শীতবোধ করতে লাগলেন। এরপরেই সেই বিখ্যাত ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ ঘোষাল (পরে স্বামী শিবানন্দ) ও কালীপ্রসাদ চন্দ্র (পরে স্বামী অভেদানন্দ) কাউকে কিছু না বলে কাশীপুর থেকে বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের পুণ্যক্ষেত্র বোধগয়ায় চলে গেলেন।

অভেদানন্দ তাঁর 'আমার জীবনকথায়' এপ্রিল মাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির বিশ্লেষণ করে স্বামী প্রভানন্দের সিদ্ধান্ত, ৩১ মার্চ ১৮৮৫ সন্ধ্যায় এঁরা চলে যান।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তখনকার পরিস্থিতির একটি সুন্দর ছবি এঁকেছেন। এই সময় ঠাকুর বিমর্ষভাবে কোনো যুবককে বলেন—"দ্যাখ, নরেন্দ্র এতই নিষ্ঠুর যে, এই অসুখের সময় আমাকে ছেড়ে কানাই ঘোষালের (পূর্ববন্ধু) ছেলে, যাকে নরেন্দ্র এখানে আশ্রয় দিল, সেই তারকের সঙ্গে কোথায় গেছে, বা তারক তাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে, আর কালীও সঙ্গে গেছে।" ['বলিয়া রাখা ভাল যে, প্রভুর কৃপা পাইয়াও তারকদাদা কর্মবিপাকে ইতিপূর্বে ছায়ার মতন নিত্যগোপালের (পরে জ্ঞানানন্দ অবধূত) সঙ্গে ফিরিতেন।']

ঠাকুরকে প্রবোধ দেবার জন্য একজন যুবক বললেন, "কোথা যাবে নরেন্দ্র? হট্ করিয়া যাইলেও আপনাকে ছাড়িয়া ক'দিন থাকবে?" তখন প্রভু হাসিমুখে কহেন—ঠিক বলেছিস। যাবে কোথায়? এল্ তলা বেল তলা, সেই বুড়ীর পোঁদ তলা। আমার কাজের জন্যে মহামায়া যখন তাকে এনেছেন, তখন আমারই পিছনে তাকে ঘুরতে হবে। বলাবাহুল্য, দু'চারদিন পরে নরেন্দ্রনাথ যেন অপরাধীর মতো প্রভুসমীপে উপস্থিত হ'ল।" (৮ এপ্রিল, ১৮৮৬ সন্ধ্যায় তাঁরা ফেরেন)।

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে 'আমার জীবনকথায়' (স্বামী অভেদানন্দ)।

"নরেন্দ্রনাথ, তারকদাদা (স্বামী শিবানন্দ) ও আমি প্রায়ই বুদ্ধদেবের জীবনী পাঠ করিতাম এবং তাঁহার ত্যাগ ও কঠোর সাধনার বিষয় আলোচনা করিতাম। তখন আমরা ললিতবিস্তরের গাথাগুলি বেশ মুখস্থ করিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম' ইত্যাদি আবৃত্তি করিয়া ধ্যান করিতাম। ক্রমে আমাদের তিনজনেরই বুদ্ধদেবের তপস্যার স্থান দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল।

"একদিন নরেন্দ্রনাথ, তারকদাদা ও আমি কলিকাতা হইতে নগ্নপদে হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যার পূর্বে কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলাম। ইচ্ছা এত বলবতী হইল যে, আমরা আর থাকিতে পারিলাম না।

"নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'চল্, কাকে কিছু না বলেই আমরা বুদ্ধগয়ায় চলে যাই।' শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমরা বুদ্ধগয়ায় যাওয়ার কোনো কথা বলিলাম না। নরেন্দ্রনাথ আমাদের তিনজনের জন্য রেলভাড়া সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইল। আমরা কৌপীন, বহির্বাস ও কম্বল লইয়া প্রস্তুত হইলাম।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরানগর-খেয়াঘাট হইতে গঙ্গা পার হইয়া আমরা তিনজনে বালির দিকে যাত্রা করিলাম। রাস্তার ধারে একটি মুদির দোকানের রকে সেই রাত্রি কাটাইলাম। তার পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বালি স্টেশনে গিয়া রেলগাড়িতে উঠিলাম। পরদিন গয়াধাম দর্শন করিয়া বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলাম।

"বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, পরে

বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়া আনন্দে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম।

মন্দিরের অভ্যন্তরে গম্ভীর শান্ত পরিবেশ। মন অমনি সমাধি-সাগরে ডুবিয়া যায়। আমরা ধ্যানের সময়ে অপূর্ব-নির্বাণসুখের আভাস ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

"পরে মন্দিরের বাহিরে বোধিদ্রুমের সম্মুখে সম্রাট অশোক-নির্মিত বজ্রাসনে বসিয়া আবার তিনজনে ধ্যান করিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ অপূর্ব এক জ্যোতিঃ দর্শন করিল। আমার সর্বশরীরেও যেন শান্তিস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তারক দাদাও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। দুই ঘণ্টা ধ্যানের পর আমরা তিনজনে নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করিয়া মাধুকরি করিলাম এবং কিছু জলযোগ করিয়া তথাকার ধর্মশালায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ওই ধর্মশালায় রাত্রিযাপনও করিলাম। আমাদের সঙ্গে কোনো গরম কাপড় ছিল না, সুতরাং রাত্রিতে শীতের জন্য আর নিদ্রা হইল না। তাহাতে আবার মধ্যরাত্রে নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ হইল। যাহা আহার করিয়াছিল তাহা সম্ভবতঃ হজম হয় নাই। দুই-চারিবার দাস্ত হইল এবং পেটের যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাইতে লাগিল।

"আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন কাতর হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি নরেন্দ্রনাথ একটু সুস্থ বোধ করিল। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছু বলিয়া আসা হয় নাই, তাঁহার অসুখের সময়ে আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়া আসা অন্যায় হইয়াছে—এই সকল কথাই ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল।

"ক্রমশই আমাদের মন অস্থির হইয়া উঠিল। যেন এক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথের পেটের অসুখ তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই অথচ কাহারও নিকট কোনোরূপ সাহায্য পাইবার উপায় নাই। দেখিলাম রেলভাড়াও সঙ্গে নাই। কাজেই আমরা বিষম বিভ্রাটে পড়িলাম, কিছু স্থির করিতে পারিলাম না। সুতরাং শীঘ্র কাশীপুরে ফিরিয়া যাওয়া কর্তব্য মনে করিলাম। কিন্তু ফিরিয়া যাইবার কোন পাথেয় তো আমাদের কাছে ছিল না।

"তখন নরেন্দ্রনাথ বলিল : 'চল্, আমরা বুদ্ধগয়ার মোহন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি ও কিছু অর্থ ভিক্ষা করি।' আমি ও তারকদাদা তাহাতে সম্মত হইলাম।

"প্রাতঃকালে নিরঞ্জনা-নদীর বালির চর পার হইলাম। নদীর বালি এত ঠাণ্ডা ছিল যে, আমাদের খালি-পা যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। ঠাণ্ডায় আগুন পোড়ার ন্যায় পা জ্বালা করে তাহা পূর্বে আমরা জানিতাম না। অতিকষ্টে হাঁটিয়া নিরঞ্জনা-নদী পার হইয়া মোহন্তের মঠে উপস্থিত হইলাম। মঠের দশনামী সন্ন্যাসীদের সহিত আমাদের আলাপ হইল। সেখানে সাধুদের পঙ্গদে বসিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিয়া বিশ্রাম করিলাম। "নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের অত্যন্ত ভক্ত শুনিয়া মঠের মোহন্ত মহারাজ তাহাকে গান শুনাইতে অনুরোধ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ যদিও পেটের অসুখে অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিল, তথাপি তাহার গলার তেজস্বিতা কমে নাই। সে কয়েকটি ভজন-গান গাহিল। তাহার অপূর্ব সঙ্গীত-পরিবেশনে মোহন্ত মহারাজ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। পরে আমরা বিদায় লইবার সময়ে আমাদের পাথেয় নাই শুনিয়া তিনি কিছু পাথেয় দিলেন।

"আমরা পুনরায় নিরঞ্জনা নদী পার হইয়া বুদ্ধগয়ায় আসিলাম এবং গয়াধামে বাঙালি ভদ্রলোক উমেশবাবুর বাড়িতে অতিথি হইলাম। সেখানে সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রনাথ আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজনগান করিল। তথায় অপূর্ব সঙ্গীত পরিবেশনে সকলে মুগ্ধ হইলেন। উমেশবাবু আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়া রাত্রে থাকিবার স্থান দিলেন। পরদিন প্রাতে রেলে চড়িয়া আমরা কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলাম ও পরদিন সন্ধ্যার সময় কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইলাম।

"এইদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মহানন্দে সাগ্রহে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। আমরা বুদ্ধগয়ার সমস্ত ঘটনাই আনুপূর্বিক তাঁহাকে নিবেদন করিলাম। সকল ঘটনা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রশান্তভাবে বলিলেন, বেশ করেছিস।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ সবদিক থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বই।

নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই বলেছিলেন, "কেন ভাবছিস? কোথায় যাবে সে? ক'দিন বাইরে থাকতে পারবে? দেখ না এল বলে।" তারপর তিনি হাসতে হাসতে বলেন : "চারখুট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নেই ; যা কিছু আছে সব (নিজের শরীর দেখিয়ে) এইখানে।"

বাবুরাম মহারাজ (পরে স্বামী প্রেমানন্দ) এই প্রসঙ্গে বলে গিয়েছেন, "পরমহংসদেব কেঁদেছিলেন—তিনি বললেন যে, ও (নরেন্দ্র) যেরকম উঠে-পড়ে লেগেছে যা চাচ্ছে তা শীঘ্র পেয়ে যাবে।"

৬ এপ্রিল ১৮৮৬ : ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত এলেন কাশীপুরে, পরে শ্রীমকে ডাক্তার বলেন, প্রথম টের পেলুম যে ওঁর ছেলেবেলায় গলায় গণ্ডমালা (স্ক্রোফুলা) ছিল।

ঠাকুরের পেটে পোড়া দাগ দেখে ডাঃ দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি?

মাস্টারমশাই বলেন, পিলের চিকিৎসা হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন, সে বড় ছোটবেলায়।

ডাক্তার দত্ত : কর্তা দেখছি সবরকমই করে বসে আছেন।

অসুখ যতই থাক, আনন্দকে কখনও বিসর্জন দেওয়া হয়নি কাশীপুর থেকে। তারক (পরে স্বামী শিবানন্দ) একদিন পাচক অসুস্থ হওয়ায় সবার জন্য রান্না করছিলেন—ডাল, ভাত, রুটি আর চচ্চড়ি। "চচ্চড়িতে তখন ফোড়ন দিয়েছি, ঠাকুর উপর হতে সে ফোড়নের গন্ধ পেয়ে জনৈক সেবককে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাঁরে, কি রান্না হচ্ছে রে তোদের? বাঃ! চমৎকার ফোড়নের গন্ধ ছেড়েছে তো! কে রাঁধছে?" আমি রাঁধছি শুনে তিনি বললেন—"যা, আমার জন্যে একটু নিয়ে আয়।" সেই চচ্চড়ি ঠাকুর একটু খেয়েছিলেন।

২৯ এপ্রিল ১৮৮৬ : কোনো কোনো চিকিৎসকের আশা 'রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে।' ভক্ত নাগ মশাই ঐদিন অনেক খুঁজে ঠাকুরের জন্যে টাটকা আমলকী এনেছেন। নাগমশাইকে ভাত বেড়ে দেওয়া হ'ল, তিনি জানালেন, আজ একাদশী।

এর পরের ঘটনা শ্রীশ্রীমায়ের কথা থেকে স্বামী প্রভানন্দ উদ্ধৃতি

দিয়েছেন। মাকে ঠাকুর বললেন, "ঝাল দিয়ে একটু চচ্চড়ি রেঁধে দাও। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, ঝাল বেশি খায়।" ঠাকুর আরও বললেন, "একখানা থালায় সব বেড়ে দাও। ও প্রসাদ না হলে খাবে না।" ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিতে বসলেন। সেসব দিয়ে ভাত প্রায় এত কটা খেলেন।

মা বললেন, "এই তো বেশ খাচ্ছ, তবে আর সুজি খাওয়া কেন? ভাত দুটি দুটি খাবে।" ঠাকুর বললেন, "না, না, শেষ অবস্থায় এই আহারই ভাল।" মে মাসের ১৭ তারিখে শারীরিক অবস্থার অবনতি। দুদিন পরের রিপোর্ট, শরীরে অসহ্য জ্বালা। পরের সপ্তাহে তিনি ইঙ্গিতে ফিসফিস কথা বলছেন। দেহ কঙ্কালসার।

এরপর থেকেই বেশ কয়েক মাস ধরে কাশীপুর সংবাদের অপ্রতুলতা। রোগে জর্জরিত হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনুগত সেবকদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। যোগীন (পরে স্বামী যোগানন্দ) অসুস্থ শুনে তিনি বললেন, "সেবার ত্রুটি হবে বলে, তোমরা শরীরের যত্ন নিচ্ছ না। তোমাদের শরীর ভেঙে গেলে আমার যত্ন করবে কে? তোমরা বাপু অসময়ে খাওয়াদাওয়া করো না।"

এরপর থেকেই কাশীপুরের বিস্তারিত বিবরণের ভাঁটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ডাক্তার সরকারও অনেকদিন অনুপস্থিত, ডাক্তার রাজেন দত্তের ভিজিটও অনিয়মিত। শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার কি হবে ভেবে উপস্থিত সবাই বেশ চিন্তিত।

কথামৃতের কথক মাস্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্ভবত এই সময় কম আসতেন। তাঁর তখন খুব বিপদ, চাকরি গিয়েছে। বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষক। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রদের ফল আশানুরূপ না হওয়ায় বিদ্যাসাগর তাঁকে ডেকে অপমানকর কথাবার্তা বলেছেন। বিদ্যাসাগর মুখের ওপর বলেছেন, পরমহংসদেবের কাছে অত্যধিক যাতায়াতের ফলেই এ ধরনের অবহেলা ঘটেছে।

অপমানিত মাস্টারমশাই পরেরদিন (শুক্রবার) রেজিগনেশন চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। সংসার চলবে কিভাবে তা না চিন্তা করেই পদত্যাগ।

কাশীপুরে শয্যাশায়ী ঠাকুর সব শুনলেন, তারপর 'সাড়ে তিনটে পাশ' ভক্তকে তিনবার বললেন, বেশ করেছ, বেশ করেছ, বেশ করেছ।

রবিবারও মাস্টারমশাই কাশীপুর বাগানবাড়িতে এসেছিলেন। ওইদিন একসময় গঙ্গাধর নরেন্দ্রনাথকে বললেন, রাজ চ্যাটার্জি বলেছে, ছাত্রেরা মাস্টারমশাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল। মাস্টারমশাই নাকি একথা শুনে বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়েন।

"নরেন্দ্রনাথ ফোঁস করে ওঠেন। তিনি বলেন : কি বলছিস, মাস্টারমশাই কি কেয়ার করেন? তোর বিদ্যাসাগর বুঝি মনে করলে মাস্টারমশাইয়ের পরিবার ছেলেপুলে আছে, তিনি আর চাকরি ছাড়তে পারবেন না।"

এর পরেই প্রায় লম্ফ দিয়ে ১৮৮৬ আগস্ট মাসে এসে পড়া। এবার আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃতের লেখক বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের ওপর একটু বেশি নির্ভর করব।

ঠাকুর "ক্ষুধা সত্ত্বেও অনুমাত্র তরল পদার্থ গ্রহণে অসমর্থ হন। কোনোমতে যদি কিঞ্চিৎ পান করিলেন, অমনি দ্বিগুণমাত্রায় ক্লেদ নির্গত হওয়ায় আরও ক্লেশ বোধ করেন। ...একদিন শ্রীমুখ-বিগলিত ক্লেদমিশ্রিত পায়স হস্তে নরেন্দ্রনাথ কাতরভাবে কহেন—প্রভুর সুব্যবস্থায় তাঁহার প্রসাদ ধারণে আমাদের চিত্তপ্রসাদ হইয়াছে, কিন্তু এখন বিধি বিরূপ। আইস, তাঁহার সত্তাস্বরূপ ইহা পান করিয়া আমাদের অস্থিমজ্জায় যেন তাঁহার অবাধ অধিষ্ঠান বোধ করিতে পারি। এই বলিয়া কিয়দংশ স্বয়ং পান করিলেন এবং আমাদিগকেও করাইলেন।..."

রসিক চূড়ামণি ঠাকুর। তিনি বলছেন : "দেখছি সাগরপারে অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আছে, তাদের সঙ্গে মিশতে হলে তাদের মত পোশাকের দরকার। তাই ইচ্ছে হয় ইজের পরে ডিশবাটিতে খাই। কহিবামাত্র সকলই সংগ্রহ হইল এবং প্রভুও উহা ব্যবহারে আনন্দ করিলেন। প্রভুর প্রেরণায় পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার মহিমা প্রচারকালে, নরেন্দ্রনাথ তাঁহারই কথা স্মরণ করিয়া ওই দেশের উপযোগী পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। নচেৎ সন্ন্যাসী

হইয়া সাহেব সাজিবার বাসনায় নহে।”

স্বামী সারদানন্দের ‘শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ’ ঠাকুরের বিষয়ে আমাদের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কাশীপুর পর্বটি যে প্রায়-অনুপস্থিত তা গ্রন্থকার নিজেও অনুভব করতেন। স্বামী নির্লেপানন্দ এ বিষয়ে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন : “শেষ জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের চরিতকথার বাকিটুকু (কাশীপুর বাগানের ঘটনাবলী) লিখিয়া লীলাপ্রসঙ্গ-কে পূর্ণ অবয়ব ও সম্পূর্ণ গঠন দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে, একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—“দ্যাখো, এখন দেখছি, ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছুই বোঝা হয়নি। তাঁর ইচ্ছা হয়, লেখা হবে।”

সে প্রত্যাশা থেকে অনুরাগীরা বঞ্চিত হলেও, ছড়িয়ে ছিটিয়ে লীলাপ্রসঙ্গের এখানে ওখানে যা আছে তাও মন্দ নয়। কিন্তু সে সবের খোঁজখবর করার আগে দ্রুত গোটা কয়েক টুকরো খবর দেওয়া যাক। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই তাঁর কর্তব্য ভুলতে চাইতেন না। নিজের দিদি কাত্যায়নীর সন্তানদের সম্বন্ধে দাদার ছেলে রামলালকে বললেন, “ওদের খবর নিসরে রামলাল, নয়তো ওরা বলবে আমাদের মামার বাড়িতে কেউ নেই। পুজোর সময় এক একখানা কাপড় দিস।” এই ভাইপোকে ঠাকুর আদর করে ‘রামনেলো’ বলে ডাকতেন।

শ্রীশ্রীসারদামণিকে ঠাকুর বলেছিলেন, “তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।” বরং পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়, কামারপুকুরে নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট কোরো না। কারও কাছে একটি পয়সার জন্যে চিতহাত কোরো না, তোমার মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।’ সারদামণিকেই ব্যধিযুক্ত কণ্ঠে তিনি যে গানটি গেয়েছিলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ :

‘এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়।
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়।’

শেষ গানও শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এই কাশীপুরে ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে। ভক্ত সেবকরা গানের মধ্য দিয়ে প্রায়ই দুঃখকে ভুলবার চেষ্টা চালাতেন কাশীপুরে।

স্বামীজির মধ্যমভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, মহাপ্রয়াণের কদিন আগেও চলতো নরেন্দ্রনাথের গানের মহড়া। রাত্রে তাঁরা "উদ্দাম কীর্তন শুরু করলেন। চীৎকার ধ্বনিতে বাড়ি কাঁপিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনের দলের ভিতর থেকে একজনকে ডেকে বললেন, তোরা বেশ রে, কেউ মরে, কেউ হরিবোল বলে...পরক্ষণেই আহ্লাদ করে বললেন, ওর সুরটা এইরকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে ঐ কলিটা দিতে হয়।"

কাশীপুরে শেষ পর্ব সম্বন্ধে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র তাঁর 'জীবনবৃত্তান্তে' লিখেছেন : "অবস্থার দিন দিন পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন... উত্থান শক্তি রহিত হইল, একেবারে স্বরভঙ্গ হইয়া গেল, তখন অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারি, কবিরাজি, আধিভৌতিক, টোটকা প্রভৃতি সকলেরই সাহায্য লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। কোনো কোনো ভক্ত স্ত্রীলোক তারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণামৃত ও বিল্বপত্র আনাইয়া ধারণ করাইলেন, কেহ কেহ (শ্রীমা) হত্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু সকলই বিফল।"

অসুস্থ অবস্থায় ভাবসমাধি সম্পর্কে একালের বিশ্লেষক ডাক্তার তরফদারের ব্যাখ্যা : "ভাব বা সমাধি হলে গলায় ব্যথা বাড়ে। সম্ভাব্য কারণ : সমাধিকালে 'কুম্ভক' বা শ্বাসবন্ধ' থাকে। হয়তো এসময় ভোকাল কর্ড দুটি পরস্পর চেপে লেগে গ্লটিসকে সজোরে বন্ধ করে রাখে। ফুসফুস থেকে নিশ্বাসবায়ু তাতে ধাক্কা মারে।" সমাধিকালে ক্যান্সার কোষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক বের হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। "তবুও রামকৃষ্ণের সমাধি বাধা মানেনি কোনো। শেষদিনেও প্রায় দু'ঘণ্টা তিনি ছিলেন গভীর সমাধিমগ্ন।"

ডাক্তারি বিশ্লেষণে রবিবার ৩১শে শ্রবণ ১২৯৩ (১৫ আগস্ট ১৮৮৬) সকালে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ "বেশ ভালো"।

অন্য বিবরণ : "এইদিন সকাল থেকেই ঠাকুরের ব্যাধি সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। তাঁকে বালিশে ঠেস দিয়ে

বসিয়ে রাখা হয় যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে।"

শ্রীশ্রীমা একবার কাছে যেতেই তিনি বলেন, "এসেচ ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি—জলের ভিতর দিয়ে—অ-নেক দূর।"

শ্রীশ্রীমা কাঁদতে থাকায় ঠাকুর বলেন, "তোমার ভাবনা কী? যেমন ছিলে, তেমন থাকবে। আর এরা আমায় যেমন করচে, তোমায়ও তেমনি করবে।"

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন, "প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথকে পরমতত্ত্ব উপদেশ-মানসে তদ্‌গতপ্রাণ শশিভূষণকেও নিম্নতলে যাইতে বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে কহেন—ভালো করে দেখ যেন উপরে কেহ না থাকে। এইবার প্রভু তাঁহাকে অতিনিকটে বসাইয়া, যে ব্রহ্মজ্ঞান সৃষ্টিকাল হইতে গুরু পরম্পরায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন--যদিও আমাতে তোমাতে অভেদাত্মা তথাপি বাহ্যদৃষ্টিতে গুরু-শিষ্যরূপে পৃথক ছিলাম। আজ তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব অর্পণ করে ভিখারি হয়ে নামে রামকৃষ্ণ রহিলাম; তুমি রাজরাজেশ্বর হয়ে দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ হলে।"

আরও বর্ণনা রয়েছে। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখছেন : "আজ ধারা শ্রাবণের শেষদিন, অথবা ভাগ্যহীন আমাদের অশ্রুধারার প্রথম দিন।...কিছু না খাওয়ায় সেবকগণ ভাবিলেন—বোধহয় বেদনা বৃদ্ধিতে আহারে অনিচ্ছা।" আজ ভাতের পায়স খাব, শুনিয়া সকলে আশ্বস্ত। পায়স আনিলে বলিলেন, বসে খাব।

এই খাওয়া প্রসঙ্গে বর্ননা চাররকম খাবারের প্রসঙ্গ পাওয়া যাচ্ছে : ভাতের পায়েস, ভাতের মণ্ড, সুজির মণ্ড ও খিচুড়ি। বৈকুণ্ঠনাথের বর্ণনা অনুযায়ী গলা দিয়ে কিছুই যখন ঢুকছে না তখন ঠাকুর তাঁর সেবকদের বলেন, "ভিতরে এত ক্ষিধে যে হাঁড়ি-হাঁড়ি খিচুড়ি খাই; কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।"

"আজীবন কার্যকলাপ যাঁর সবই নতুন, তাঁর খিচুড়ি খাইবার ইচ্ছাও এক নতুন ব্যাপার। অনুশীলনে দেখা যায়, অবতার পুরুষমাত্রেই এক এক প্রকার ভোজ্য প্রিয় ছিল। অযোধ্যানাথের রাজভোগ, বৃন্দাবনচন্দ্রের ক্ষীরসর, অমিতাভের ফাণিত (এক প্রকার মিষ্টান্ন), শঙ্করের প্রিয় ভোজ্য

কি জানা যায় না; তবে তাঁর সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভোজে পুড়ীলাড়ুর সমাদর হয়। নিমাইচাঁদের মালসাভোগ (মৃৎপাত্র-পূরিত চিড়া মুড়কি দধি)।...দক্ষিণেশ্বর-ভূষণ প্রভু এক অভিনব সুখসাধ্য খেচরান্ন ভোজনের ইচ্ছা করিলেন।. তাই প্রিয়তম নরেন্দ্রনাথ প্রভুর জন্মোৎসবে তাঁহারই অভীপ্সিত খেচরান্ন দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপের এরূপ বিরাট ভোগের ব্যবস্থা করেন, যাহা ভারতের কেন, জগতের কোনো প্রদেশেই দেখা যায় না।"

শেষের সেই রবিবারে কাশীপুরে খিচুড়ি নিয়ে আরও গোলোযোগ। সেবকদের জন্য শ্রীমা খিচুড়ি রাঁধছিলেন, তার নিচের অংশ ধরে গেল। ছেলেরা তাই খেল। তাঁর একটা শাড়ি ছাদে শুকতে দেওয়া হয়েছিল। সেটা আর পাওয়া গেল না। তুলবার সময় পড়ে একটা জলের কুঁজো চুরমার হয়ে গেল।

রবিবারের অপরাহ্নে জনৈক ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন। যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে। ঠাকুর তার সঙ্গে পুরো দু'ঘণ্টা কথা বললেন। বুদ্ধের ইহ-জীবনের শেষ দিনটিতে নাকি এরূপ একজন সেবক শশী (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) কয়েক মাইল দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার নবীন পালকে ধরে নিয়ে, গাড়িতে চড়িয়ে তাঁকে কাশীপুরে নিয়ে আসেন।

ঠাকুর তখন ডাক্তারকে বললেন, "আজ আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। নাড়ী পরীক্ষা করে ডাঃ পাল তেমন কিছু বুঝতে পারলেন না।

ডাক্তারকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "সারবে?" ডাক্তার নিরুত্তর।

ঠাকুর : "কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। রোগ দুঃসাধ্য হয়েছে?"

"তাই তো" বলে ডাক্তার পাল মাথা নিচু করে রইলেন।

ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন, "বলে কি গো? এরা এতদিন পরে বলে সারবে না।"

গিরিশের ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ নাড়ী পরীক্ষা করে আশঙ্কা করলেন, ক্ষয় নাড়ি। ঠাকুর ভক্তদের বললেন, একেই নাভিশ্বাস বলে।

তাঁর কথায় ভক্তদের বিশ্বাস হল না, তারা সুজির বাটি নিয়ে এল। অন্য মতে, সেবকরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাতের মণ্ড খেতে দেন।

পারিপার্শ্বিক বিবেচনা করে স্বামী প্রভানন্দের সিদ্ধান্ত, তখন প্রায় রাত ন'টা। এই সময় আবার সমাধি। নরেন্দ্রনাথ সবাইকে 'হরি ওঁ তৎ সৎ' নাম-কীর্তন করতে বললেন।

যখন সমাধি ভঙ্গ হল তখন রাত প্রায় এগারোটা। সেবকগণ তাঁকে উঠে বসিয়ে পথ্য খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

"উঠব? ভিরমি খাব যে," ঠাকুর বললেন।

শ্রীম : "মাথায় একটু জল ও বাতাস দিলে হয় না?"

শশীকে ঠাকুর বললেন, "নাড়ছিস কেন?" তখন তুলো ভিজিয়ে মুখে জল দেওয়া হচ্ছিল।

ঠাকুর এখন ক্ষুধার্ত। সুজির পায়েস পথ্য হিসেবে নিলেন। অন্য মতে ভাতের মণ্ড। সেবক শশীর ইংরিজিতে রাখা নোট অনুযায়ী, "খাবার হিসেবে পুরো এক গেলাস পায়সম পান করেন।" তার পর নাকি ঠাকুর বললেন, "আঃ শান্তি হল। এখন আর কোনও রোগ নাই।"

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল এই পর্বে নৈষ্ঠিক পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণের একটি ছবি এঁকেছেন, যাকে স্বামী প্রভানন্দ 'বিবৃতি নির্ভরযোগ্য নয়' বলেছেন।

বৈকুণ্ঠনাথের লেখাটি এইরকম : ঠাকুর পায়স গ্রহণোদ্যত, এমতকালে দেখেন দুই অব্রাহ্মণ সেবক শয্যা ধারণ করে আছেন।

"ওদের বিছানা ছেড়ে দিতে বল।"

"কেন করবে?" নরেন্দ্রর এই প্রশ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ওরে ভাত যে রে।"

"আপনি তো বিধি-নিষেধের পার, তথাপি এ আদেশ কেন?"

নরেন্দ্রকে ঠাকুর বললেন, "ওরে ব্রাহ্মণ-শরীর যে রে। তাই ব্রাহ্মণ-সংস্কার যাবার নয়।"

বৈকুণ্ঠনাথের ব্যাখ্যা, "ঠাকুর সকলের আলয়ে অন্নগ্রহণ করেন নাই। বলতেন, "লুচি-তরকারি খেতে পারা যায়, কিন্তু অন্ন নহে।"

কাশীপুরের সবদিক সাবধানে বিচার করে স্বামী প্রভানন্দের সঙ্গে একমত এই লেখক, এই বিবৃতি নির্ভরযোগ্য নয়।

ঠাকুরের শেষ পর্ব সম্পর্কে স্বামী অভেদানন্দের 'আমার জীবনকথা'

একটি নির্ভরযোগ্য রচনা। "সেইদিন রাত্রে ১টার সময় আমরা তাঁহার নিকট বসিয়াছিলাম। সাধারণত যেমন সমাধি হইত, সেইরূপ হইল। তাঁহার দৃষ্টি নাসাগ্রের উপর স্থির হইয়া রহিল। নরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে 'ওঁকার উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। আমরাও সমবেত স্বরে ওঁকার ধ্বনি করিতে লাগিলাম।...সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না।"

নরেন্দ্রনাথ সেই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে লোক পাঠালেন ঠাকুরের ভাইপো রামলালকে খবর দিতে। রামলাল তৎক্ষণাৎ এসে দেহ পরীক্ষা করে বললেন, "এখনও ব্রহ্মতালু গরম আছে, তোমরা একবার কাপ্তেন উপাধ্যায়কে খবর দাও। নেপালের কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়...তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের মেরুদণ্ডে গব্যঘৃত মালিশ করিলে চৈতন্যোদয় হইবে বলিল।"

শশিভূষণ, শরৎচন্দ্র ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল যথাক্রমে গ্রীবায়, বক্ষে এবং পদমূলে ঘৃত মালিশ করতে লাগলেন, কিন্তু তিন ঘণ্টারও বেশি মালিশ করে কোনও ফল হ'ল না।

এরপরে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের কাশীপুরে আবির্ভাব। কিন্তু ক'টার সময়? ঠাকুরকে এই মহেন্দ্রলাল 'তুমি' বললেও, সমধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। বৈকুণ্ঠনাথের রচনা অনুযায়ী : "পরদিন প্রত্যুষে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সর্বপ্রথম উদ্যানে উপস্থিত হন; এবং প্রভুর আনন্দপূর্ণ আনন, রোমাঞ্চিত তনু এবং অঙ্গ জ্যোতিতে গৃহপূর্ণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কহেন—এই দিব্যাবস্থার প্রতিকৃতি গ্রহণ আমি বাঞ্ছনীয় বোধ করি। অতএব কলিকাতায় যাইয়া আমি এখনই ইহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

মা-ঠাকরুণ "প্রাণের আবেগে 'মা কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে চলে গেলে গো' বলিয়া ভূপতিত হইয়া উচ্চরোলে ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।"

গ্রুপ ছবি সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠনাথের মন্তব্য : "পরিতাপের বিষয়, অত্যধিক বিলম্ববশতঃ প্রাতঃকালের সে জ্যোতির্ময় প্রাণটি তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল।"

স্বামী অভেদানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী, ডাক্তার সরকার "বেলা

দশঘটিকায় এসে নাড়ী দেখে বলেন, ঠাকুরের প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে।”

অনেক বিচারবিবেচনার পর স্বামী প্রভানন্দের সিদ্ধান্ত : ডাক্তার সরকার “কাশীপুরে পৌঁছান বেলা একটায়।”

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের দিনলিপি। “খাওয়াদাওয়ার পর প্রথমে ডাফ স্ট্রিটে যাই এক রোগিণীকে দেখতে, তারপর পরমহংসের কাছে। তিনি মৃত। গত রাত্রে একটার সময় তাঁর দেহাবসান হয়েছে, He was lying on the left side legs drawn up, eys open, mouth partly open.” এরপরে লেখা, মহেন্দ্রলাল ছবি তোলার পরামর্শ দিলেন এবং নিজের চাঁদা হিসেবে দশ টাকা রেখে গেলেন।

বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্সের ছবি তোলা সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের বর্ণনা : “রামবাবু নিজে খাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিলেন। আমরা পশ্চাতে সকলে নির্বাক হইয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইলাম। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানি দুইখানা গ্রূপ ফটো তুলিয়া লইলেন।”

কাশীপুর মহাশ্মশানের উদ্দেশে শবযাত্রা শুরু হয়েছিল বিকাল ছ'টার পর।

লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শেষ দর্শনের এক চমৎকার বিবরণ রেখে গিয়েছেন। “তাঁর পূতদেহ শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবার জন্য দিনের তাপমাত্রা কমার অপেক্ষায় বসেছিলাম, সে সময় একখণ্ড মেঘ থেকে বড় বড় দানার বৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ল। উপস্থিত সকলে বলতে থাকল এই হচ্ছে পুরাণকথিত স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া পুষ্পবৃষ্টি। আমর দেবতাগণ স্বর্গমর্ত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নশ্বরতা থেকে অমরতায় উত্তরণকালে অভিনন্দন জানাচ্ছে।”

স্বামীজির পূজনীয় আচার্য, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিমযাত্রার বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয়নি, তবু তাঁর শেষ জীবনের শেষ মুহূর্তগুলির বর্ননায় গুরু রামকৃষ্ণ ও পরবর্তী নেতা নরেন্দ্রনাথ দু'জনেই বেশ কিছুটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন।

চিকিৎসক ও উকিলদের প্রবল সমালোচনা করতেন বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যে এঁদের বেশ ভালোবাসতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে নানা লেখায়। একজন ডাক্তার তাঁকে জুতো উপহার দিয়েছিলেন এবং তা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। এর আগে তাঁর জুতো চুরি যায়। আর একজন চিকিৎসকের কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল তাঁর পাদুকা। উকিলদের কথা বলাই বাহুল্য, যাঁকে তিনি সবচেয়ে ভালোবাসতেন ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের সেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত তো সবসময় বলতেন সাতপুরুষ উকিলের বংশ। নরেন্দ্রনাথ নিজেও একসময় এটর্নি অফিসে কাজে বেরুতেন। শেষ মুহূর্তে কাশীপুরে যাতায়াতকালে ফাইনাল আইন পরীক্ষায় বসা হয়নি।

ঠাকুরের চিকিৎসক অনুসন্ধানে ৩৮ জনের নাম পেয়েছি—এঁরা ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য ও নাড়িজ্ঞানী। কেউ এম. ডি., কেউ অ্যালোপাথ হয়েও পরে হোমিওপ্যাথ, কেউ পারিবারিক পেশায় বৈদ্য। এই ৩৮ জনের মধ্যে অন্তত ২৭ জন যে কোনো না কোনো সময় শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাও লক্ষ্য করেছি, বাকি ১১ জন সম্পর্কে ব্যাপারটা এখনও অস্পষ্ট।

স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞদের নাম নিচে দেওয়া হল। কিছুক্ষেত্রে পুরো নাম সহজলভ্য নয়, সেকালের রীতি অনুযায়ী অমুক ডাক্তার, অমুক কবিরাজ বলেই তাঁরা সুপরিচিত থাকতেন :

- অতুলচন্দ্র ঘোষ
- আব্দুল ওয়াজিদ
- ঈশানচন্দ্র কবিরাজ
- উপেন্দ্রনাথ ঘোষ

- কালী ডাক্তার
- কৈলাশচন্দ্র বসু
- গঙ্গাপ্রসাদ সেন
- গোপাল কবিরাজ
- গোপীমোহন কবিরাজ
- জ্ঞানেন্দ্রমোহন কাঞ্জিলাল
- ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ত্রৈলোক্যনাথ বসু
- দাড়িওয়ালা ডাক্তার
- দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- দ্বারিকানাথ কবিরাজ
- দু'কড়ি ডাক্তার
- নবগোপাল কবিরাজ
- নবীন পাল
- নিতাই মল্লিক
- নিতাই হালদার
- প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
- ভগবান দাস
- ভগবান রুদ্র
- মধুসূদন ডাক্তার
- মহলানবীশ ডাক্তার
- মহেন্দ্রনাথ পাল
- মহেন্দ্রনাথ সরকার
- রাখালদাস ঘোষ
- রাজেন্দ্রলাল দত্ত
- রাম কবিরাজ
- রামনারায়ণ ডাক্তার
- বিপিনবিহারী ঘোষ

- বিশ্বনাথ কবিরাজ
- বিহারীলাল ভাদুড়ি
- বৈদ্য মহারাজ
- শশীভূষণ ঘোষ
- শশীভূষণ সান্যাল ও
- শ্রীনাথ ডাক্তার।

অকালমৃত্যু ও অকালবার্ধক্যের এই দেশে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কীভাবে শতবর্ষের সীমা পেরিয়ে কালজয়ী হল, তা একালের ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞদের কাছে এখনও কৌতূহলের বিষয়।

এদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সঙ্ঘগুলি পূজ্যপাদ মহামানবদের স্পর্শে ধন্য হয়েও কিছুদিনের মধ্যে কেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়, অথবা দলীয় দ্বন্দ্বের বিষে আত্মহননের জন্য ব্যাকুল ওঠে, তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এ দেশের প্রতিষ্ঠান-পরিচালকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। সেই সঙ্গে জানা দরকার, শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীসঙ্ঘ কোন শক্তির বলে এমনভাবে কালজয়ী হল এবং বৃহৎ অরণ্যবনস্পতির মতো সর্বশ্রেণির মানুষের সমর্থন ও বিস্ময় ধরে রাখতে সমর্থ হল? দার্শনিক, দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমী বিবেকানন্দকে নিয়ে গত একশো বছরে দেশেবিদেশে নেহাত কম আলোচনা হয়নি, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাবনা-চিন্তার প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি।

অর্থ সম্বন্ধে, বিশেষ করে অপরের অর্থ সম্বন্ধে, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও রেখেঢেকে কথা বলেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তিমপর্বে প্রিয়জন ও ভক্তজনের আর্থিক সাহায্যের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হয়েছেন, কিন্তু তিনি একবারও ভুলে যাননি অর্থ হল গৃহস্থের রক্ত এবং সেই অর্থের যথাযোগ্য সম্মান বিশেষ প্রয়োজন।

কোনও অবস্থাতেই অপচয় অথবা বাজে খরচ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হওয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সমর্থন বা প্রশ্রয় পায়নি। অপরের কাছ থেকে অর্থ সংগৃহীত হলেই তার যে হিসেব প্রয়োজন, এই চিন্তা তরুণকালে অনভিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মাথায় ঢোকেনি, তাই কাশীপুর-পর্বে ঠাকুরের অসুখের সময়

খরচপাতির হিসেবপত্তর রাখা সম্পর্কে দাতাদের কথা ওঠায় তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। অতি সাবধানে নিতান্ত প্রয়োজনে যৎসামান্য খরচ করা হচ্ছে এই তো যথেষ্ট, যারা যথাসর্বস্ব দিতে এসেছে তাদের কাছে হিসেবের কথা তোলাকে অভিমানী নরেন্দ্রনাথ প্রসন্ন মনে নিতে পারেননি। তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। শোনা যায় কাশীপুরে নিতান্ত কঠিন মন্তব্য করে তিনি খাতাপত্তর ছুড়ে ফেলেছিলেন।

কিন্তু এই মানুষটিই পরবর্তীকালে স্বদেশে ও বিদেশের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে বিস্তারিত হিসেবপত্তর রাখায় প্রবল বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। যাঁরা সামান্যতম অর্থ সাহায্যও করেছেন তাঁরা অ্যাকাউন্ট চাইবার আগেই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে হিসেব দাখিল করা যে সঙ্ঘস্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা তিনি মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন। আর্থিক স্বচ্ছতা ও আর্থিক পরিচ্ছন্নতাকে সঙ্ঘজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করার জন্য যে ব্যাকুলতা স্বামীজি দেখিয়েছিলেন, তা মঠ ও মিশনের পরবর্তীকালের পরিচালকরা পরিত্যাগ করেননি।

ইদানীং কেউ কেউ বলছেন, এই হিসাব-পরিচ্ছন্নতা রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে এক বিশেষ মহিমায় আলোকিত করেছে। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞরা এই আদর্শের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে বিশ্লেষণকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন থেকে অনেক নতুন তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান পাবেন।

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা নিজেরা অর্থ উপার্জন করেন না, কিন্তু অপরের আর্থিক সাহায্যে বহু বড় বড় কাজ করতে তাঁরা সমর্থ হয়েছেন বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে। কিন্তু পরের অর্থ মানেই তো হিসেবের কড়ি। এর জন্যে নিয়মকানুনের বন্ধন প্রয়োজন, নিজের যৎসামান্য ব্যক্তিগত অর্থ ও সঙ্ঘের কাজের জন্য সংগৃহীত অর্থের মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর দূরত্ব রাখাও প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার হিসেব সম্পর্কে স্বামীজির সেই মহামূল্যবান মন্তব্য, 'শাকের টাকা মাছে এবং মাছের টাকা শাকে খরচ করা চলবে না।' হিসেব বিশেষজ্ঞরা আজকাল প্রকাশ্যে স্বীকার করেন, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপলের শেষ কথাটি এমন সহজভাবে পৃথিবীর কোনও ম্যানেজমেন্ট গুরু আজও বলে যেতে পারেননি।

স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে এবং কথাবার্তায় ব্যক্তিগত-অর্থ ও সঙ্ঘ-অর্থের এই নৈতিক পার্থক্য ভীষণভাবে এসে গিয়েছে, এমনকী এর জন্য স্বামীজি নিজেও মৃত্যুর পরেও অসুবিধায় পড়েছেন।

একেবারে শেষ পর্যায় থেকে শুরু করা যেতে পারে। বেলুড়ে ৪ জুলাই ১৯০২-এ স্বামীজির অপ্রত্যাশিত দেহাবসানের পরও হিসেবের বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। দেহাবসানের ১৮ দিন পরে, ২২ জুলাই ১৯০২ মঠের ট্রাস্টিদের সভায় আলোচনার প্রথম বিষয় স্বামীজির 'প্রাইভেট ফান্ড', যা সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে গচ্ছিত রয়েছে। গভর্নমেন্ট পেপার ৩,৭০০ টাকা ও নগদ ১৭০০। স্বামীজির শেষ ইচ্ছা, টাকাটি তাঁর গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরী দাসীকে দেওয়া হয়। কিন্তু হিসেবের কড়ি! ট্রাস্টিরা সামান্য পরিমাণ অর্থ থেকেও বাদ দিলেন :

১) শান্তিরাম ঘোষের কাছে স্বামীজির ধার ৯ টাকা।
২) স্বামীজি তাঁর শিষ্যদের জন্য মশারি কিনতে দেন ২০ টাকা।
৩) স্বামী অদ্বৈতানন্দের চোখ অপারেশন করবার ফি দেওয়ার জন্য স্বামীজির নির্দেশ ৩০ টাকা। মোট ৫৯ টাকা।

মঠের অছিদের কাছে দ্বিতীয় প্রস্তাব, মার্কিন-নিবাসিনী মিসেস ওলি বুল স্বামীজিকে ৭০০ টাকার চেক দিয়েছিলেন জনৈক বিদেশিনী ভক্তের আমেরিকা ফিরবার জাহাজ-ভাড়ার জন্য। যদি এই ভাড়া অন্য কেউ দিয়ে দেন, তা হলে এই ৭০০ টাকাও স্বামীজির মা ভুবনেশ্বরী দাসীকে দেওয়া হবে।

শুরু থেকেই রামকৃষ্ণ মিশনের হিসেবপত্তর কত কড়া তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই ৭০০ টাকা দিয়ে পরে সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজির মা'কে তীর্থ করান এবং দত্ত বাড়ির পারিবারিক মামলাতেও কিছু খরচ করেন।

বহু বছর আগে শ্রীমতী সরলাবালা সরকার রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন, প্রত্যেক ব্যাপারের জন্য আলাদা-আলাদা ফান্ড। যে যে-কাজের জন্য টাকা দিয়েছে, তা অন্য খাতে খরচ করা চলবে না। এ-বিষয়ে

স্বামীজির বক্তব্য : "যদি তোমাকে অনাহারে মরতেও হয় তবু অন্য বাবদের টাকা থেকে একটা পয়সাও খরচ করবে না।" অর্থাৎ কাশীপুরের পরে বিরাট মানসিক পরিবর্তন।

দুর্বল হিসেব বোধহয় অনেকটা ব্লাড সুগারের মতো, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানকে নিঃশব্দে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। শ্রীমতী সরলাবালার সংযোজন, "মঠ আর মিশন দুই-ই আলাদা। তাই যদি কোনও ভক্ত প্রণামী দেন বা ঠাকুরসেবার জন্য টাকা দেন, সেটি মঠের অর্থভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে, আর জনহিতকর কার্যের জন্য জনসাধারণ যে-টাকা দান করিবে সেটি হইবে মিশনের টাকা। সেই টাকার পাই-পয়সার হিসাব পর্যন্ত হিসাব-পরীক্ষক দিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে।"

মৃত্যুর পরেও বিষয়সম্পত্তি নিয়ে যাতে কোনও আইনি গোলমাল আরম্ভ না হয়, তার জন্য সুদূর মার্কিনদেশে পরিব্রাজক বিবেকানন্দের চিন্তার শেষ ছিল না। দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে যখনই তিনি বিব্রত হয়েছেন, তখনই তিনি চটপট নিজের হাতে একটি উইল লিখে ফেলেছেন, ব্যাঙের আধুলির কতটুকু কোথায় যাবে, কে তার দায়িত্ব নেবে তা স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন। স্বামীজির এইসব উইল সম্বন্ধে নানা পরিস্থিতিতে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু মানসপত্রগুলির নির্দেশগুলি খুঁটিয়ে দেখে আরও বিস্তারিত আলোচনা হলে দূরদর্শী সন্ন্যাসীটিকে আরও ভালভাবে জানা যেত। সাতপুরুষের উকিলবাড়ির ছেলে সন্ন্যাস নিলেও প্রয়োজন মতো যে কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করতেন না।

শুধু নিজের উপার্জিত সামান্য অর্থের জন্য নয়, অন্যের নামেও যেসব সম্পত্তি কেনা হয়েছে, সে বিষয়ে সব রকম নিরাপত্তা নেওয়ার ব্যাপারে স্বামীজি যে বেজায় একগুঁয়ে ছিলেন, তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিদেশিনী মিস হেনরিয়েটা মুলারের অর্থে বেলুড়ের যে-জমি কেনা হয়, তার বায়না করা হয় ১৮৯৮ সালে (১০০১ টাকা)। বাকি ৩৮,৯৯৯ টাকা দিয়ে দলিল রেজিস্ট্রি করা হয় ৫ মার্চ ১৮৯৮। এর মধ্যে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত উইল করেন ১৯ জানুয়ারি ১৮৯৮, কারণ বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে সামান্য যা অর্থ এনেছিলেন, তা তিনি

ব্রহ্মানন্দকেই দিয়েছিলেন। যদি স্বামী ব্রহ্মানন্দ লোকান্তরিত হন, তা হলে কী হবে, এই আশঙ্কায় এই ইচ্ছাপত্র।

"লিখিতং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দক্ষিণেশ্বরনিবাসী পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, সন্ন্যাসী, সাকিন আলমবাজার মঠ, আলমবাজার, জেলা চব্বিশ পরগণা কস্য চরমপত্রমিদং— আমি এতদ্দ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আমার ত্যক্ত আমার স্বনামী বা বেনামী নগদ অর্থ, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি এবং স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি আমার অভাবে উক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য আলমবাজার মঠনিবাসী স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ সন্ন্যাসীদ্বয় পাইবেন এবং তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে ও অধীনে থাকিবে। আমি তাঁহাদিগকে এই উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলাম। এতদ্দ্বারা স্বেচ্ছায় এই শেষ উইল বা চরমপত্র সম্পাদন করিলাম।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দর এই উইলের সাক্ষী ছিলেন বিখ্যাত সলিসিটর প্রমথনাথ কর ও ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষ।

হিসেবপত্তর সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দর দু'খানি মারাত্মক চিঠি বাংলায় লেখা হয়েছিল পরের বছর লন্ডন থেকে। বন্ধু ব্রহ্মানন্দকে লেখা প্রথম চিঠির তারিখ ১০ আগস্ট ১৮৯৯। নতুন কাগজ 'উদ্বোধন' সম্পর্কে প্রবল বিরক্তি দিয়ে এই চিঠির শুরু।

"মনে জেনো যে, আমি গেছি। এই বুঝে স্বাধীনভাবে তোমরা কাজ কর। 'টাকাকড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত দাদার ভরসা' হইলেই সর্বনাশ আর কি! কাগজটার পর্যন্ত টাকা আমি আনব, আবার লেখাও আমার সব— তোমরা কি করবে? সাহেবরা কি করছেন?

"আমার হয়ে গেছে! তোমরা যা করবার কর। একটা পয়সা আনবার কেউ নেই, একটা প্রচার করবার কেউ নেই, একটা বিষয় রক্ষা করবার বুদ্ধি কারু নেই। এক লাইন লিখবার... ক্ষমতা কারুর নাই— সব খামকা মহাপুরুষ!

"...তোমাদের যখন এই দশা, তখন ছেলেদের হাতে ছ-মাস ফেলে দাও সমস্ত জিনিস— কাগজ-পত্র, টাকা-কড়ি, প্রচার ইত্যাদি। তারাও কিছু না পারে তো সব বেচে-কিনে যাদের টাকা তাদের দিয়ে ফকির হও।

"মঠের খবর তো কিছু পাই না। শরৎ কি করছে? আমি কাজ চাই। মরবার আগে দেখতে চাই যে, আজীবন কষ্ট করে যা খাড়া করেছি, তা এক-রকম চলছে। তুমি টাকাকড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করবে। কমিটির সই করে নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি!

"লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চায়— এই দস্তুর। প্রতি পদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়।...ওই-রকম প্রথমে কুঁড়েমি করতে করতেই লোকে জোচ্চোর হয়। মঠে যারা আছে, তাদের নিয়ে একটি কমিটি করবে, আর প্রতি খরচ তারা সই না দিলে হবে না— একদম! ...আমি কাজ চাই, vigour (উদ্যম) চাই— যে মরে যে বাঁচে ; সন্ন্যাসীর আবার মরা-বাঁচা কি?"

তিন মাস পরে (২১ নভেম্বর ১৮৯৯) নিউ ইয়র্ক থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা আর এক চিঠি থেকে স্পষ্ট যে, হিসেবপত্তর সম্বন্ধে স্বামীজির মনোভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তিনি আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টসের নিয়মকানুনে বাঁধতে উদগ্রীব।

স্বামীজি লিখছেন, "হিসাব ঠিক আছে। আমি সে-সব মিসেস বুলের হাতে সঁপে দিয়েছি এবং তিনি বিভিন্ন দাতাকে হিসাবের বিভিন্ন অংশ জানাবার ভার নিয়েছেন।

"আগেকার কঠোর চিঠিগুলিতে আমি যা লিখেছি, তাতে কিছু মনে ক'রো না। প্রথমত ওতে তোমার উপকার হবে— এর ফলে তুমি ভবিষ্যতে যথানিয়মে কেতাদুরস্ত হিসাব রাখতে শিখবে এবং গুরুভাইদেরও এটা শিখিয়ে নেবে।

"দ্বিতীয়ত এই-সব ভর্ৎসনাতেও যদি তোমরা সাহসী না হও, তা হলে তোমাদের সব আশা ছেড়ে দিতে হবে। আমি চাই তোমরা (কাজ করতে করতে) মরেও যাও, তবু তোমাদের লড়তে হবে। সৈন্যের মতো আজ্ঞাপালন করে মরে যাও এবং নির্বাণ লাভ কর, কিন্তু কোনও প্রকার ভীরুতা চলবে না।"

হিসেব সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হওয়ার পিছনে স্বামী বিবেকানন্দের যে বেশ কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল, তা পরবর্তীকালে এডওয়ার্ড স্টার্ডিকে লেখা চিঠি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বামীজির বিদেশি অনুরাগীদের কেউ কেউ অজ্ঞাত কারণে তাঁর সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। যে মিস হেনরিয়েটা মুলার বেলুড়ের জমি কেনার জন্য প্রধান অর্থ জুগিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দর প্রকাশ্য বিচ্ছেদের কথা রামকৃষ্ণ অনুরাগীদের অজানা নয়। আর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা, স্টার্ডির অহেতুক সমালোচনার বিরুদ্ধে স্বামীজির পত্রবিস্ফোরণ। এই ধরনের ধৈর্যহীন বিস্ফোরণ স্বামীজির জীবনে কমই ঘটেছে, কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট, আর্থিক ব্যাপারে কোনওরকম অশোভন ইঙ্গিত তাঁকে গভীর বেদনা দিত।

স্টার্ডির সঙ্গে পত্রাবলী থেকে স্পষ্ট, ইংল্যান্ডের মাটিতে অসহায় মানুষটিকে কী কষ্ট পেতে হয়েছিল, অথচ বিদেশের অনুরাগীদের ভুল ধারণা, তাঁরা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে যথেষ্ট সুখে রেখে দিয়েছেন। হিসেবপত্র প্রসঙ্গে নিউ ইয়র্ক থেকে মিস্টার স্টার্ডিকে লেখা তারিখহীন চিঠিতে আসবার আগে নভেম্বর ১৮৯৯-তে স্বামীজির লেখা পরবর্তী চিঠির আলোচনা প্রয়োজন। আর্থিক সাহায্য যৎসামান্য হলেও সায়েবরা তার পরিবর্তে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন, তা এই পত্র থেকে স্পষ্ট।

অপমানিত হয়ে বিবেকানন্দ সোজাসুজি প্রতিবাদ জানিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন। "বিলাসিতা, বিলাসিতা, গত কয় মাস থেকে কথাটি বড্ড বেশি শুনতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্যবাদীরা নাকি তার উপকরণ জুগিয়েছে, আর সর্বক্ষণ ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে ভণ্ড আমি নাকি নিজে সেই বিলাসিতা ভোগ করে আসছি। ...তোমাদের সমালোচনায় আমার আর কোনও আস্থা নেই। এসব বিলাসব্যসনের কথায় আর কান দিই না..."

এর পরে কিছু অপ্রিয় সত্যের তিক্ত তালিকা। "ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ারের কথা বাদ দিলে ইংল্যান্ড থেকে আমি রুমালের মতো এক টুকরো বস্ত্র পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। অথচ ইংল্যান্ডে শরীর ও মনের উপর অবিরত পরিশ্রমের চাপের ফলেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়।

তোমরা, ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ, আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ আমাকে অমানুষিক খাটিয়ে। এখন আবার বিলাস-ব্যসন নিয়ে নিন্দা করা হচ্ছে!"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে বিরক্ত স্বামীজির লেখা আগের দুটি চিঠির কারণ বুঝতে হলে স্টার্ডির অন্তর্বর্তী পত্রগুলি পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন। রিজলি ম্যানর, নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা চিঠিতে ঘুরেফিরে সেই হিসেবপত্রের কথা। স্বামীজি লিখছেন, "হিসেবপত্র পূর্বে পেশ করা হয়নি, কারণ কাজ এখনও সমাপ্ত হয়নি ; সমস্ত ব্যাপারটা চুকে গেলে দাতার কাছে সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করব ভেবেছিলাম। টাকার জন্য দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার ফলে কাজ মাত্র গত বছর শুরু হতে পেরেছে এবং আমার নীতি হল, টাকার জন্যে হাত না পেতে স্বেচ্ছায় দানের জন্য অপেক্ষা করা।"

শেষের লাইনটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাঁরা এই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলায় কোনও দিনই বিপুল পরিমাণ অর্থসাহায্য লাভ করেননি। কিন্তু কারণে-অকারণে সাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে হাতপাতা তাঁদের কালচারের বিরোধী। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতার মনোভাবকে সন্ন্যাসীরা শত অভাবের মধ্যেও বিসর্জন দেননি। কিছুদিন আগে ভাটিকানে পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রামকৃষ্ণ মিশনের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীর তরুণতম, ক্ষুদ্রতম এবং নিঃসন্দেহে দরিদ্রতম সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে এসেছি।"

সাধারণ ও অসাধারণ মানুষদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যথেষ্ট পরিমাণে মিললেও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যে শতবর্ষের প্রবাহেও অর্থ বিষয়ে তেমন সম্পন্ন হতে পারেনি, এ বিষয়ে দ্বিমত হওয়ার সুযোগ নেই। যদিও বাইরে থেকে অনেকের ধারণা, অপর্যাপ্ত অর্থ সন্ন্যাসীদের আয়ত্তে রয়েছে এবং সঙ্ঘসভ্যরা কোনওরকম অর্থচিন্তা ছাড়াই নিজেদের অভীষ্ট কাজ করে যেতে সমর্থ হচ্ছেন। এ-বিষয়ে যথাসময়ে আরও একটু আলোচনার প্রয়োজন হবে। অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনও মতামত সৃষ্টি হলে সেখানে অবশ্যই ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। যে জন্য স্বয়ং বিবেকানন্দও এক সময় দুঃখ করেছেন (২৮ জুন ১৮৯৪) "প্রভু মাদ্রাজীদের আশীর্বাদ করুন,

তারা বাঙালিদের চেয়ে অনেক উন্নত, বাঙালিরা কেবল বোকা নয়—তাদের হৃদয় নেই, প্রাণশক্তি নেই।"

আরও আট মাস পরে (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫) আপনজনদের ব্যবহারে ও বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত বিবেকানন্দের আর একটা ছবি পাওয়া যাচ্ছে। নিউ ইয়র্ক থেকে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে স্বামীজি লিখছেন, "আমি বাংলাদেশ জানি, ইন্ডিয়া জানি— লম্বা কথা কইবার একজন, কাজের বেলায় শূন্য... আমি এখানে জমিদারিও কিনি নাই বা ব্যাঙ্কে লাখ টাকাও জমা নাই। এই ঘোর শীতে রাত্তির দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার করে দু' চার হাজার করেছি।"

একই বছরে বেদনার্ত বিবেকানন্দর আরও দুটি মন্তব্য নজর কেড়ে নেয়। "আমাকে সাহায্য করেছে এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাইনি। বাঙালিরা— তাদের দেশে যত মানুষ জন্মেছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্যে কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে ; আর যার জন্যে তারা কিছুই করেনি, বরং যে তাদের জন্যে যথাসাধ্য করেছে, তারই ওপর হুকুম চালাতে চায়। জগৎ এরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!"

ইংল্যান্ডের রিডিং থেকে গুরুভাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মনের দুঃখে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "লোক না পোক।...বাঙালিরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে পরিপোষণ করছে— অহ হ!!!...যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটি সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাংলাদেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ? ওরা ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে।"

এর পর নিজের জাত সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত উক্তি যা একমাত্র স্বামীজির পক্ষেই সম্ভব : "রাম! রাম! খাবার গৌড়িগুগলি, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের মলমূত্রে-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেঝে, বিহার পেত্নী-শাঁকচুন্নির সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যতো জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপন কাজ করে যা।"

কিন্তু কেবল মনের দুঃখে জাতিনিন্দা নয়, প্রয়োজনে বাঙালির প্রশংসাতেও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ পঞ্চমুখ হয়েছেন। প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে দেশবাসীর অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, "লোকে বলিয়া থাকে, বাঙালি জাতির কল্পনাশক্তি অতি প্রখর, আমি উহা বিশ্বাস করি। আমাদিগকে লোকে কল্পনাপ্রিয় ভাবুক জাতি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে। কিন্তু বন্ধুগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, উহা উপহাসের বিষয় নহে। কারণ প্রবল উচ্ছ্বাসেই হৃদয়ে তত্ত্বালোকের স্ফুরণ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি— বিচারশক্তি খুব ভাল জিনিস, এগুলি বেশি দূর যাইতে পারে না। ভাবের মধ্য দিয়াই গভীরতম রহস্যসমূহ উদ্ঘাটিত হয়।"

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন স্থাপন করলেও, স্বামী বিবেকানন্দ এই সঙ্ঘের সম্পূর্ণ শৈশবও দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যথাসময়ে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ যে বিরাট মহীরুহের মতো বিস্তৃত হল, তার পিছনে রয়েছে প্রতিষ্ঠাতার অবিশ্বাস্য দূরদৃষ্টি। সব অবস্থায় সভ্যদের কেমন আচরণ হবে, তা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছেন, সঙ্ঘের কী কী বিপদ আসতে পারে, তাও তিনি আন্দাজ করে গিয়েছেন। ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হবে।

একসময় স্বামীজি বলেছিলেন, "To organize or not to organize? If I organize, the spirit will diminish. If I do not organize, the message will not spread."

এপ্রিল ১৮৯৭ সালে আলমবাজার মঠে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদান করলে বড় ভাল হয়।"

নিয়মগুলি ডিকটেশন দেওয়ার আগে দূরদর্শী স্বামীজি যে মন্তব্য করেছিলেন, ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্রের সেইটাই বোধহয় শেষ কথা। "দেখ এই সব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কী? আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সব নিয়মের বাইরে যাওয়া।"

সামাজিক ও সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের সম্বন্ধেও এটাই বোধহয় শেষ কথা। নিয়মের মধ্যে থেকেও কীভাবে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী সব নিয়মের

বাইরে গিয়ে প্রতিষ্ঠানকে প্রাণবন্ত রাখা যায়। অর্থাৎ, অতিমাত্রায় নিয়মবন্ধন যেন স্বাধীনতাকে খর্ব না করে, আবার মাত্রাহীন স্বাধীনতা যেন শৃঙ্খলার সর্বনাশ না করে।

বিখ্যাত বই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত চিন্তা আছে। অভিজ্ঞ স্বামীজি বলছেন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে, "কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ না, চৈতন্যদেবের এখন দু'তিনশো সম্প্রদায় হয়েছে ; যীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে ; কিন্তু ওইসকল সম্প্রদায় চৈতন্যদেব ও যীশুকেই মানছে।"

এই দুর্ভাবনার উত্তরও দিয়েছেন স্বামীজি। "আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ...এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছ'টা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।"

বেলুড়ের মঠভূমিতে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করে হোমের পরে স্বামীজি উপস্থিত সকলকে আহ্বান করে বলেছিলেন, "আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন, যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে এক সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।"

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অর্থের অভাবের কথা বুঝতে গেলে আরও একটু পিছিয়ে যাওয়া মন্দ নয়। আদিপর্বে বরাহনগরে রামকৃষ্ণতনয়দের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, খাওয়া জুটতো না। বাইরে বেরোবার কাপড় নেই, না আছে জুতো। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপন।

এই অভাবের ছবি স্বামীজির মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথা থেকে বিস্তারিভাবে পাঠ করে নেওয়া মন্দ নয়। "পরবার জন্য প্রত্যেকের কৌপীন ও একখণ্ড গেরুয়া বহির্বাস ছিল। অনেকে শুধু কৌপীন পরে থাকতেন। বাইরে কোথাও কাজকার্য যাওয়ার প্রয়োজন হলে সকলের ব্যবহারযোগ্য একটি বা দু'টি সাদা ধুতি ও সাদা চাদর দেওয়ালের গায়ে টাঙানো থাকত। গেরুয়া বহির্বাস পরেই তাঁরা ভিক্ষায় বেরতেন। প্রথম দিকে কয়েক জোড়া চটিজুতা ছিল। ক্রমে সেগুলি ছিঁড়ে গেলে মঠবাসীগণ খালিপায়ে চলাফেরা করতেন। তাঁরা মাসে একবার দাড়িগোঁফ মুণ্ডন করতেন।

"বড় ঘরটির মেঝেতে বালন্দা পটপটির দু'-তিনটি মাদুর পাতা থাকত। একপাশে থাকত একটি শতরঞ্চি। মাথার বালিশ ছিল চাটাইয়ের নীচে পাতা ইঁট। মশার উৎপাত খুবই ছিল। একটা খুব বড় মশারি টাঙানো হত।"

সেই সময় মঠবাসীরা প্রায়ই একবেলা খেতেন। থালার বদলে ব্যবহার হত কলাপাতা বা মানকচুর পাতা। "যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতেন তাপসেরা। মঠপ্রাঙ্গণ ও ঘরদোর, সিঁড়ি ঝাঁট দেওয়া, পুকুর থেকে জল তুলে পায়খানা সাফ করা ও শৌচের জন্য জল তোলা, বাসনপত্র মাজা, এ সকল কাজ তাঁদের করতে হত।"

স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, "তারকদা, আমি, লাটু, গোপালদাদা প্রভৃতি সকলে ভিক্ষায় বাহির হইয়া সামান্যভাবে যে চাউল পাইতাম তাহাই পালা করিয়া রান্না করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করিতাম। কোনও-কোনওদিন শাকসবজি কোনওরূপ না পাইয়া তেলাকুচোর পাতা আনিয়া সিদ্ধ করিতাম ও তাহা দিয়া ভাত খাইতাম। অবশ্য আহার আমাদের একবেলাই জুটিত।"

মঠের মধ্যে মঠবাসী সাধকদের কৌপীনই ভরসা। একদিন কয়েকজন মহিলাকে বরাহনগর মঠের দিকে আসতে দেখে একজন বলে উঠলেন 'দি মাগীজ় আর কামিং'। অপর একজন প্রতিবাদ করেন। 'মাগীজ়' সংশোধিত হয়ে প্রথমে হল 'মগীজ়', শেষে দাঁড়াল 'বার্মিজ়'। অতঃপর অর্ধউলঙ্গ মঠবাসীগণকে সাবধান করে দেওয়া হত 'দি বার্মিজ় আর কামিং' বলে। স্বামীজি এই পর্ব সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন, "খরচপত্রের অনটনের জন্য কখনও-কখনও মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি করতাম। শশীকে কিন্তু কিছুতেই এ বিষয়ে রাজি করাতে পারতাম না।" শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) অর্থাভাব মেটানোর জন্য স্থানীয় ইস্কুলে সাময়িকভাবে মাস্টারি করতেন।

মঠের দুঃখদিনের দুই সহায়ক সুরেশ মিত্র ও বলরাম বসুর মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে। এঁরা নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। বলরামবাবুর সাহায্য একসময় দাঁড়ায় মাসিক ৮০ টাকায়। এঁদের দেহাবসানের পর নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বারাণসীর প্রমদাদাস মিত্রের কাছে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রমদাদাস মিত্রের পরামর্শ, এখানে-ওখানে দু'-চারজন করে ছড়িয়ে পড়।

নরেন্দ্রজননী ভুবনেশ্বরীর এই ছবি প্রকাশিত হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত স্বরাজ পত্রিকায় দেহান্তের পরে বৈশাখ ১৩১৪ সনে। ১০ বছর বয়সে ভুবনেশ্বরীর বিবাহ, ছ'টি কন্যা ও চার পুত্রের জননী। অনিশ্চিত আর্থিক অবস্থা, কখনও স্বামীর ভিটেবাড়ি থেকে বিতাড়ন, পারিবারিক মামলা-মোকদ্দমা, অল্পবয়সে বৈধব্য, বড় ছেলের সংসার ত্যাগ, প্রিয় কন্যাদের আত্মহনন, এসব নিঃশব্দে সহ্য করে বিধবা মায়ের আশ্রয়ে দীর্ঘদিন বসবাস। এসবই তার অনিবার্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে একদা অসামান্যা সুন্দরীর শরীরে। তাঁর দেহাবসান কলকাতায়, ২৫ জুলাই ১৯১১।

ড় ঘরের বড় মেয়ে বিবেকানন্দের দিদিমা রঘুমণি বসু তাঁর একমাত্র সন্তান অভাগিনী ভুবনেশ্বরীকে সমস্ত জীবন ধরে সস্নেহে আশ্রয় ও সমর্থন দিয়ে গিয়েছেন। আদরের কন্যার মৃত্যুর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর দহাবসান হয়। বয়স তখন নব্বুই। রঘুমণির আর কোনো ছবি আমাদের নজরে আসেনি।
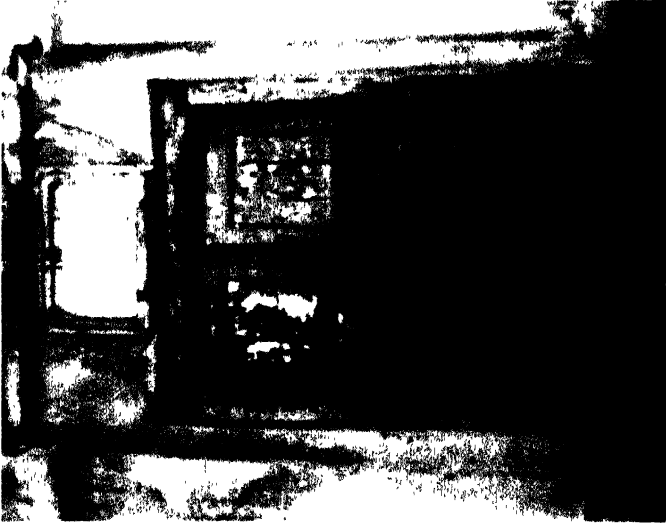
দীর্ঘদিনের শরিকি অবহেলায় জরাজীর্ণ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের সুবিশাল ভিটেবাড়ি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। মঠ-মিশন ও জনসাধারণের ঐকান্তিক চেষ্টায় অবশেষে বাড়িটি অধিগৃহীত হয় আমূল সংস্কারের জন্য। অধিগ্রহণের পর মূল প্রবেশ দ্বারটির অবস্থা যে নিতান্তই কাহিল তা ছবিতে স্পষ্ট।
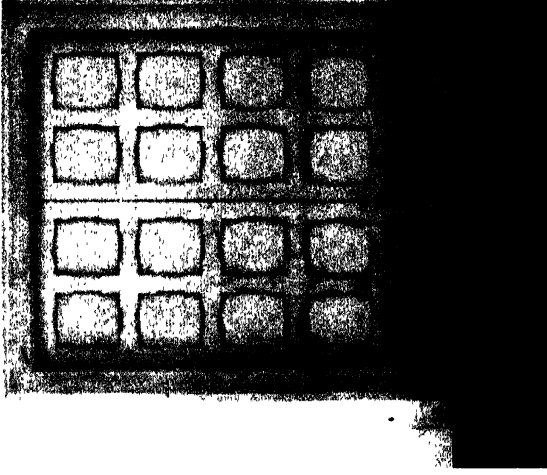
সবার শুভেচ্ছায় এবং সন্ন্যাসীদের একাগ্রতায় সমস্ত আইনি বাধা পেরিয়ে বিবেকানন্দের জন্মভিটে অবশেষে ফিরে পেয়েছে তার হারানো রূপ। ছবিতে আমূল সংস্কারের পর ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বহির্দ্বারের নবকলেবর।
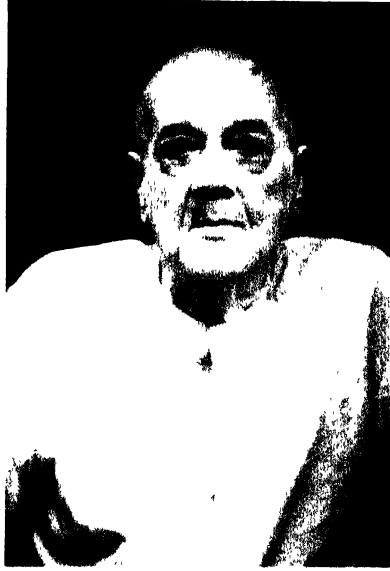
ামীজির জীবন ও কীর্তির অনন্য লেখক, বিশ্বনাথের নবম সন্তান ও তৃতীয় পুত্র মহেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম ১
াগস্ট ১৮৬৯। ১৮৯৬ সালে খেতড়ির অর্থসাহায্যে লণ্ডনে গিয়ে আচমকা স্বামীজির সঙ্গে দেখা করেন।
ামীজি তাঁর ভাইকে একটি সোনার কলম দিয়েছিলেন এবং পরামর্শ দি   লেন নখে যেন ময়লা না থাকে।
ার দেহাবসান ১৯৫৬, ৮৮ বছর বয়সে।

াটভাই ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০। ইনিই স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, পিতৃদেব
শ্বনাথ 'সুলোচনা' উপন্যাসের লেখক, কিন্তু নিজের অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলে খুড়তুতো কাকা
াপালচন্দ্র দত্তের নামে বইটি প্রকাশিত হয়। স্বামীজির দেহাবসানের পরে রাজদ্রোহের জন্য কারাবরণ এবং
গারো মাস জেলে থাকার পর গোপনে আমেরিকা গমন। উপরের ছবিটি গ্রীসের এথেন্সে তোলা ১৯১৫
ালে। আগের বছর তিনি মার্কিন দেশ ছেড়ে আসেন।

বিশ্বপথিক স্বামীজির পায়ের জুতো। দেখলেই বোঝা যায় দুর্গম পথে, অরণ্যে, পর্বতে পরিব্রাজকের পদযুগল অনেক ধকল সহ্য করেছে।

তেইশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে জীবনের বাকি ষোলো বছর যিনি সমস্ত ভারত পদব্রজে চষে বেড়িয়েছেন এবং দু'বার বিশ্বপরিক্রমায় বেরিয়েছেন জুতো যে তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি। বেলুড়ে রক্ষিত স্বামীজির ব্ল্যাক ও ব্রাউন জুতোগুলো দেখলেই বোঝা যায় এদের ওপর খুবই ধকল গিয়েছে!

প্রথমবার আমেরিকাযাত্রার সময়ে বেয়াড়া বেখাপ্পা জুতো পরে হাঁটতে গিয়ে পায়ের অবস্থা এতই খারাপ হয়েছিল যে স্বামীজিকে শিকাগোর এক লেডি 'টো ডাক্তার'-এর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পরে প্রায়ই বলতেন, ওই লেডি ডাক্তারের কথা স্মরণে এলেই তাঁর পদাঙ্গুলির ব্যথা সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে যায়!

এই সেই বিখ্যাত সবুজ কোট যা পরে ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ শ্রীরামকৃষ্ণ হাজির হয়েছিলেন বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স-এর রাধা বাজার স্টুডিওতে ছবি তোলাবার জন্যে।

দেহান্তের বহুবছর পরে সযত্নরক্ষিত এই কোট সন্ন্যাসী ভক্তদের সাহায্য করেছিল ঠাকুরের যথা[illegible] উচ্চতা নির্ধারণ করতে। ৫ ফুট ৯[illegible] ইঞ্চি উচ্চতা নিয়ে তিনি অবশ্যই সাধারণ বাঙালিদের থেকে বেঁ[illegible] ছিলেন না, বরং স্বামীজি তাঁর গুরুর চেয়ে সামান্য ছোটই ছিলেন।

আদি কাশীপুর উদ্যানবাটির অপ্রচলিত ছবি। এইখানেই ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধি। জীর্ণ বাড়িটি বক্ষা করা সম্ভব হয়নি, তার বদলে পুরনো বাড়ির অনুকরণে তৈরি হয়েছে নতুন কাশীপুর যেখানে ইংবিজি নববর্ষের প্রথম দিনে কল্পতরু উৎসবে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়। মাসিক আশি টাকা ভাড়ায় গৃহীভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থসাহায্যে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ অসুস্থ শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বাড়িতে আনা হয়।

এই সেই মর্মর মূর্তি যা তৈরির সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বীকৃতি পেয়েছিল। বর্তমানে এটি কাশীর অদ্বৈত আশ্রমে।

নরেন্দ্রনাথ—কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ঠাকুরের মহাসমাধির দিনে, ১৬ আগস্ট ১৮৮৬। গ্রুপ ফটো থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে এই ছবিটি।

স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৮৬৪-১৯৩৭), বিবেকানন্দের প্রিয় 'গ্যাঞ্জেস'। মঠ-মিশনের ত্রাণকার্য ইনিই শুরু করেন, পরে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সভাপতি।

স্বামীজির পরম অনুরাগী হরিভাই (স্বামী তুরীয়ানন্দ)। জন্ম ১৮৬৩, বরাহনগরে সন্ন্যাসগ্রহণ (১৮৮৭), স্বামীজিব সঙ্গে একই জাহাজে পশ্চিম যাত্রা (১৮৯৯)। স্বামীজির দেহাবসানেব পরেই বেলুড়ে ফিরে আসেন। কাশী সেবাশ্রমে দেহাবসান ১৯২২।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

প্রিয় গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে ইংলন্ডে আনিয়ে নিয়েছিলেন স্বামীজি ১৮৯৬ সালে। এই পর্বের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিকথায়। পাঁচখণ্ডের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

খেতড়িনরেশ মহারাজা অজিত সিংহ (১৮৬১-১৯০১)। এঁর গুরুপ্রেম ও বদান্যতার কাহিনি কিংবদন্তীর মতো বিবেকানন্দ-প্রেমীদের মধ্যে আজও ছড়িয়ে আছে। একমাত্র এঁর কাছেই স্বামীজি সময়ে-অসময়ে হাত পাততে পারতেন।

খেতড়ির মহারাজা অজিত সিংহের দেওয়ান মুন্সী জগমোহনলাল। রাজার নির্দেশে ইনিই স্বামীজিকে বোম্বাই বন্দরে জাহাজে তুলে দিয়ে আসেন। স্বামীজির অনুপস্থিতিতে ইনিই গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্ত পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন।
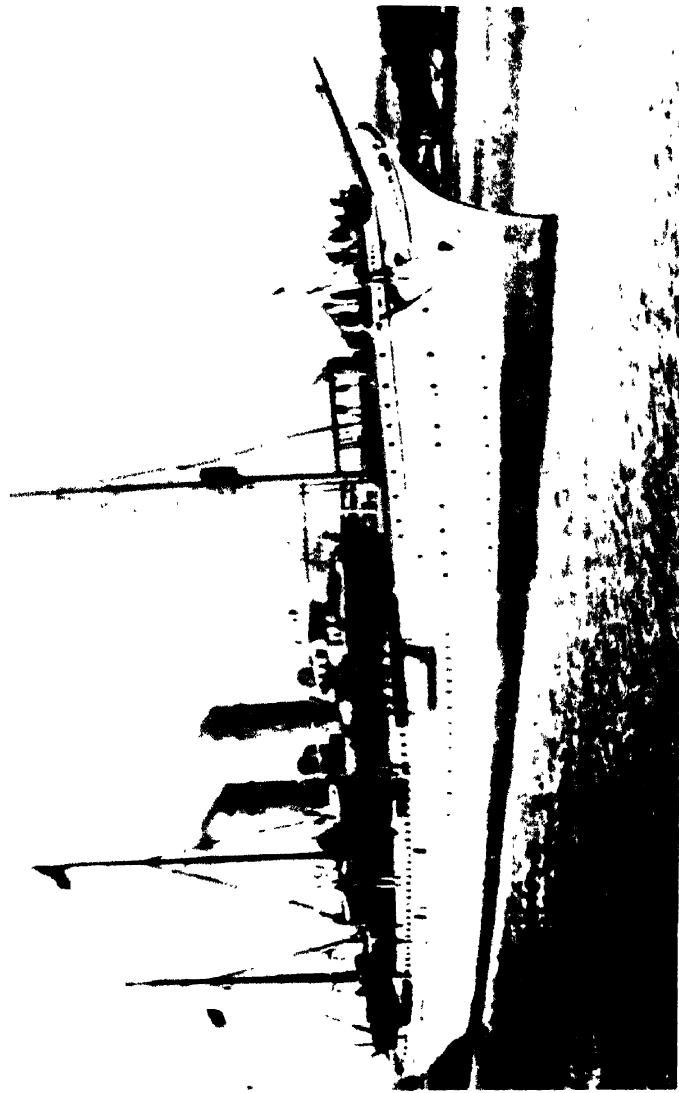
ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক লাইনের বিখ্যাত জাহাজ এমপ্রেস অফ ইন্ডিয়া। স্বামীজিকে নিয়ে ৩১ মে ১৮৯৩ বোম্বাই বন্দর থেকে চিন ও জাপান হয়ে ভ্যাংকুভার (কানাডা) পৌঁছয় মঙ্গলবার ২৫ জুলাই, ১৮৯৩।
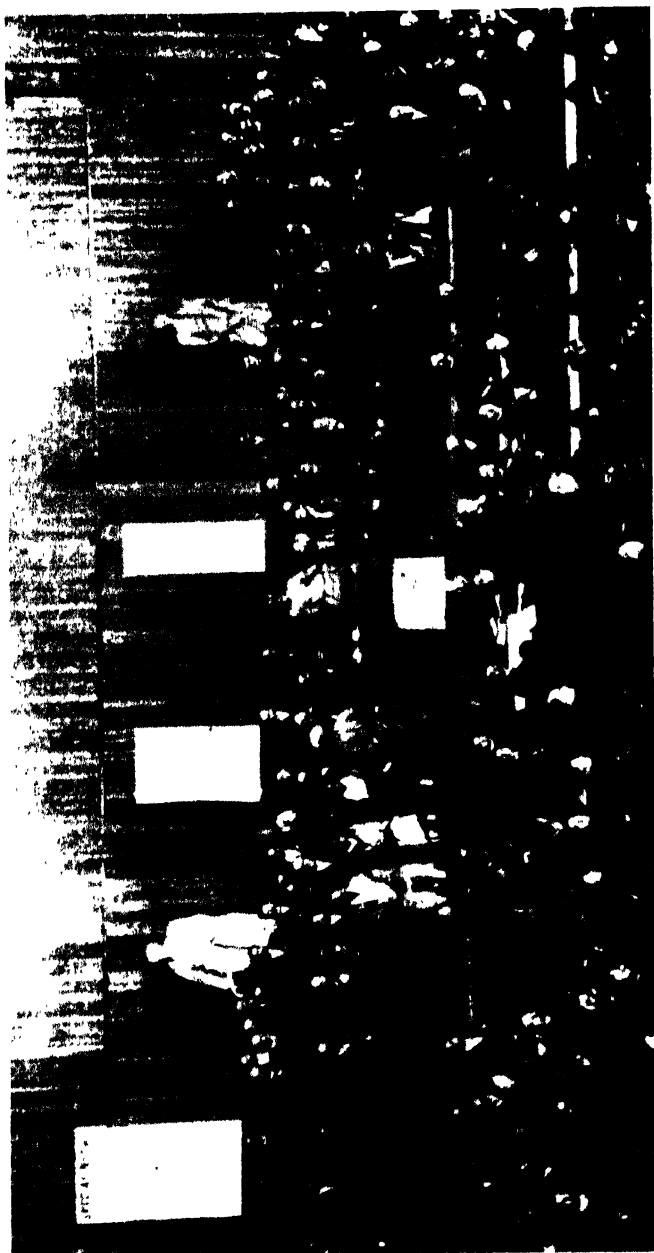
পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নস-এর শেষ অধিবেশন বসেছিল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ সন্ধ্যায়। সেই ছবিতে স্বামীজিকে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু তিনি আছেন ডেলিগেটদের দ্বিতীয় সারিতে।

শিকাগো, পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নস-এ শাশ্বত ভারতের অবিশ্বাস্য তারুণ্যে-ভরা ডেলিগেট স্বামী বিবেকানন্দ।
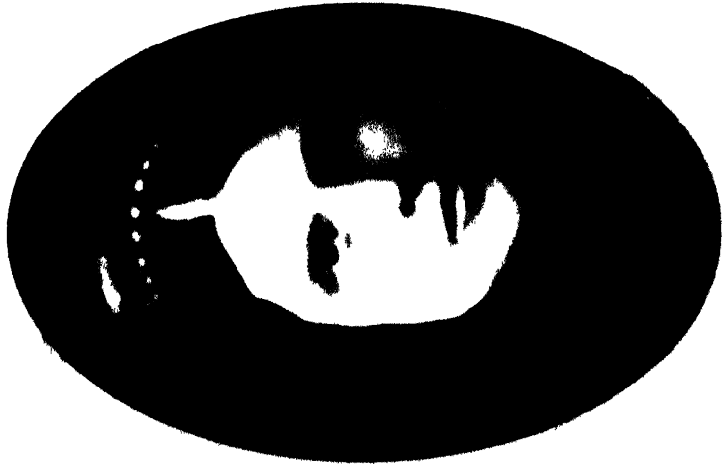
সারা বুল —সুখে-দুঃখে স্বামীজি এঁর ওপরেই ছিলেন নিত্যনির্ভরশীল। জননীর আসনে স্থান দিয়ে অনন্যা এই মহিলাকে তিনি অবিস্মরণীয়া করে গিয়েছেন।

স্বামীজির আব এক নিত্যনির্ভরযোগ্যা আমেরিকান বান্ধবী জোসেফিন ম্যাকলাউড।

অর্থকষ্ট এড়াবার জন্য বেশ কয়েকজন গুরুভাই তীর্থ করতে অথবা তপস্যা করতে বরানগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতি হয় আলমবাজার মঠে। আলমবাজার পরিস্থিতির অনেক বিবরণ বিশেষ ধৈর্য সহকারে সংগ্রহ করেছেন গবেষক স্বামী প্রভানন্দ তাঁর 'রামকৃষ্ণ মিশনের আদিকথা' নামক গ্রন্থে। এই লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি মন্দ হবে না। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন : "মঠে তখন কাজকর্মের লোক ছিল না। শশীমহারাজ ঠাকুরের ভোগ রান্না করতেন, কানাই মহারাজ বাসন মাজতেন, যোগীন মহারাজ, হরি মহারাজ ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুটনা কাটা, মশলা বাটা প্রভৃতি কাজ করতেন।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ আরও বিবরণ দিয়েছেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে উদ্ধৃতি দিয়ে। "মঠে এত অভাব যে, এমন অনেকদিন গিয়েছে ঠাকুরকে একটু মিছরি শরবত ভোগ দিবার জন্য দু-চার পয়সাও থাকিত না। একটা টেবিলে দুইটি টানা (ড্রয়ার) ছিল, তাহারই মধ্যে যাহা কিছু সামান্য পয়সাকড়ি থাকিত।"

মহেন্দ্রনাথ দত্তের মতে আলমবাজারে অর্থাভাব ছিল, তবে বরাহনগরের মতো নয়। লন্ডনে একবার স্বামীজি বলেছিলেন, "রাখালকে তখন বললাম যে, খেতড়ির রাজা মঠে মাসিক ১০০ টাকা করে দিতে রাজি হয়েছেন, নে না ; রাখাল তখন ঘোর বৈরাগ্য দেখাতে লাগল, নিলে না, কষ্টে মরতে লাগল। তাই আমি রাখালের ওপর চটে গেলুম।"

বিদেশ থেকে ১৮৯৪ সালের গ্রীষ্মকালে স্বামীজি জানতে চান, "তোমাদের কি করে চলছে, কে চালাচ্ছে?" স্বামীজি নিজেও বিদেশ থেকে কিছু সাহায্য পাঠিয়েছেন। এই সময় আলাসিঙ্গাকে লেখা (১১ জুলাই ১৮৯৪) স্বামীজির আর্থিক খবরাখবর :

"ডেট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২,৭০০ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমায় ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছে। এখানেও খরচ হয়ে গিয়েছে অনেক টাকা— হাতে আছে মাত্র ৩,০০০ ডলার।"

পরের মাসে (৩১ অগস্ট ১৮৯৪) আলাসিঙ্গাকে লেখা আর-এক চিঠি

থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে স্বামীজির মানসিকতা আরও স্পষ্ট। "আমার হাতে এখন ৯,০০০ আছে— তার কতকটা ভারতের কাজ আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব। আর এখানে অনেককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব... পুঃ—তুমি তো জান টাকা রাখা— এমনকী টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুশকিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর, আর ওতে নজর বড় নিচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের দিকটা এবং টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করার জন্য তোমাদিগকে সংবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে। এখানে আমার যেসব বন্ধু আছেন, তাঁরাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে থাকেন— বুঝলে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।"

স্বামী প্রভানন্দ জানিয়েছেন, ১৮৯৫ সালের প্রথম ভাগে স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, "তখন মঠে আমরা ডাল-ভাত ও চচ্চড়ি খাইতাম।" তাঁর পরবর্তী রিপোর্ট : "এইবার মঠের দৈনন্দিন অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল। ... ভক্তগণ যাঁহার যেমন অবস্থা, তেমনি খাদ্যদ্রব্য মঠে লইয়া আসিতেন। শতচ্ছিন্ন সতরঞ্চির অবসান ঘটাইয়া ভক্তগণ দুই-একটি নূতন সতরঞ্চি আনিয়া দিয়াছেন। একখানি ছোট চৌকি ও পড়ার একটি আলোও পাওয়া গিয়াছিল, মোটামুটিভাবে সকল সন্ন্যাসীদের পরিবার এক-একখানি কাপড় ও চাদরের সংস্থান হয়েছিল।" এই উন্নতির পিছনে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই ঠাকুরর শিষ্য (পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ) এটাওয়ার ডিসট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের। স্বামী সুবোধানন্দের মুখে মঠের শোচনীয় অর্থাভাবের কথা শুনে হরিপ্রসন্ন নিয়মিত মাসে ৬০ টাকা পাঠাতে শুরু করেন।

নিজেদের অবস্থা যাই হোক, সন্ন্যাসীভ্রাতারা নরেন্দ্রনাথের মা-দিদিমার উপরে নজর রাখতেন সর্বদা। স্বামীজির মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত একবার রক্তপিত্তরোগে আক্রান্ত হন, তাঁকে আলমবাজারে আনিয়ে চিকিৎসা করানো হয় এবং পরে গাজীপুরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পাঠানো হয়।

আলমবাজার মঠের দ্বিতীয় পর্বে (১৮৯৪-১৮৯৭) অনেকগুলি

অগ্নিগর্ভ চিঠি এসেছিল স্বামীজির কাছ থেকে। একটাতে তাঁর ওয়ার্লড প্ল্যানের উল্লেখ ছিল : "তোলপাড় কর। তোলপাড় কর। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠাও।"

স্বামীজির মতে সঙ্ঘ শব্দের তাৎপর্য 'শ্রমবিভাগ'। প্রত্যেকে আপনার কাজ করবে, যাতে সকল কাজ মিলে একটা সুন্দর ভাব সৃষ্টি হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ স্বামীজির প্রস্তাব : "কালীর (অভেদানন্দ) বিষয়বুদ্ধি পাকা। কালী হোক বিজনেস ম্যানেজার।" পরের বছর (১৮৯৫) স্বামীজি কিন্তু মত পালটালেন : "শশী ঘরকন্না দেখুক, সান্যাল টাকাকড়ি, বাজারপত্রের ভার নিক, শরৎ সেক্রেটারি হোক।" আর এক চিঠিতে স্বামীজির প্রস্তাব : "টাকাকড়ির ভার রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) যেন লয়, অন্য কেহ তাহাতে যেন উচ্চবাচ্য না করে।" অর্থ ও ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে রাখালের উপর বিবেকানন্দর ছিল পূর্ণ বিশ্বাস।

১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা তারিখহীন চিঠি : "মধ্যে যদি পারো অবিলম্বে হাওলাত করে কেদারবাবুর টাকা সুদসমেত দিও, আমি পত্রপাঠ পাঠাইয়া দিব। কাকে টাকা পাঠাই, কোথায় পাঠাই, তোমাদের যে হরিঘোষের গোয়াল।...কেদারবাবুর টাকা দ্বিগুণ পরিশোধ করিব, তাহাকে ক্ষুণ্ণ হইতে মানা করিবে। আমি জানতাম, উপেন তাহা পরিশোধ করিয়াছে এতদিনে।"

"যে মহাপুরুষ—হুজুক সঙ্গে করে দেশে ফিরে যেতে লিখেছি তাঁকে বলো কুকুরের মতো কারুর পা চাটা আমার স্বভাব নহে। যদি সে মরদ হয় তো একটা মঠ বানিয়ে আমায় ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে যাবো?...ঘরে ফিরে এস!! ঘর কোথা?"

বিদেশ থেকে প্রথমবার কলকাতায় ফিরে স্বামীজি আলমবাজার মঠেই রাত্রিযাপন করতেন। সেই সময় সম্বন্ধে স্বামী বিরজানন্দ লিখেছেন, "অন্য সকলের মতো তাঁর বিছানা ভূমিতেই ছিল, সে সময়ে কারো তক্তপোশ ছিল না।"

আলমবাজার মঠে বসে যে নিয়মাবলী স্বামীজি মুখে-মুখে বলেছিলেন

এবং স্বামী শুদ্ধানন্দ যা সাহস করে লিখে নিয়েছিলেন তার শক্তি সুদূরপ্রসারী। "নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে— সু-নিয়মের দ্বারা এই কু-নিয়মগুলি দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে।"

বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে স্বামী প্রভানন্দ জানিয়েছেন, স্বামীজি প্রথমে ২৩টি নিয়ম রচনা করেন। পরে আর একটি যোগ হয়ে, ২৪টি নিয়ম আজও আলমবাজার মঠের নিয়মাবলী বলে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সম্ভাব্য বিপদ-আপদ সম্পর্কে স্বামীজি যে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন, তা পরবর্তীকালের শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীদের কথাবার্তা থেকেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষ-স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিতে দ্বিধা নেই দূরদর্শী সন্ন্যাসীদের : "হিন্দু সন্ন্যাসী হবেন 'বিরক্ত' সাধু। ...দু'জন সন্ন্যাসী একত্রে বাস করলে গড়ে ওঠে সন্ন্যাসী-মিথুন, তিনজনে হয় সন্ন্যাসীগ্রাম, চার বা ততোধিক জনে সন্ন্যাসীনগর, এসবই ত্যাজ্য। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বিহারে একই গৃহে বাস করতেন, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর আদর্শ নিঃসঙ্গ জীবন।"

রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপনের ব্যাপারে স্বামীজির মনোভাব বিভিন্ন চিঠিতে বেশ স্পষ্ট। নভেম্বর ১৮৯৭-এ তিনি লেখেন, "কলকাতায় একটি মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারাজীবন দুঃখে-কষ্টে কাজ করলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়।"

প্রথম দিকে গঙ্গার পশ্চিম দিক অপেক্ষা পূর্বদিকেই স্বামীজির নজর ছিল, যদিও বেলুড়ের জমির খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল জুলাই ১৮৯৭ নাগাদ। কিন্তু বায়না করা হয় ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮। এর আগে সেপ্টেম্বর ১৮৯৭-তে বাগবাজারের হরিবল্লভবাবুর বাটি বিশ হাজার টাকায় পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, কিন্তু অনেক ভাঙচুর করতে হবে এই আশঙ্কায় স্বামীজি এই সম্পত্তিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কামারহাটিতেও মঠের জন্য একটা বাগান পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু অত্যধিক দূরত্বের জন্য অনেকের অপছন্দ।

উত্তরপ্রদেশের বড় সরকারি চাকুরি ছেড়ে হরিপ্রসন্ন মহারাজ মঠে যোগদান করায় আলমবাজারের সন্ন্যাসীসঙ্ঘ যে আর্থিক বিপর্যয়ে

পড়েছিল, তা এখন আর আমাদের অজানা নয়। তিনি প্রতি মাসে যে ৬০ টাকা পাঠাতেন তা এপ্রিল ১৮৯৭ থেকে বোধহয় বন্ধ হয়ে যায়।

পরের মাসের গোড়ায় স্বামীজি আলমোড়ায় চলে গেলেন। তিন দিন পরে মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামী প্রেমানন্দের চিঠি : "এ মঠ ভিক্ষা করিয়া চালাইবার হুকুম গতকল্য আলমোড়া হইতে আসিয়াছে।" দেখা যাচ্ছে, আর্থিক স্বনির্ভরতার ব্যাপারে স্বামীজির চিন্তাধারা খুবই স্পষ্ট।

মঠমিশনের শাখা-প্রশাখা যখন বিস্তারিত হল তখনও প্রত্যেক কেন্দ্রে এই স্বনির্ভরতাই মূল মন্ত্র। কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা অর্থ জোগাবে না, নিতান্ত প্রয়োজনে যদি সাহায্য আসে, তা আসবে ধার হিসেবে। ধার সম্পর্কেও স্বামীজির চিন্তাধারা স্পষ্ট। নিজেও কোনও কারণে টাকা নিলে তার জন্য সঙ্ঘকে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ হিসেবের ব্যাপারে সামান্যতম শৈথিল্য নেই।

আলমবাজারের সম্পর্কে নির্দেশ যাই হোক, স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরভাবতে কিছু অর্থ তোলবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা তাঁর চিঠি (১৫ নভেম্বর ১৮৯৭) : "এখান হইতে মঠের খরচের জন্য বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় চাঁদা আদায় করিয়া পাঠাইবেন। রীতিমত receipt তাঁহাকে দিও। ...টাকাকড়ি একটু হিসেব করে খরচ করো ; তীর্থযাত্রাটা নিজের নিজের ওপর, প্রচারাদি মঠের ভার।"

খেতড়ির রাজা এই সময় স্বামীজিকে যে তিন হাজার টাকা দেন, তা-ও তিনি স্বামী সদানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দের মাধ্যমে মঠে পাঠিয়ে দেন। টাকা তোলবার চেষ্টা চালানোর সঙ্গে, প্রত্যেক প্রাপ্তির জন্যে রসিদ দেওয়ার ব্যাপারে সন্ন্যাসীরা তখন থেকেই সদা সজাগ। অর্থ সম্বন্ধে এই শৃঙ্খলা শতবর্ষ পরেও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে অটুট।

যে-কাজের জন্যে যে-টাকা, তা অন্য খাতে খরচ করা রামকৃষ্ণ মিশনে নিষিদ্ধ সেই শুরু থেকেই। ত্রাণ কার্যের জন্য তোলা টাকা সম্বন্ধে স্বামীজির স্পষ্ট নির্দেশ, "Famine ফান্ডে যে টাকা বাঁচিয়েছে, তাহা একটি পার্মানেন্ট ওয়ার্ক ফান্ড করিয়া রাখিয়া দিবে, অন্য কোন বিষয়ে তাহা খরচ করিবে না এবং সমস্ত ফেমিন ওয়ার্কের হিসাব দেখাইয়া লিখিবে যে, বাকি এত

আছে অন্য good work-এর জন্য।"

মঠের জন্য জমি সংগ্রহ করলেই শুধু চলবে না, মঠ পরিচালনার জন্যও যে অর্থের প্রয়োজন, তা স্বামীজি কখনও ভোলেননি। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান ভরসাস্থল বিদেশিনীরা। স্বামীজির একান্ত অনুগত গুডউইনের একটি চিঠি থেকে (২০ নভেম্বর ১৮৯৬) ব্যাপারটা স্পষ্ট হচ্ছে। মিসেস বুলকে লেখা চিঠির বক্তব্য : "মঠের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মিস মুলার বছরে ২০০ পাউন্ড দেবেন, মিস সাউটার ১০০০ পাউন্ড দিচ্ছেন, মিস্টার স্টার্ডি ৫০০ পাউন্ড এবং স্বামীজি নিজে ২০০ পাউন্ড।" আরও কিছু অর্থের জন্য অনুগত গুডউইন লিখছেন স্বামীজির বান্ধবী মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের কাছে।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে সংসারত্যাগীরা বোধহয় ছিলেন দু'ভাগে বিভক্ত। স্বামীজির নাকি ইচ্ছা ছিল, মঠে দু'রকমের সাধু থাকবে—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী। প্রথম দলের নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীরা আজীবন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী থাকবে। তারা দাড়ি গোঁফ রাখবে ও আত্মপাকী হবে। নতুন ব্রহ্মচারী এলে স্বামীজি বেলুড়ের কাছাকাছি জায়গায় তাদের ভিক্ষে করতে পাঠাতেন। যা পাওয়া যেত তাই নিজে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিতে হত। অর্থাৎ কঠোর কঠিন জীবন থেকে পালিয়ে আসবার পথ নেই নবীন সন্ন্যাসীর।

আলমবাজারের নিয়মাবলীর সঙ্গে নীলাম্বরবাবুর বাগানে বসে স্বামীজি যে নিয়মাবলী রচনা করেন, তা একত্র করে গড়ে ওঠে 'বেলুড়মঠের নিয়মাবলী।' এখানেই স্পষ্ট যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে মঠবাসীদের চরিত্র। কিন্তু সব ভাল কাজের জন্যই যে প্রয়োজন অর্থের।

এক সময় নিয়মিত অর্থ বলতে খেতড়িরাজার মাসিক একশো টাকা। দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ফান্ড থেকে টাকা ধার করে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কোনওরকমে খরচ চালাচ্ছেন।

"অর্থাভাবই হচ্ছে প্রধান অসুবিধা", স্বামীজি নিজেই লিখেছিলেন মিস ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে। কিন্তু একই সঙ্গে স্বামীজির প্রধান চিন্তা

'হিসেব'। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লন্ডন থেকে তিনি লিখছেন (১০ আগস্ট ১৮৯৯), "লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসেব চায়, এই দস্তুর। প্রতিপদে সেটি তৈয়ার না থাকা বড়ই অন্যায়।"

স্বামীজির ম্যানেজমেন্ট চিন্তার মূল কথা দু'টি: "যতদূর সম্ভব অল্পখরচে যত বেশি সম্ভব স্থায়ী সৎকার্যের প্রতিষ্ঠা" এবং ত্রাণকার্যের আর্থিক হিসেব শুধু দিলেই চলবে না, তা 'পাবলিশ' করতে হবে। প্রকাশ করবার এই নীতি নৈষ্ঠিকভাবে এখনও রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে মেনে চলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে হিসাব বহির্ভূত টাকা সম্বন্ধে স্থির নীতি। যিনি টাকা দিচ্ছেন তাঁর নাম-ঠিকানা চাই। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান প্ল্যাটিনাম জুবিলির শেষ সভায় (২৭ জুলাই ১৮৯৯) মঠের জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী প্রভানন্দ প্রকাশ্যে বললেন, এক সময় যখন প্রচণ্ড অর্থাভাব, যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মাইনে দেবার অবস্থা নেই, তখন এক ভদ্রলোক ব্যাগে করে প্রচুর নগদ টাকা নিয়ে এলেন, কিন্তু বললেন তাঁর নাম-ঠিকানা দেওয়া যাবে না। তরুণ সন্ন্যাসী প্রভানন্দ সেই দান নিলেন না, পরে সেক্রেটারি (স্বামী গহনানন্দ) ফিরে এলে সভয়ে তাঁকে ব্যাপারটা বললেন। স্বামী গহনানন্দ পরবর্তীকালে মঠের প্রেসিডেন্ট। তরুণ সন্ন্যাসীকে তিনি বললেন, "ঠিক কাজই করেছ। নীতিভ্রষ্ট হয়ে বড় কাজ করা যায় না। তাতে আমাদের অভাব না ঘুচলে কী করা যাবে?"

স্বামীজির জীবনকালে নিয়মকানুন ও হিসেবপত্তরের বন্ধন যথাসম্ভব কঠোর হওয়া সত্ত্বেও সব সমস্যার সমাধান হয়নি। মঠের জমি যাঁর টাকায় কেনা হয়েছিল, সেই মিস মুলারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াটা এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। এ বিষয়ে কিছু আগাম ইঙ্গিত অবশ্য স্বামীজির চিঠিতেই রয়েছে। "মিস মুলার বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে... সকলের উপর মহারাগ, গালিমন্দ!... মধ্যে চাকরটা সকল চুরি করায় বিষম হাঙ্গামা হইয়াছিল।"

এরপরেই বিস্ফোরণ। ডিসেম্বর ১৮৯৮ মিস হেনরিয়েটা মুলারের ঘোষণা, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুধর্ম প্রচারের আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন। কলকাতার বড় বড় সংবাদপত্রগুলি এই

খবর রসিয়ে প্রচার করতে দ্বিধা করেনি।

স্বামীজির জীবনকালে মঠের উত্থানপতন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনাগত সময়ের দিকে তাকিয়ে তিনি সঙ্ঘের আইনকানুনগুলিও বিশেষজ্ঞদের আইনি পরামর্শে বেশ কয়েকবার পরিবর্তন করেছেন। লক্ষ্য এই যে, সময়ের খেয়ালি স্রোতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রগতি যেন ভিন্নমুখী না হয়। জীবিতকালে বিশ্বজনের বিস্ময় সৃষ্টি করলেও, বাংলার স্থানীয় কিছু প্রতিষ্ঠান মিশনকে সব রকম বাধা দিতে লজ্জাবোধ করেনি। যেমন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি বেলুড় মঠকে নরেন দত্তর 'বাগানবাড়ি' মার্কা করে মোটা টাকার ট্যাক্স ধার্য করে। ফলে প্রপার্টি ট্যাক্স নিয়ে লম্বা মামলা শুরু হয়, যার রায় শেষ পর্যন্ত মঠের পক্ষে যায়। স্বামীজির দেহাবসানের আগেই বেলুড় মঠের জমি নিষ্কর ঘোষিত হয়।

কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়ের তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০১। এই রায়ের দু' সপ্তাহ আগে হাওড়া কোর্টে স্বামীজি মঠের দেবোত্তর দলিল রেজিস্ট্রি করেন (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০১) এবং চারদিন পরে বেলুড়ে স্বামীজির উপস্থিতিতে মঠের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১। ট্রাস্ট ডিড পড়া হয় সভায়, সভাপতি স্বামী অদ্বৈতানন্দ। ১১ জন ট্রাস্টির মধ্যে ৮ জন উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই ভোটে সভাপতি নির্বাচন করেন। সভাপতি পদের ভোটে স্বামী ব্রহ্মানন্দের পক্ষে ৫ ও বিপক্ষে ৩ ভোট, স্বামী সারদানন্দের পক্ষে ১ ও বিপক্ষে ৭ এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পক্ষে ২ ও বিপক্ষে ৬ ভোট পড়ে। মনে হয়, স্বামীজি চেয়েছিলেন ভোটাভুটি হোক। কারণ প্রেসিডেন্ট পদে পরাভূত হয়েও স্বামী সারদানন্দ সর্বসম্মতিক্রমে সেক্রেটারি হন।

হিসেবের ব্যাপারে সন্ন্যাসীদের প্রথম থেকেই প্রবল সাবধানতা। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব ফান্ড ও স্বামীজির জন্মোৎসব ফান্ড আলাদা। এ-বিষয়ে স্বামীজির কঠোর নির্দেশ, "যদি তোমাকে অনাহারে মরতেও হয়, তবু অন্য বাবদের টাকা থেকে এক পয়সাও খরচ করবে না।"

৪ঠা জুলাই ১৯০২ স্বামীজির অকালপ্রয়াণ যেন বিনামেঘে বজ্রপাত।

এই কঠিন অবস্থা থেকে সঙ্ঘকে টেনে তুলে রাখা এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার প্রধান কৃতিত্ব স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের। দূরদর্শী বিবেকানন্দ তাঁর অবর্তমানে সঙ্ঘকে প্রাণময় রাখবার জন্য যেসব নিয়ম নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করার দুর্লভ কৃতিত্বও তাঁদের।

স্বামী নিখিলানন্দ পরবর্তীকালে জানিয়েছেন, স্বামীজির দেহত্যাগের পরে বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা স্বাভাবিকভাবে ভগ্নোদ্যোম হন এবং তাঁদের অনেকে কর্মত্যাগ করে নিভৃত জীবনযাপন করতে ইচ্ছা করেন। স্বামী সারদানন্দ তখন সন্ন্যাসীদের এক সভা আহ্বান করে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের গুরুদায়িত্বের কথা বিবৃত করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই বিশাল দায়িত্ব বহন করে চলতে হবে সকলকে? তিনি প্রশ্ন করেন, তিনি স্বামীজির মনোনীত সেক্রেটারি, তাঁকে সাহায্য করতে কে কে ইচ্ছুক আছেন? এবং কে কে তপস্যায় জীবন কাটাতে পছন্দ করেন? তিনি স্বয়ং পাঁচ বছর সঙ্ঘের কাজ করবেন বলে এগিয়ে আসেন। মাত্র একজন ব্যতীত অপর সন্ন্যাসীরা সকলেই তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হন।

সঙ্ঘের পরিচালকরা দানের অর্থ সম্বন্ধে কি রকম সাবধানী ছিলেন, তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন স্বামী নিখিলানন্দ। স্বামী সারদানন্দ সিগারেট খেতেন এবং ছাই ফেলতেন একটা সিগারেট টিনের কৌটোয়। একবার এক ধনী ভক্ত সারদানন্দকে কিছু উপহার দিতে চান। নিখিলানন্দ একটা কাঁচের ছাইদানি প্রস্তাব করেন যার দাম আট আনা। ভক্তের পয়সায় নিখিলানন্দ জিনিসটি কিনে তাঁর বিছানার পাশে রেখে দেন।

"প্রাতঃকালে ওইটি দেখে কে দাম দিয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। আমি ভক্তটির নাম বলি। তিনি বিরক্ত হন এবং গৃহস্থদের এইভাবে টাকা খরচ না করানোর বিষয়ে সাবধান করে দেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমরা সন্ন্যাসী এবং আমাদের উচিত সাধারণ জিনিসেই সন্তুষ্ট থাকা। তিনি বললেন আমি যেন ছাইদানি ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা ফেরত আনি। আর যদি তা সম্ভব না হয় তবে ওই পয়সায় কাপড় কাচার জন্য সাধারণ সাবান কিনে আনি।"

অর্থের ব্যাপারে পরবর্তীকালের সঙ্ঘপ্রধানরাও অনেকে একই রকম সাবধানী ছিলেন। সাম্প্রতিককালে আর এক সঙ্ঘপ্রধান স্বামী ভূতেশানন্দ ধনী বংশের ছেলে, কিন্তু তিনি একটি ব্লেডে একমাস দাড়ি কামাতেন। একই রকমে গল্প আছে প্রয়াত সঙ্ঘসভাপতি স্বামী গহনানন্দ সম্পর্কে।

আর্থিক ডিসিপ্লিন কতই কঠোর ছিল, তার অবিশ্বাস্য নিদর্শন মেলে বারাণসীর দু'টি পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমে। সেবাশ্রমে যাঁরা কর্মী, তাঁরা হাসপাতাল থেকে খাবার পাবেন। কিন্তু অদ্বৈতাশ্রম সাধনার স্থান, সেখানে যাঁরা তপস্যা করতে আসবেন, তাঁরা ভিক্ষা করে খাবেন, এই নিয়ম চালু ছিল। দারুণ অর্থাভাবে স্বামী শিবানন্দ এক সময়ে কাশীর গৃহস্থদের বাড়িতে-বাড়িতে ভিক্ষা করেছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সমস্ত জীবনকাল সঙ্ঘসভাপতি ছিলেন কথাটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা সরলাবালা সরকার এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। "একবার কোন কারণে যথারীতি 'প্রেসিডেন্ট' নির্বাচন না হওয়াতে বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু স্বামী অদ্বৈতানন্দ বিনাভোটেই প্রেসিডেন্ট হন ১৯০৯ সালে।" ওই বছর ২৮ নভেম্বর স্বামী অদ্বৈতানন্দ দেহত্যাগ করলে ব্রহ্মানন্দ আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর মতো নেতা না থাকলে হয়তো সেই সময় মিশনের অস্তিত্ব বিপন্ন হত।"

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার জানিয়েছেন, একসময় মঠের লোকসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু আহার্য কমছে। "ব্রহ্মচারী ছেলেরা সকালে মুড়ি জলখাবার পাইত, কিন্তু সেই মুড়ি এত শীঘ্র ফুরাইয়া যাইত যে, ঘণ্টার শব্দ আসিতে আসিতে অনেকের ভাগ্যে মুড়ি জুটিত না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশ ছিল, তাঁহার ঘরে যাহা কিছু থাকিবে, যদি কেহ খাইতে না পাইয়া থাকে, সে যেন আসিয়া সেই জলখাবার লইয়া যায়।"

১৮৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। স্বামীজি চাইতেন প্রতি বছর মিশনের সভা হবে এবং হিসেবপত্র প্রকাশ করা হবে। কিন্তু প্রথম কয়েক বছরের ছাপানো রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টস আমাদের নজরে আসেনি। প্রথম বাৎসরিক জেনারেল রিপোর্টের তারিখ বেশ কয়েক বছর পরে। ১৯০৯ সালে রামকৃষ্ণ মিশন সরকারি আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা হয়।

স্বামী সারদানন্দর স্বাক্ষরধন্য মিশনের এই প্রথম রিপোর্টটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট। কী পরিবেশে এবং কী কঠিন অবস্থার মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশনকে সেইসময় টিকে থাকতে হয়, তা মঠ-মিশনের প্রথম যুগের হিসেবপত্তরগুলি দেখলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঠক-পাঠিকারা অধৈর্য না হলে প্রথম রিপোর্ট থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করা যায়।

গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রস্তুত এই 'ফার্স্ট জেনারেল রিপোর্টে' অডিটরের নাম শ্রী বি এন সান্যাল, সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ ও ট্রেজারার স্বামী প্রেমানন্দ। একই প্রতিবেদনে ১৯১০, ১৯১১ ও ১৯১২ সালের হিসেবপত্তর রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে তখনকার ৩৫জন সন্ন্যাসীর নাম, যাঁদের বলা হয়েছে 'মনাস্টিক মেমবার্স'। সেই সঙ্গে ৩৫ জন ব্রহ্মচারীর নাম। মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মিশনের ট্রেজারার স্বামী প্রেমানন্দ। স্বামী শিবানন্দ মিশন ভাইস প্রেসিডেন্ট। ট্রাস্টি ১১ জন। এঁদের মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ মার্কিন-নিবাসী। ৩৫ জন ব্রহ্মচারীদের তালিকায় প্রথম নাম ব্রহ্মচারী জ্ঞান ও শেষ নাম পঞ্চানন, যিনি তিনকড়ি নামেও পরিচিত। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংবিধান তৈরির কাজ ১৯০৬ থেকে ঢিমেতালে চলেছিল। ৪মে ১৯০৯ যে মিশন রেজিস্ট্রি হয় তার প্রমোটার বেলুড় মঠের আটজন ট্রাস্টি। মেমোরান্ডাম অনুযায়ী মিশনের তিনটে প্রধান কাজ :

১। মিশনারি কাজ (প্রচার ও সংগঠন)

২। সেবাকর্ম

৩। শিক্ষা

রিপোর্টের একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য, স্বদেশিযুগের অশান্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় প্রকাশ্যে প্রচার বক্তৃতা ইত্যাদি গত ছ' সাত বছর বন্ধ ছিল। স্বদেশে সাতটি শাখাপ্রশাখা। বিদেশে নিউ ইয়র্ক, পিট্সবার্গ, ক্যালিফোর্নিয়া, বোস্টন, ওয়াশিংটনে ৫টি বেদান্ত সোসাইটি এবং বারাণসীর হোম অফ সার্ভিস, কনখল সেবাশ্রম ও বৃন্দাবন সেবাশ্রম ও ইলাহাবাদ সেবাশ্রমের সেবাকর্মের বিস্তারিত বিবরণও এই রিপোর্টে রয়েছে। বারাণসীতে মাসে পঞ্চাশ জন রোগীর চিকিৎসার খরচ চালানোর

জন্যে ৫০০ টাকা ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মাথাপিছু মাসিক ১০ টাকা।

কাশী সেবাশ্রমের ১৯০০-১৯১২ সালের বিস্তারিত প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, বছরে ২৭৭ জন ইনডোর ও আউটডোর রোগী দিয়ে শুরু করে ১৯১১-১২তে ৮৩৪৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় সেখানে।

স্বদেশি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মিশনের প্রকাশ্য প্রচারকার্য উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলেও দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে মাদ্রাজে ও বাঙ্গালোরে কাজ অব্যাহত থকে। উত্তর ভারতে বলবার মতন কাজ কেবল কয়েকটি শহরে সদ্য নিউইয়র্ক প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতামালা। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পাঁচটি ফান্ড খোলা রয়েছে জনসাধারণের এককালীন দানের জন্যে। তার মধ্যে পুওর ফান্ড, এডুকেশন ফান্ড ও প্রভিডেন্ট রিলিফ ফান্ড উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ সালেও রামকৃষ্ণ মিশনের আর্থিক অবস্থা কী শোচনীয় তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। প্রভিডেন্ট রিলিফ ফান্ডে বছরের বৃহত্তম দাতা (১০) কালীচরণ মিত্র, কলকাতা। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক থেকে জুলাই-ডিসেম্বর ১৯০২ সালে প্রাপ্ত সুদ ১৩৪৫ টাকা ১১ আনা, ১৭ টাকা ১৩ আনা ৫ পাই। খরচখরচা বাদ দিয়ে বছরের শেষে ব্যালেন্স ১৩০৯ টাকা ৬ আনা। পরের বছর (১৯১১) সবচেয়ে বেশি দান করেছেন সিন্ধুপ্রদেশের (এখন পাকিস্তান) পি কে মেথুমল, পরিমাণ ৩০ টাকা। বোম্বাইয়ের পি ডি ব্রহ্ম দিয়েছেন ৫ টাকা। ত্রিলোচন ভট্টাচার্য দিয়েছেন ৫ আনা। বছরের শেষে ব্যালেন্স ১৪৯৯ টাকা ৫ আনা ১১ পাই।

পরের বছর ভাগলপুর প্লেগ রিলিফ কর্মীদের যাতায়াত বাবদ খরচ ৮ টাকা ১১ আনা ৬ পয়সা। বছরের শেষে হাতে টাকার পরিমাণ ১৫০৮ টাকা ১২ আনা ৫ পাই।

পুওর ফান্ড ১৯১০ ব্যালেন্স ৬০ টাকা ১৩ আনা ৯ পাই। বৃহত্তম দাতা টুটুচেরার ছোট্ট গোয়ালা (২১ টাকা)। জনৈক বৈকুণ্ঠনাথ দাসকে আর্থিক সাহায্য ৫ টাকা ১ আনা, একজন মহিলা সাহায্য পেয়েছেন ১ আনা। আর-একজন মহিলা পেয়েছেন ৪ আনা।

রামকৃষ্ণ মিশনের মুদ্রিত জেনারেল অ্যাকাউন্টের হিসেব রয়েছে

১৯০৭ সাল থেকে। জমার পরিমাণ ৪৬৯ টাকা, খরচ ২৯৫ টাকা ১ আনা ৯ পাই। রামকৃষ্ণ মিশন নিয়মাবলী ছাপানোর কাগজ ও মুদ্রণ বাবদ ব্যয় ৬৫ টাকা ১ আনা।

প্রথম জেনারেল মিটিংয়ে জলখাবার বাবদ ব্যয় ১৪ টাকা ১ আনা ৬ পাই। রানিগঞ্জ পর্যন্ত জনৈক কুষ্ঠরোগীর ট্রেন ভাড়া বাবদ খরচ ১টাকা ৮ আনা ৩ পাই। গাড়িভাড়া বাবদ খরচা ৭ আনা। ১০০০ পোস্টকার্ড ছাপানোর জন্য খরচ ২ টাকা। রামকৃষ্ণপুরের ডাক্তার রামলাল ঘোষ দিয়েছেন ১০৫ টাকা। কলকাতার কুমার কে নন্দী দিয়েছেন ১০৫ টাকা। ডায়মন্ড হারবারের শেখ মতিউদ্দীন দিয়েছেন ৫ টাকা।

১৯১০ থেকে ঝাঁপ দিয়ে এবার মার্চ ২০০৯-এ পৌঁছনো যাক। বেলুড় হেড কোয়ার্টার নিয়ে মঠ ও মিশনের তখন ১৭২টি কেন্দ্র। তারমধ্যে ভারতে ১২৯টি, বাংলাদেশে ১২টি, আমেরিকায় ১৩টি এবং অন্যান্য দেশে ১৮টি। মঠ-মিশনের অধীনে ১৫টি হাসপাতাল, শয্যাসংখ্যা ২২৪৯, ইনডোর রোগীর সংখ্যা ৯৯,৩৯২, আউটডোরে প্রায় ৩০ লক্ষ। ডিসেপেন্সারি ও চলমান মেডিক্যাল ইউনিটে রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। শিক্ষাকর্মে প্রায় বিপ্লব। ২৩২০টি শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৮৪,৬৪৬। এছাড়া ৩টি বৃদ্ধাশ্রম ও ৭টি নার্সিং শিক্ষণ কেন্দ্র, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র ২টি। ত্রাণকাজের পরিমাণও বিশাল। ১৬৩৬টি গ্রামে ১০ লক্ষ দুর্গতের সেবায় ত্রাণের আর্থিক পরিমাণ ৬ কোটি টাকার ওপর।

২০০৯ সালের হিসেব অডিট করেছেন প্রখ্যাত রে অ্যান্ড রে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। বিশাল এই প্রতিষ্ঠান, যার অধীনে শত শত শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্র, কিন্তু সবরকম দানের পরিমাণ মাত্র ৩৩ কোটি টাকা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে শিক্ষা, সেবা ও ত্রাণে সরকারি অনুদান—৯২ কোটি টাকা। যাঁদের ধারণা কোটি-কোটি ভক্তের উদার দানে রামকৃষ্ণ মিশন আর্থিক সমৃদ্ধির জোয়ারে ভাসছে, তাঁরা জানলে কষ্ট পাবেন কয়েক বছর আগেও (১৯৯৫) দানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ কোটি টাকা। ওই বছরে শত-শত মিশন প্রোজেক্টে সরকারি সাহায্যর পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি টাকা।

কোটি টাকার হিসেব দেখেও যাঁরা হতাশ হচ্ছেন, তাঁরা জানুন, ১৯৪০ সালেও মিশনে আসমুদ্র হিমাচলের জনসাধারণের ডোনেশনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩ লাখ টাকা। সে বছরে সরকারি অনুদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০ লাখ টাকা। ১৯৫৮ সালেও জনসাধারণের ডোনেশনের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা স্পর্শ করেনি, অথচ তখনই ভারতের কোথায় না মঠমিশনের কাজ চলেছে? ১৯৫৮ সালেও জেনারেল ডোনেশনের পরিমাণ মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। এত অল্প অর্থে কী করে সন্ন্যাসীরা এত বৃহৎ সব কাজ করেছিলেন তা ভাবলে অবাক লাগে।

১৯২৬ সালে বেলুড় মঠে মঠ ও মিশনের যে ঐতিহাসিক কনভেনশন হয়েছিল, তা এক স্মরণীয় ব্যাপার। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের হিসেবটাও দেখা যেতে পারে। মোট ডোনেশন প্রাপ্তি ৬০৮৭ টাকা ৬ আনা ৬ পাই খরচ : খাওয়াদাওয়া ২৬৪১ টাকা ১৪ আনা ৩ পাই, প্যান্ডাল ১১৫ টাকা ১২ আনা ৯ পাই, কনভেনশন রিপোর্ট মুদ্রণ ১৮৬৩ টাকা ২ আনা। এই রিপোর্ট সই করেছেন তৎকালীন সেক্রেটারি স্বামী শুদ্ধানন্দ।

নিজের মুক্তির কথা না ভেবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা বহুজনের হিত ও মঙ্গলের কথা ভেবেছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়। সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল, তাও দুঃস্থ মানুষের সেবায় ও পূজায় বিক্রি করে দিতে কোনও দ্বিধা ছিল না তাঁর মধ্যে। তাঁর অকাল তিরোভাবের পরেও কিন্তু কাজের গতি স্তব্ধ হয়নি। ১৯১০ সালে ৩৫ জন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যার কেন্দ্রবিন্দুতে, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদে বাড়তে-বাড়তে ১৯৫৮ সালে ১৫০০ সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছে। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদের সংখ্যা আরও ৫০০ জন এত কম অর্থে এত বড়-বড় কাজ কী করে তাঁরা করে চলেছেন, তা ভাবতে বিস্ময় লাগে।

অন্যান্য আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রামকৃষ্ণ মিশন কত ক্ষুদ্র ও দরিদ্র তার একটা তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব হলে মন্দ হত না। হাতের গোড়ায় ছোট্ট মার্কিন প্রতিষ্ঠান বিলি গ্রাহাম ইভানজেলিস্টিক অ্যাসোসিয়েশনের কিছু হিসেবপত্তর পাওয়া গেল। এই প্রতিষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের হিসেবপত্র প্রকাশ করে থাকেন। বলাবাহুল্য এঁদের ব্যাপ্তি ও

কর্মপরিধি মঠ-মিশনের এক শতাংশও নয়। সময় ১৯৫৮ সাল। ওই বছরে ওঁদের মোট উপার্জন সাড়ে বার কোটি মার্কিন ডলার, অর্থাৎ টাকার হিসেবে অন্তত ৬০০ কোটি। এঁদের সম্পদের পরিমাণ ওই বছরে ২০ কোটি ডলার, অর্থাৎ ৯০০ কোটি টাকা। বিলি গ্রাহামের এই তরুণ প্রচার সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ১৯৫০ সালে, এঁরা ছোট্ট পরিধিতে নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রচার চালান। এঁদের হিসেবের স্বচ্ছতা আছে, তাই জানা যায় এঁদের প্রধান উইলিয়াম ফ্রাংকলিন গ্রাহাম (তৃতীয়) বছরে পারিশ্রমিক নেন ৫ লাখ ডলার অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা। চেয়ারম্যান বিলি গ্রাহাম নেন ৪ লাখ ডলার অর্থাৎ পৌনে দুকোটি টাকা।

পোপের ভ্যাটিকান শহরের খরচাপাতি অনেকদিন প্রকাশিত হত না। পোপ জন পল দ্বিতীয় হিসাবপত্রে স্বচ্ছতা আনার প্রতিশ্রুতি দেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভ্যাটিকানের বাড়ি-ঘরদোর সম্পত্তির পরিমাণ নাকি ৭০ কোটি ইউরো, অর্থাৎ সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালে আয়ের পরিমাণ ২৫ কোটি ডলার, ব্যয় ২৬ কোটি ডলার। এর মধ্যে অবশ্য সুবিশাল মিউজিয়াম, ডাকটিকিট ইত্যাদির রোজগার ধরা হয়নি। ভ্যাটিকানের সম্পত্তির মূল্যায়ন প্রায় অসম্ভব। হিসেবে ওঁদের বিশাল-বিশাল ভজনালয়গুলির মোট দাম ধরা হয়েছে মাত্র এক ইউরো।

এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আর এক প্রতিষ্ঠানের এই ধরনের তুলনার মানে হয় না। যা বলার চেষ্টা করছি, লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা পেয়েও, লক্ষ-লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও রোগীর সেবাকর্মের দায়িত্ব নিয়েও এবং ত্রাণকার্যের জন্য সদা ব্যগ্র থেকেও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রকৃত অর্থে দরিদ্র থেকে গিয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ বোধহয় এরকমই চেয়েছিলেন। আজীবন তাঁর অবিচলিত আস্থা ছিল, কোনও ভাল কাজই টাকার জন্যে আটকে থাকবে না। সেইসঙ্গে পরবর্তী সঙ্ঘপরিচালকদেরও অবিচলিত প্রত্যাশা, দরিদ্র দেশের দরিদ্র মানুষরা সঙ্ঘের কাজ ঠিক চালিয়ে দেবেন। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য এই প্রতিষ্ঠানে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটার এবং বারবার অসম্ভব সম্ভব হবে!

গুরুর রামকৃষ্ণনমিক্স এবং শিষ্যের বিবেকানন্দনমিক্স

"হিসেবের অভাবে আমি যেন জোচ্চর না বনি"—উদ্বিগ্ন স্বামী বিবেকানন্দ একবার প্রিয়জনদের বলেছিলেন।

তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরও অর্থ নিয়ে কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই, যখন মুখে যা এসেছে তা কারও তোয়াক্কা না করে বলেছেন। খোদ কথামৃতেই তিনি অর্থ-বিষয়ে সাঁইত্রিশবার মুখ খুলেছেন। ঠাকুর যখন বলছেন টাকা মাটি মাটি টাকা তাও সত্যি, আবার যখন বলছেন টাকা হচ্ছে গৃহস্থের রক্ত, টাকার সম্মান না থাকলে গৃহস্থ বিপন্ন, তাও সত্য। প্রেমের এই দেবতাকে আরও কঠিন কথা নিষ্ঠুরভাবে মুখে আনতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, "অর্থ যার দাস, সেই মানুষ। যারা অর্থের ব্যবহার জানে না, তারা মানুষ হয়ে মানুষ নয়।" এরপর আরও কঠিন কথা : "আকৃতি মানুষের কিন্তু পশুর ব্যবহার।"

নতুন যুগের নতুন কথা নতুন ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলে মন ভরে না। রামকৃষ্ণ ও তাঁর প্রধান শিষ্যের একটা অর্থনীতি আছে, আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সারাক্ষণ ডুবে থাকার ফলে রামকৃষ্ণনমিক্স এতদিন তেমন নজরে পড়েনি, এবার পড়বে। সেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের সাঁইত্রিশটা আর্থিক মন্তব্যের ওপর ভিত্তি করে সাঁইত্রিশটা অধ্যায় অনায়াসেই গড়ে উঠতে পারবে।

শিষ্য বিবেকানন্দ গুরুর অর্থচিন্তা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে, এবং দেশ বিদেশ থেকে নানা আর্থিক ধাক্কা খেয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের জন্যে যে ইকনমিক্স সৃষ্টি করলেন তাকে ইদানীং বিবেকানন্দনমিক্স বলা হচ্ছে।

গুরুশিষ্যের চিন্তার বিবর্তনটা কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম ধারণা, অর্থ মানেই অনর্থ। দ্বিতীয় চিন্তা, অর্থ গৃহস্থের রক্ত এবং এই অর্থ দিয়েই

তাঁরা সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন, এই সাহায্য ছাড়া সন্ন্যাসীর জীবন ধারণ হয় না। তবে অর্থের সঙ্গে সন্ন্যাসীর অত্যধিক সম্পর্ক অভিপ্রেত নয়, বিত্তের সঙ্গে সাধুর যত দূরত্ব তত ভালো।

ঠাকুরের মানসপুত্র বিবেকানন্দ একালের সন্ন্যাসীর যে স্পেসিফিকেশন নিজের হাতে রচনা করে দিয়েছেন তা বড়ই কঠিন। শুনুন তাঁর প্রত্যাশাটা : "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, ইতর সাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রষুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতের সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

সুদীর্ঘ প্রত্যাশার লিস্টিটা যে ভয়াবহ তা স্বীকার করতেই হবে। একটা নয়, দশটা বড়-বড় দায়িত্ব নিতে সকলের প্রতি আহ্বান, তার সঙ্গে একাদশ দায়িত্ব নিজের ওপর।

উত্তর হতে পারে, দফায় দফায় কর্তব্যের বিশ্লেষণ না করে, একটি বাক্যে স্বামী বিবেকানন্দ প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন : 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম।

এখানেও একটু টেকনিক্যাল অসুবিধা রয়েছে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কেন 'জন্ম' কথাটা একাধিকবার ব্যবহার করলেন? কেউ তো সন্ন্যাসী হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন না। শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী তো অন্য সকলের মতন জন্মগ্রহণ করে কোনও এক সময় বিচিত্রতর এক জীবনযাত্রার কঠিন সিদ্ধান্ত নেন আপনজনদের চোখের জল সত্ত্বেও। তারপর তো ভেবেচিন্তে নিজেকে মৃত ঘোষণা করে আত্মশ্রাদ্ধর ব্যবস্থা করে নতুন এক জীবনে প্রবেশ করা। অর্থাৎ গৃহস্থের ভাবধারায়, সন্ন্যাসী হয়ে কেউ জন্মায় না, সংসার কাউকে কাউকে সন্ন্যাসী হতে অনুপ্রেরণা জোগায় যদিও অতি কঠিন সেই জীবন এবং কঠিনতর সেই তীর্থযাত্রা।

অর্থ সম্বন্ধে গুরুর মতের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মতের কোনও

সংঘাত ছিল কি? অর্থের অনটন কাকে বলে যৌবনকালে তা বিবেকানন্দের হাড়ে-হাড়ে জানা ছিল। কোথাও কোথাও অর্থ সম্বন্ধে অভিমানও ছিল। যেমন, প্রচণ্ড অভাবে, দক্ষিণেশ্বরের মায়ের কাছ থেকে অর্থ প্রার্থনার কথা ছিল, কিন্তু, নির্ধারিত সময়ে তিনি মায়ের কাছ থেকে অত সামান্য আশীর্বাদ চাইতে পারলেন না, বিত্ত থেকে বৈরাগ্যকেই তিনি বেশি সমর্থন দিলেন। যে-বংশে তাঁর জন্ম সেখানে অল্পবয়সে বিত্তসুখের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে। ত্যাগের পথ প্রস্তুত করতে ভোগের অভিজ্ঞতারও যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা উপলব্ধি করে তিনি নিজেই বলেছেন, যে জীবনে লাখ টাকার পর বসল না কখনও তার ত্যাগের চিন্তা হবে কেমন করে?

আর একটা ব্যাপারে স্বামীজির চড়া মেজাজের কথা আমরা শুনেছি। তা হলো পয়সার হিসেব। পয়সায় গুরুর বিন্দুমাত্র টান ছিল না, কিন্তু অপচয়ে ছিল প্রবল আপত্তি। দু'তিনটে দোকানে দরদাম যাচাই না করে কোনো কেনাকাটায় তিনি রাজি নন, অপরে পয়সা দিচ্ছে বলে অযথা বেশি দামি জিনিস কেনা অবিশ্যই নয়। প্রধান শিষ্যটিরও প্রথমদিকের ধারণা, অপরের টাকা হলে অবশ্যই তা খুব ভেবেচিন্তে সৎপথে খরচ করা হবে, কিন্তু তা বলে অন্যের কাছে হিসেব দাখিল করতে হবে কেন? খরচ ও হিসেব যে হরিহর-আত্মা, একটা যদি আলো হয় তাহলে অপরটি ছায়া এটা যে কিছুতেই ভোলার নয় তা কাশীপুর উদ্যানবাটিতে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ভুলে গিয়েছিলেন। ভক্তরা চাঁদা তুলে অসুস্থ রামকৃষ্ণের খরচাপাতি চালাচ্ছেন, অন্যেরা পয়সা না দিলেও দিবারাত্র সেবা করছেন, তাঁদের জন্য খরচ হচ্ছে, সাহায্যকারী ভক্তরা খরচের লাগাম টানবার জন্যে হিসেব চাইছেন, তা শুনে নরেন্দ্রনাথ রেগেমেগে খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করবেন না। যে তাঁদের বিশ্বাস করতে পারে না সে লোকের টাকা নিজের হাতে নেবার প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী পর্বে স্বামীজির মতের বিপুল পরিবর্তন হয়েছিল। হিসেবকে প্রায় পূজার বেদিতে বসাতে চেয়েছেন বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ, তাই তাঁর

সংঘের অ্যাকাউন্টিং পলিসিতে কঠিন নিয়মের শাসন, সেখানে ভ্রান্তির কোনও ক্ষমা নেই।

আমেরিকা থেকে (৩১ আগস্ট ১৮৯৪) প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখছেন, "তুমি তো জানো, টাকা রাখা—এমনকী টাকা ছোঁয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুশকিল। ওটা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের দিকটা এবং টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করবার জন্য তোমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে। ...এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব।"

একই বছরে তারিখহীন আধা ইংরিজি-আধা বাংলা চিঠিতে স্বামী শিবানন্দকে স্বামীজি লিখছেন, "আমি ইতঃপূর্বেই ভারতবর্ষে চলে যেতাম, কিন্তু ভারতবর্ষে টাকা নেই। হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেউ একটি পয়সা দেবে না—এই হচ্ছে ভারতবর্ষ! এখানে লোকের টাকা আছে, আর তারা দেয়।"

টাকা দিলেও দানের টাকার অনেক অদৃশ্য বন্ধন থাকে, তার একটি হল হিসেব। সেটা অভিজ্ঞ স্বামীজি যথাসময়ে ভালোভাবেই বুঝেছিলেন।

স্বামীজির নিজের রোজগারের টাকাও ছিল। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে নিউইয়র্ক থেকে (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫) লিখছেন বিবেকানন্দ : আমি বাংলাদেশ জানি, ইন্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার একজন, কাজের বেলায় শূন্য। আমি এখানে জমিদারিও কিনি নাই, বা ব্যাংকে লাখ টাকাও জমা নাই। এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে—এই ঘোর শীতে রাত্তির দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার করে দু-চার হাজার টাকা করেছি—মা-ঠাকুরানির জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।"

বিদেশ থেকে তিনি আরেক তারিখহীন চিঠি লেখেন স্বামী ব্রহ্মানন্দকে : "যে যা করে, করতে দিও (উৎপাত ছাড়া)। টাকাখরচ বিলকুল তোমার হাতে রেখো।" অর্থাৎ সেই পুরনো সাংসারিক সাবধানতা—ঘরসংসার তোমার, চাবিকাঠিটি আমার।

১৮৯৯ সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসি দেশের পারি নগর থেকে

আলাসিঙ্গার কাছে অর্থ নিয়ে স্বামীজির দুঃখ, "আমিই তো সারাজীবন অপরকে সাহায্য করে আসছি। আমাকে সাহায্য করছে, এমন লোক তো আমি এখনও দেখতে পাইনি। বাঙালিরা—তাদের দেশে যত মানুষ জন্মেছেন তাঁর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে ক্রমাগত বাজে বকছে ; ... জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!!"

১৮৯৫ সালে প্রবাসী বিবেকানন্দের অর্থ সম্বন্ধে চোখ খোলার সময়। রিডিং থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে চিঠি : "বাঙালিরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে—অহ্ হ!!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙালিরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ...—গুলোকে টাকাকড়ির কাজে একদম বিশ্বাস করবে না ; অত কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে না। নিজের কড়িপাতির খরচ-আদায় সমস্ত করবে। মধো—যা বলি করে যা, ওস্তাদি চালাস না আর আমার ওপর।"

টাকার কথা স্বামীজির ১৮৯৫ সালের চিঠিপত্রে বারবার উঠে আসছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন, "দেশের লোকের কথা কি বলো? কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এ পর্যন্ত সহায়তা করেছে, না একজন সাহায্য করতে এগিয়েছে। এ-সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত কর ততই চায়। তারপর যদি আর না পারো তো তুমি চোর।"

প্রায় একই সময়ে স্বামী অখণ্ডানন্দকে লেখা (১৩ নভেম্বর ১৮৯৫) : "...এর অর্থসংগ্রহ উত্তম সঙ্কল্প বটে, কিন্তু ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম-কাঞ্চনের হাত এড়ানো ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকাকড়ির সম্বন্ধ মাত্রই গোলমালের সম্ভাবনা।" এবার মঠের ফিনান্স সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দর স্পষ্ট নির্দেশ : "অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না।...আমার বা আমাদের নামে কোনও গৃহস্থ মঠ বা কোন উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে...।" তারপর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নির্মম সত্যের উপলব্ধি : "বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পূরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভান

করে।” সন্ন্যাসীভ্রাতা ‘গ্যাঞ্জেস’-কে উকিলবাড়ির ছেলে নরেন্দ্রনাথের সাবধানবাণী : “তুমি বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসরক্রমে মহানীতিপরায়ণ লোকও প্রতারক। হয় এ হচ্ছে সংসার।”

এইখানে ‘অবসরক্রমে’ কথাটির যথেষ্ট গুরুত্ব। প্রতারণার সুযোগ না দিতে হলে অবশ্যই হিসেবের ওপর যথেষ্ট খবরদারি প্রয়োজন। এ-বিষয়ে বিবেকানন্দের মতামত চাঁচাছোলা। আলাসিঙ্গা পেরুমলকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় (৮ আগস্ট ১৮৯৬) তিনি লিখছেন : তোমাদের “কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন : প্রথমত হিসাবপত্র সম্বন্ধে বিশেষ সততা অবলম্বনীয়। এই কথা বলতে গিয়ে আমি এসব কোন আভাস দিচ্ছি না যে, তোমাদের মধ্যে কারও পদস্খলন হবে, পরন্তু কাজকর্মে হিন্দুদের একটা অদ্ভুত অগোছালো ভাব আছে—হিসাবপত্র রাখার বিষয়ে তাদের তেমন সুশৃঙ্খলা বা আঁট নাই ; হয়তো কোনও বিশেষ ফান্ডের টাকা নিজের কাজে লাগিয়ে ফেলে এবং ভাবে শীঘ্রই তা ফিরিয়ে দেবে—ইত্যাদি।”

হিসেব সম্বন্ধে স্বামীজির মতামত ক্রমশ কঠোর হয়ে উঠেছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে আম্বালা থেকে (১৯ আগস্ট ১৮৯৭) মাদ্রাজ-কেন্দ্রের প্রবল অর্থাভাব সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, “লেকচারের টাকা অভ্যর্থনায় খরচ করা অতি নীচ কার্য—তাহার বিষয় আমি কোনও কথা কাহাকেও বলিতে ইচ্ছা করি না। টাকা সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোক যে কিরূপ, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি।”

দু'মাস পরে অর্থ সম্বন্ধে তাঁর ধারণার আরও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা চিঠিতে (১০ অক্টোবর ১৮৯৭)। “আমি এখান হইতেই (মরী) মঠের জন্য অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিলাম। যেখান হতে তোমার নামে টাকা আসুক না, তুমি মঠের ফান্ডে জমা করিবে ও দুরস্ত হিসাব রাখিবে। দুটো ফান্ড আলাদা—একটা কলকাতার মঠের জন্য, আর একটা দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য ইত্যাদি।”

ঠিক দু'দিন পরে (১২ অক্টোবর ১৮৯৭) গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে হিসেবনিষ্ঠ বিবেকানন্দের কঠোর নির্দেশ : “কোন কোন বিষয়ে বিশেষ

direction আবশ্যক বোধ করিতেছ।... (১) যে যে ব্যক্তি টাকা যোগাড় করিয়া পাঠাইবে...তাহার acknowledgement মঠ হইতে পাইবে। (২) Acknowledgement দুইখানা—একখানা তার, অপরখানা মঠে থাকিবে। (৩) একখানা বড় খাতায় তাদের সকলের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকিবে। (৪) মঠের ফান্ডে যে টাকা আসিবে, তাহার যেন কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব থাকে এবং সারদা প্রভৃতি যাহাকে যাহা দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাছে হতে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব লওয়া চাই। হিসাবের অভাবে...আমি যেন জোচ্চোর না বনি। ওই হিসাব পরে ছাপিয়ে বাহির করিতে হইবে।"

দেখা যাচ্ছে বিদেশের আর্থিক সংস্থায় নানা ডিসিপ্লিন দেখে স্বামী বিবেকানন্দ অপরের দেওয়া অর্থ সম্বন্ধে একটা কঠিন নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং সংঘের শুরু থেকে আর্থিক সংযমকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর গুরুভাইরা প্রথমে এ-বিষয়ে ততটা তৎপর না হলেও কী আশ্চর্যভাবে এই নিয়মকে সংঘজীবনের অঙ্গ করে নিয়েছিলেন তাও এক অবিশ্বাস্য গল্প। এ-বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা না করলে বোঝা মুশকিল বিবেকানন্দমিক্স-এর প্রভাবে মঠ ও মিশন কেন শতাব্দীর বেশি সময় ধরে সকল সন্দেহ ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকতে সমর্থ হয়েছে। এদেশের বাঘা বাঘা চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসি প্রতিষ্ঠান ও জগৎজোড়া অডিটিং প্রতিষ্ঠানগুলি বিবেকানন্দের কাছ থেকে পথের সন্ধান লাভ করতে পারেন।

দরিদ্র পূজারি বাউন হলেও এককালীন অর্থসাহায্য সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও ভীষণ ভয় ছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' বইতে চমৎকার এক বর্ণনা রয়েছে—

লক্ষ্মীনারায়ণ নামক একজন মাড়োয়ারি সৎসঙ্গী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরকে দর্শন করতে আসেন। ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বেদান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। ঠাকুরের সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ

ক'রে ও তাঁর বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা শুনে তিনি বড়ই প্রীত হন।

পরিশেষে ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় নেবার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, "আমি দশ হাজার টাকা আপনার সেবার নিমিত্ত দিতে চাই।"

ঠাকুর এই কথা শোনবামাত্র, মাথায় দারুণ আঘাত লাগলে যেরূপ হয়, মূর্ছাগতপ্রায় হলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাবিরক্তি প্রকাশ ক'রে বালকের ন্যায় তাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "শালা, তুম হিঁয়াসে আবি উঠ্ যাও। তুম্ হাম্‌কো মায়াকা প্রলোভন দেখাতা হ্যায়।"

মাড়োয়ারী ভক্ত একটু অপ্রতিভ হয়ে ঠাকুরকে বললেন, "আপ আভি থোড়া কাঁচা হ্যায়"।

উত্তরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যায়সা হ্যায়।"

মাড়োয়ারী ভক্ত বললেন, "মহাপুরুষ লোগোকো খুব উচ্চ অবস্থা হোনেসে ত্যাজ্য গ্রাহ্য এক সমান বরাবর হো যাতা হ্যায়, কোই কুছ্ দিয়া অথবা লিয়া উসসে উন্‌কা চিত্তমে সন্তোষ বা ক্ষোভ কুছ্ নেই হোতা।"

ঠাকুর ঐ কথা শুনে ঈষৎ হেসে তাকে বুঝাতে লাগলেন, "দেখ, আর্শিতে কিছু অপরিষ্কার দাগ থাক্‌লে যেমন ঠিক ঠিক মুখ দেখা যায় না, তেমনি যার মন নির্মল হয়েছে, সেই নির্মল মনে কামিনী, কাঞ্চন-দাগ পড়া ঠিক নয়।"

ভক্ত মাড়োয়ারি বললেন, "বেশ কথা, তবে ভাগ্নে হৃদয়, যে আপনার সেবা ক'রে না হয় তার কাছে আপনার সেবার জন্য টাকা থাক।"

তদুত্তরে ঠাকুর বললেন, "না, তাও হবে না। কারণ তার নিকট থাকলে যদি কোনও সময় আমি বলি যে অমুককে কিছু দাও বা অন্য কোনও বিষয়ে আমার খরচ করতে ইচ্ছা হয়, তাতে যদি সে দিতে না চায় তার মনে সহজেই এই অভিমান আসতে পারে যে, ও টাকা তো তোর নয়, ও আমার জন্য দিয়েছে। এও ভালো নয়।"

পরবর্তীকালে সঙ্ঘ চালানোর জন্য এই ডোনেশনভিত্তি মেনে নিতে হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে। সন্ন্যাসী অর্থ উপার্জন করেন না, শরীর রক্ষার জন্য তিনি কেবল সংসারীর কাছ থেকে যৎসামান্য দান গ্রহণ

করেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দর কাছে এই অর্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হিসেবনিকেশ। মঠের খরচের জন্য লাহোরের বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত চাঁদা আদায় করে পাঠাবেন। এই খবর পেয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে (১৫ নভেম্বর ১৮৯৭) স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ দিচ্ছেন, "রীতিমত রসিদ তাঁকে দিও।" ঠাকুরের বাণীতে লাহোর খুব তেতেছে, চাঁদা উঠছে।

হিসেব-পত্তর অবশ্যই, তারপরে বিবেকানন্দনমিক্স্ দ্বিতীয় পর্ব—"টাকাকড়ি একটু হিসেব করে খরচ করো।" সন্ন্যাসীদের স্পষ্ট বলছেন, অভাবের সংসারে "তীর্থযাত্রাটা নিজের খরচে করো।"

খরচ কমাবার জন্য এবং জমিজমার দাম যাতে বেশি না হাঁকে তার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিশ্বাসভাজন গুরুভাইদের যে পরামর্শ দিচ্ছেন, তা অভিজ্ঞ এটর্নি পরিবারের সন্তানের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। যেমন জমির জন্য দরদস্তুর। ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজি পরামর্শ দিচ্ছেন : "অন্য লোক দিয়ে কথা পাড়লে ভালো হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লম্বা দর হাঁকবে।"

টাকাকড়ির ব্যাপারে স্বামী ব্রহ্মানন্দই স্বামীজির প্রধান ভরসা। "দুর্ভিক্ষ ফান্ডে যে টাকা বাঁচিয়াছে তাহা একটা পার্মানেন্ট ওয়ার্ক ফান্ড করিয়া রাখিয়া দিবে। অন্য কোনও বিষয়ে তাহা খরচ করিবে না এবং সমস্ত দুর্ভিক্ষ-কার্যের হিসাব দেখাইয়া লিখিবে যে, বাকি এত আছে অন্য ভালো কাজ-এর জন্য...।"

একই চিঠিতে (৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭) গুরুভাইকে স্বামীজির মারাত্মক সাবধানবাণী : "টাকা কড়ি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। হিসাব তন্ন তন্ন রাখিবে ও টাকার জন্য আপনার বাপকেও বিশ্বাস নাই জানিবে।" লোকশ্রুতি নয়, সন্ন্যাসীর সহস্তলিখিত পত্রে এমন কঠিন নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

অপরকে নির্দেশ দিয়ে নিজের খুশিমতো খরচ খরচা করাটা স্বামীজির স্বভাবে নেই। শ্রীনগর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি লিখছেন (১ আগস্ট ১৮৯৮), "ভালো কথা, কয়েকজনকে...এইভাবে টাকা দিও। এই টাকা আমি মঠ থেকে কর্জ নিচ্ছি এবং পরিশোধ করব তোমার কাছে

সুদসমেত।" অর্থাৎ শুধু ধার নয়, সুদসমেত ধার। পরবর্তী সময়ে মঠের প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দকে আমরা ধার নিতে এবং সুদ দিতে দেখেছি। কোনটা নিজের টাকা আর কোনটা সঙ্ঘের টাকা সে সম্বন্ধে কোথাও কোনও সন্দেহ থাকবার অবসর নেই শ্রীরামকৃষ্ণের চেলাদের সঙ্ঘে।

এই হিসেবনিষ্ঠা এক এক সময় সন্ন্যাসীদের প্রবল কষ্টের কারণ হয়েছে, আজকের চোখে একটু পাগলামিও মনে হতে পারে। এক-আধটা ঘটনা স্মরণ করাটা অযৌক্তিক হবে না। যেমন স্বামীজির জীবিতকালে মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীদের দুর্ভিক্ষত্রাণকর্ম। স্বামী অখণ্ডানন্দের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের মহুলায় রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সুসংবদ্ধ আর্তত্রাণসেবা শুরু হয়েছিল। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলকাতার আলমবাজার মঠ থেকে দুইজন সাধুকে দেড়শ টাকা সহ মহুলায় স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে পাঠালেন। এই সেবাকার্যের শুরু যে ১৮মে ১৮৯৭ তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু যা তেমন প্রচারিত নয়, যাঁরা সেবা করতে গেলেন তাঁদের খাওয়াদাওয়ার খরচ কি ত্রাণের ফান্ড থেকে নেওয়া হবে? বড়ই সূক্ষ্ম এই বিভাজন, এক এক সময় পাগলামোও মনে হতে পারে। কিন্তু শুনুন, স্বামীজির প্রিয়বন্ধু চিরবিশ্বস্ত সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দের এবিষয়ে বক্তব্য।

স্বামী অখণ্ডানন্দকে খরচখরচা সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ নির্দেশ দিচ্ছেন ১৯মে, ১৮৯৭ : "টাকার পুনরায় আবশ্যক হইলে ১০/১২ দিন আগে লিখিবে। তোমরা যদি গ্রাম হইতে ভিক্ষা না করিতে পার তাহা হইলে ১০ টাকা ওই ফান্ড হইতে আপাতত লইয়া নিজ ব্যয়ের জন্য নির্বাহ করিবেক। এখান হইতে টাকা গেলে সেই টাকা হইতে উক্ত ফান্ডে দিবে।"

ত্রাণকার্যে গিয়েও নিজের জীবনধারণের জন্য সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাবৃত্তি! এক আশ্চর্য ব্যাপার।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী একসময় মাদ্রাজ মঠে তীর্থযাত্রায় আসেন। কাজ নেই, শুধু ভ্রমণ স্বামী বিবেকানন্দের মোটেই পছন্দ নয়। ১৫ নভেম্বর ১৮৯৭ লাহোর থেকে স্বামীজি তাঁর চিরবিশ্বস্ত ব্রহ্মানন্দের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করছেন : "টাকাকড়ি একটু হিসেব

করে খরচ করো ; তীর্থযাত্রাটা নিজের নিজের উপর ; প্রচারাদি মঠের ভার।"

৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭ খেতড়ি থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজির চিঠির সুর আরও কড়া, "কাজ আমি চাই—কোন প্রতারক চাই না। যাদের কাজ করবার ইচ্ছা নেই—'যাদু এই বেলা পথ দেখ।' "

বিবেকানন্দর চিন্তার সূত্র ধরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭ যে চিঠি মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন তা আজও অনেকের নজরে আসেনি। "তোমরা অনেকগুলি একসঙ্গে জমিয়াছ, দেখ, যেন তোমার কার্যের ক্ষতি না হয়। ...খরচপত্র যেন বিবেচনা করিয়া করিবে। কোনওমতে বেশি না হয়। কাহারও whims শুনিয়া চলিবে না। ...স্বামীজি বড় অসন্তুষ্ট হন যাহারা সাধন ভজন কিংবা work না করিয়া idle and aimlessly বেড়ায়। ...তুমি কোনওরূপ চক্ষুলজ্জা করিবে না ; আমি দেখিয়াছি চক্ষুলজ্জা করিয়া কাহাকেও please করা যায় না।"

এর কয়েকমাস পরে (১৭ জুলাই ১৮৯৮) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা আর এক চিঠিতে স্বামীজির অর্থ সংক্রান্ত চিন্তাধারা আরও পরিষ্কার। "টাকাকড়ি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাই শেষ। অতঃপর দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে তুমি যেমন বিবেচনা করিবে, তাহাই করিবে। ...আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে আমার পলিসি ভুল, তোমারটা ঠিক—অপরকে সাহায্য করা সম্বন্ধে, অর্থাৎ একেবারে বেশি বেশি দিলে লোক কৃতজ্ঞ না হইয়া উল্টা ঠাওরায় যে, একটা বোকা বেশ পাওয়া গেছে। দানের ফলে গ্রহীতার যে নৈতিক অবনতি হয়, সেদিকে আমাব দৃষ্টি থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ভিক্ষের পয়সা যে উদ্দেশে লোকে দেয়, তাহা একটুও এদিক-ওদিক করিবার আমাদের অধিকার নাই।"

শেষের মন্তব্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা পরবর্তী সময়ে স্বামীজির আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বারাণসীধামে বিত্তশালী ভূম্যধিকারী ভিঙ্গার রাজার সঙ্গে স্বামীজির দেখা হয়, সুপণ্ডিত এই রাজা কাশীতে একটা ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তিনি যে অর্থসাহায্য করতে প্রস্তুত তা জানিয়ে দিলেন।

স্বামীজি উত্তর দিলেন, শরীর অসুস্থ, সেইজন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কোনও পাকা কথা দেওয়া তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়, কলকাতায় ফিরে শরীর সুস্থ হলে ভেবে দেখবেন।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন : "পরদিবস ভিঙ্গারভবন হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া স্বামীজিকে একখানি বদ্ধ পত্র দিল। উহা উন্মুক্ত করিলে দেখা গেল, উপঢৌকনস্বরূপ ভিঙ্গারাজ স্বামীজিকে পাঁচশত টাকার একখানি চেক পাঠাইয়াছেন এবং পত্রে উহাই উল্লিখিত আছে। অমনি স্বামীজি পার্শ্ববর্তী স্বামী শিবানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মহাপুরুষ, আপনি এই টাকা নিয়ে কাশীতে ঠাকুরের মঠ স্থাপন করুন।'

জীবনের শেষপর্বে অপরের দেওয়া অর্থ সম্বন্ধে আজও সজাগ হয়ে উঠেছেন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন, "স্বামীজির একটি কাজ তখনও অবশিষ্ট ছিল—ভিঙ্গার রাজার প্রদত্ত অর্থে (পাঁচশত টাকায়) কাশীধামে একটি আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। তিনি প্রধানত স্বামী সারদানন্দকে এই কার্যভার দিতে চাহিলেন ; কিন্তু সারদানন্দ সম্মত হইলেন না। তখন তিনি স্বামী শিবানন্দকে (মহাপুরুষ মহারাজকে) ওই কর্তব্য বরণ করিতে বলিলেন, স্বামী শিবানন্দ তখন স্বামীজির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বেচ্ছাবৃত এই অত্যাবশক কর্তব্য ছাড়িয়া তাঁহার অন্যত্র যাওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং তিনিও অস্বীকৃত হইলেন। স্বামীজি তবুও হাল ছাড়িলেন না।" এরপরে দানের টাকার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে স্বামীজির সেই জগদ্বিখ্যাত উক্তি : "বিরক্তি দেখাইয়া অনুযোগ ও ভর্ৎসনা- মিশ্রিতস্বরে বলিলেন, টাকা নিয়ে কাজ না-করায় আপনার জন্যে আমাকে কি শেষে জোচ্চোর বনতে হবে?"

এরপরে আর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ রইল না, এবার তড়িঘড়ি কাজ। মৃত্যুপথযাত্রী গুরুভাইকে বেলুড়ে ফেলে রেখে সন্ন্যাসী স্বামী শিবানন্দ দানের অর্থের মর্যাদা রাখতে কাশীযাত্রা করলেন।

৪ঠা জুলাই ১৯০২ বেলুড়মঠে মহাসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন মহাপ্রস্থানের পথে তখন স্বামী শিবানন্দ তাঁর গুরুভাইয়ের ইচ্ছাপূরণের

জন্য তাঁর শেষকীর্তি কাশীধামে 'শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম' স্থাপন করলেন। যুগনায়ক বিবেকানন্দের লেখক স্বামী গম্ভীরানন্দের এই ঘটনাটি সম্পর্কে মন্তব্য "কি আশ্চর্য", কিন্তু অর্থ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর চিন্তার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে যাঁরা অবহিত তাঁরা মোটেই বিস্মিত নন, বরং এমন না হলেই তাঁরা আশ্চর্য হতেন।

স্বামীজির মতে অর্থে নিরাসক্তি, কিন্তু সঙ্ঘের অর্থে অতিমাত্রায় সাবধানতা দুটি পরস্পরবিরোধী মানসিকতা নয়। হিসেবের নাগপাশ ছাড়া এ-যুগের সন্ন্যাসী মানবসেবী হয়ে উঠতে পারেন না, এইটাই শিক্ষা।

হিসেব মানে কেবল নগদ টাকার ওপর নজর রাখা নয়। স্বামীজির উদ্ভাবিত অ্যাকাউন্টিং পলিসিতে আরও দুটি বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথমটি এখন দেশবিখ্যাত—শাকের টাকা মাছে এবং মাছের টাকা শাকে খরচ নৈব নৈব চ।

এর আগে আমরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার নীতিবিহীন প্রয়াসের ব্যর্থতার খবরই জেনেছি ; কিন্তু একই খাতে সংগৃহীত অর্থ যে দাতার বিনানুমতিতে অন্য খাতে খরচ করাটা বিধিসম্মত নয় তা স্বামীজিই তাঁর অনন্য বাচনভঙ্গিতে অবিস্মরণীয় করে গিয়েছেন। এদেশের চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্টরা আর কোনও আধ্যাত্মিক পুরুষের এমন ম্যানেজমেন্ট-বাণী কোথাও খুঁজে পাবেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বিতীয় হিসাব-চিন্তাকেও একটু প্রাধান্য না দিয়ে উপায় নেই। এই বিষয়টি হল, সম্ভাব্য খরচ অথবা এস্টিমেটকে অতিক্রম করা চলবে না। এদেশে অনুমান অথবা এস্টিমেটের কোনও পবিত্রতা বা 'স্যাংটিটি' নেই—হাজার টাকার ইঙ্গিত দিয়ে কাজে নামিয়ে শেষপর্যন্ত লাখ টাকা খরচ করিয়ে দেওয়া এদেশের সরকারি এবং বেসরকারি সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধেও স্বামী বিবেকানন্দ কীরকম খড়্গহস্ত ছিলেন জীবনের শেষ প্রান্তেও তা এইখানে নিবেদন করলে মন্দ হয় না।

এ-বিষয়ে পরের মুখে ঝাল না খেয়ে ঠাকুরের তিন সাক্ষাৎ শিষ্যের

আচরণ ও স্মৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবো। এঁরা হলেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (পরে মঠ-মিশনের সভাপতি), স্বামী ব্রহ্মানন্দ (স্বামীজির পরম বিশ্বস্ত, মঠ-মিশনের সভাপতি) এবং স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং।

এবার আমরা স্বামী বিজ্ঞানান্দের স্মৃতিকথার ওপর নির্ভরশীল হবো। কিন্তু তার আগে যুগনায়ক বিবেকানন্দর তৃতীয় খণ্ডের একটি ছোট ফুটনোটের ওপর মুহূর্তের নজর দেবো। সেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি থেকে ছোট্ট উদ্ধৃতি। "২৯ মার্চ ১৯০২—আজ পোস্তার ভিত আরম্ভ হইল। আজ মাটিকাটা শুরু হইল। ৩০ মার্চ—নতুন পোস্তার জন্য আজ দেড়টায় আমরা পূজা করিলাম। আজ খোয়া ঢালার কাজ শুরু হইল।" সময়সীমাটা জানা থাকলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে।

এরপর আমাদের উদ্ধৃতিটুকু স্বামী বিজ্ঞানানন্দ থেকে। বেলুড়মঠের বারান্দায় বসে পরবর্তীকালে এই ইঞ্জিনিয়র মহারাজ তাঁর নিজের কথা বলেছিলেন। রাজা মহারাজকে স্বামী বিবেকানন্দ খুবই ভালোবাসতেন, খুব মান্যও করতেন। ঠিক গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু এই ভাব। তা বলে কারো একটু দোষ বা ক্রটি দেখলে তা সইতে পারতেন না।

"যে রাখাল মহারাজকে এত প্রাণের সহিত ভালোবাসতেন, তাঁকেই একবার এমন গালমন্দ করলেন যে মহারাজ তো একেবারে কেঁদে আকুল। অবশ্য সে ব্যাপারে পুরোপুরি দোষ ছিল আমারই। আমায় বাঁচাতে গিয়ে মহারাজ নিজের উপর দোষটা টেনে নিলেন।

"তখন গঙ্গার ধারে পোস্তা ও ঘাটের কাজ চলেছে। স্বামীজি আমায় বলেছিলেন—পেসন, সামনে একটা ঘাট হওয়া খুব দরকার এবং সে-সঙ্গে গঙ্গার ধারে পোস্তাও খানিকটা বাঁধতে হবে। তুই একটা প্ল্যান করে খরচের একটা আন্দাজ আমায় দিবি তো! আমি একটা প্ল্যান করে কত খরচ পড়বে তারও একটা হিসাব দেখালাম। স্বামীজির ভয়ে আমি খরচ কম ধরে তাঁকে প্ল্যানটা দেখিয়ে বললাম—এই হাজার তিনেক টাকা হলেই বোধ হয় সব হয়ে যাবে।

"স্বামীজিও তাতে ভারি খুশি। তখনই মহারাজকে ডেকে বলেছেন—কি বল, রাজা! এই সামনেটাতে একটা ঘাট ও পোস্তা হলে

বেশ হয়। পেসন তো বলছে, তিন হাজার টাকায় হয়ে যাবে। তুমি বল তো কাজ আরম্ভ হতে পারে। মহারাজও বললেন—তা তিন হাজার টাকায় হয় তো এ টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

"কাজ তো আরম্ভ হল। আমিই কাজকর্ম দেখাশুনা করছি। হিসাবপত্র সব মহারাজ রাখছেন আর টাকাকড়ির জোগাড়ও করতেন তিনিই। কাজ যত এগুচ্ছে—স্বামীজিরও তত আনন্দ। মাঝে মাঝে হিসাবপত্র দেখে—টাকা পয়সা আছে কিনা খোঁজ খবর করেন।

"এদিকে কাজ যত এগুতে লাগল ততই দেখা গেল যে, তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হবে না। আমি বেগতিক দেখে মহারাজকে গিয়ে বললাম—দেখুন, স্বামীজিকে ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম যে তিন হাজার টাকায় কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু একাজ শেষ করতে খরচ হবে ঢের বেশি। এখন উপায় কি বলুন!

"মহারাজ নেহাত ভালোমানুষ ছিলেন। আমার অবস্থা দেখে তাঁর খুব দয়া হল। তিনি সাহস দিয়ে বললেন, তার আর কি করা যাবে? কাজে হাত যখন দেওয়া হয়েছে, তখন যে করেই হোক শেষ করতে হবে। তুমি তার জন্য ভেবো না, যাতে কাজ ভালো হয় তাই কর। আমি তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু মনে মনে ভয় আছে যে, এক সময় স্বামীজির গালাগাল খেতেই হবে।

"এমনি সময় স্বামীজি একদিন কাজের খরচপত্রের হিসাব দেখতে চাইলেন। মহারাজ হিসাব খুবই সুন্দরভাবে রাখতেন। হিসাব দেখতে গিয়ে যখন দেখলেন যে, তিন হাজার টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে অথচ কাজ শেষ হতে ঢের বাকি তখন তিনি মহারাজের উপর খুব একচোট নিলেন। মহারাজ একটি কথাও বললেন না, চুপ করে সব সয়ে গেলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর ভারি দুঃখ হয়েছিল।

মহামানবের আবির্ভাব সময়ে সুরলোক থেকে জয়শঙ্খ বেজে ওঠে এমন কথা কবি শাস্ত্রকাররা সেই কবে থেকে আমাদের জানিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ঊনচল্লিশ বছরের সীমিত জীবনকালে যে বিরামহীন বিড়ম্বনার স্রোত লক্ষ করা যায় তাতে মনে হয় আমাদের এই হতভাগ্য দেশে মানুষের পরম পূজ্যগণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দুঃখের অবতার। দেহাবসানের পরে আমরা বিবেকানন্দকে প্রজ্বলিত সূর্যের সঙ্গে তুলনা করি, নগরে-নগরে সুসজ্জিত সভাগারে তাঁর কীর্তিকাহিনী ঘোষিত হয়, কিন্তু জীবৎকালে সমকালের মানুষের কাছে তিনি কি পেয়েছেন তার পূর্ণ বৃত্তান্ত একত্রিত করলে লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।

মহাজীবনের স্মৃতিপ্রসঙ্গে মহাকাল কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক কিছু ভুলিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা হয়ে যায়, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য হয়ে যাঁরা মর্তে আগমন করেন তাঁরা বুঝি দুন্দুভি বাজিয়ে নেমে আসেন, তাঁরা দেখেন এবং জয় করেন এবং সারা বিশ্ব নতমস্তকে তাঁদের বন্দনা করে ধন্য হতে চায়।

স্বামী বিবেকানন্দর ঊনচল্লিশ বছরের জীবন বড়ই যন্ত্রণাদায়ক—প্রজ্বলিত অঙ্গারের মতন তিনি তিলে-তিলে দগ্ধ হয়ে কেমন করে সময়ের শাসন পেরিয়ে পরবর্তীকালে ভক্তজনের হৃদয়ে প্রজ্বলিত সূর্যের রূপ গ্রহণ করলেন তার পূর্ণ ইতিহাস একদিন নিশ্চয় লিখিত হবে, কিন্তু অস্বীকার করে লাভ নেই, সেই বৃত্তান্ত আজও লিপিবদ্ধ হবার অপেক্ষায় রয়েছে।

একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলে এবং স্বামীজির জীবনের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। সমকাল কতভাবে মানুষটিকে শুধু অবহেলা ও অপমানে জর্জরিত নয়, ক্ষতবিক্ষত করার চেষ্টাও চালিয়েছে! এই বিড়ম্বনায় বিবেকানন্দ নিজে মাঝে মাঝে বিপন্ন বোধ

করলেও, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে তিনি কীভাবে পুরুষোত্তম হয়ে উঠলেন এবং বিশ্বসংসারকে তাঁর যা দেবার তা দিয়ে গেলেন ভাবতে বিস্ময় লাগে। অবহেলা, অবজ্ঞা এবং অপমান ছাড়াও তাঁর জীবনে রয়েছে কত রকমের কুৎসা, কত চরিত্রহননের ষড়যন্ত্র, কত আঘাত যার সুপরিকল্পিত আঘাতে একজন সংবেদনশীল মানুষের তীর্থযাত্রা চিরস্তব্ধ হয়ে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক হত না।

দুর্গমপথের যাত্রী বিবেকানন্দ বিড়ম্বিত হয়েও কেন পরাজিত বিবেকানন্দ হতে রাজি হলেন না? কোন মহাশক্তিবলে উন্নতশির বিবেকানন্দ রূপেই তাঁর মর্তজীবন সাঙ্গ করতে সক্ষম হলেন, তার অনুসন্ধান একাল ও অনাগতকালের মানুষদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিড়ম্বিত বিবেকানন্দের এই অনুসন্ধান শুরু করার আগে একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলাম, এমন ভাবপ্রবণ মানুষ সারাজীবন ধরে কেমন করে এত অপবাদের আঘাত সহ্য করতে সমর্থ হলেন? এই সহ্যশক্তি তিনি কোথা থেকে আহরণ করলেন?

একমাত্র সন্ন্যাসের অধ্যাত্মশক্তি তাঁকে দুর্গমপথে অটল রাখতে পেরেছে বলাটা বোধ হয় সমীচীন হবে না, কারণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হবার অনেক আগে থেকেই তাঁর কপালে জুটতে আরম্ভ করেছে নানাবিধ আঘাত এবং অপমান।

বাল্যবয়সে নরেন্দ্রনাথ একবার তাঁর বাবার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, সংসারে কীভাবে চলা উচিত? পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্ত যে-উত্তরটি দিয়েছিলেন তা পুত্র যে সারা জীবন মনে রেখেছিলেন তার অনেক প্রমাণ ঘরে বাইরে এবং দেশে বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রিয় পুত্রকে বিশ্বনাথ বলেছিলেন, "কখনও কোনো বিষয়ে অবাক হবি না।" অনুসন্ধানীরা এই পিতৃ উপদেশের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে আঘাত-অপমান মানুষকে আহত করতে পারে মানসিক এই হুঁশিয়ারি নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেবের কাছ থেকে।

অতি মূল্যবান দ্বিতীয় উপদেশটি এসেছিল গর্ভধারিণী জননী ভুবনেশ্বরী

দেবীর কাছ থেকে। প্রিয় নরেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন, "খুব শান্ত হবে, কিন্তু আবশ্যক হলে হৃদয় দৃঢ় করবে।" জননী ভুবনেশ্বরী সেই সঙ্গে আরও মারাত্মক কথা বলেছিলেন, "আজীবন পবিত্র থাকবে, নিজের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করবে না।" মায়ের এই নির্দেশ যে তিনি কোনো অবস্থাতেই অমান্য করতে রাজি ছিলেন না তার নানা প্রমাণও বিড়ম্বিত বিবেকানন্দর জীবনে খুঁজে পেতে পারেন যে কেউ।

আজীবন বিড়ম্বিত হওয়ার যে দুঃখ তার শুরু নরেনের স্কুলজীবনে। এই স্কুলটি যে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সুকিয়া স্ট্রিটের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন তা আজ কারও অজানা নয়। এই ইস্কুলের শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন ভূগোল, তাঁর হঠাৎ ধারণা হল নরেন ভুল করেছে, অতএব অবিলম্বে দৈহিক শাস্তি দিলেন। নরেন বারবার বলতে থাকেন, আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি, তাতে শিক্ষকের ক্রোধ গেল আরও বেড়ে, তিনি বালক নরেন্দ্রকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত শুরু করলেন।

"জর্জরিত দেহে নরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরিয়া অশ্রুলোচনে মাতার নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিলে স্নেহময়ী ভুবনেশ্বরী...বিগলিতকণ্ঠে বলিলেন, বাছা যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে এতে কি আসে যায়? ফল যাই হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে, তাই করে যাবে। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় বা অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু সত্য কখনো ছাড়বে না।"

শোনা যায় এই শিক্ষক পরে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু শুনুন একই স্কুলের আরেক মাস্টারের কথা। এই রাগী শিক্ষক একজন ছাত্রকে মারতে-মারতে হঠাৎ নরেনের ওপর চটে উঠলেন এবং তাকেও প্রহার করতে লাগলেন। শিক্ষক ক্রমশই প্রহারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে দু হাতে কান মলতে লাগলেন, পরে কান ধরে উঁচু করে তাঁকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। মেজ ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তর মূল্যবান স্মৃতি অনুযায়ী : "মাস্টার এত জোরে কান ধরিয়া টানিয়াছিল যে শিশুর কান ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং রক্তে চাপকান ইজের ভিজিয়া গিয়াছিল।...নরেন্দ্রনাথ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে

খুব একটা হৈ চৈ পড়িল। বিশ্বনাথ দত্ত ও তারকনাথ (কাকা) মাস্টারকে উকিলের চিঠি দিয়া আদালতে আনিয়া শাস্তি দিবেন...এই রূপ স্থির করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ নিজে মধ্যস্থ হইয়া নালিশ মকদ্দমা রহিত করিল এবং পরদিন যথাসময়ে স্কুলে যাইল। এই শাস্তির কথা বিদ্যাসাগরের কানে গেলে তিনি ছেলেদের মারিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন।

নিজের বেলায় কোনো লড়াইয়ে না নামলেও, ভাই মহেন্দ্রনাথ একবার স্কুলে অকারণে শাস্তি পাওয়ায় নরেন্দ্রনাথ কিন্তু জ্বলে উঠেছিলেন। মহেন্দ্রনাথের কথায় : "প্রকৃতপক্ষে আমি কোন দোষ করি নাই বা দোষের কারণ জানিতাম না। বাড়িতে আসিয়া এই বিষয়ে বলায় নরেন্দ্রনাথ তখনই সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রী ব্রজনাথ দে মহাশয়কে শিক্ষকের বিরুদ্ধে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন, ফলে নূতন শিক্ষকটির চাকুরি হইতে জবাব হইয়া গিয়াছিল।"

ইস্কুলে শুধু ছাত্র হিসেবে নয়, পরবর্তী জীবনে শিক্ষক হিসেবেও আমাদের বিবেকানন্দ যে চূড়ান্ত অপমানের মুখোমুখি হয়েছিলেন তার কথা এখনই সেরে নেওয়া যাক।

বিশ্বনাথের আকস্মিক মৃত্যুর পরে পিতার ডুবন্ত সংসারকে রক্ষা করার জন্য নরেন্দ্রনাথ অফিস পাড়ায় চাকরি খুঁজছেন হন্যে হয়ে। সেকালের কলকাতাতেও সাধারণ চাকরির কী শোচনীয় অবস্থা তার একটি প্রমাণ উমেদার নরেন্দ্রনাথের ব্যর্থ কর্মসন্ধান। কত অফিসে কতবার তিনি আবেদনপত্র হাতে নিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন, সামান্য একজন কেরানির কাজের যোগ্যতাও যে নিয়োগকর্তারা তাঁর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না তা ভাবলে আমাদেব নিজের কালেব দুঃসহ বেকার সমস্যাকে বুঝতে কষ্ট হয় না।

অবশেষে ১৮৮৪ সালের কোনো সময়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের রচয়িতা হেডমাস্টার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তর চেষ্টায় সুকিয়া স্ট্রিটের মেট্রোপলিটান ইস্কুলের মেন ব্রাঞ্চে নরেন্দ্রনাথের কাজ জোটে কয়েকমাসের জন্যে। পরে (জুন ১৮৮৬) চাঁপাতলায় সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনে ইস্কুলের নতুন শাখা খোলার পরে তাঁকে সেখানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হল।

শুনুন পরের ঘটনা স্বামী গম্ভীরানন্দের লেখা থেকে : "তিনি ঐ কার্যে মাত্র একমাস ছিলেন, কারণ শ্রীম-দর্শনের মতে ঐ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগরের জামাতা! তিনি চাহিতেন যে হেডমাস্টার তাঁহার কথামতো চলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ছিল অন্যরূপ।"

সুতরাং উচ্চতম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের দ্বারা বিদ্যাসাগরের নিকট লিখিত অভিযোগ গেল—নতুন হেডমাস্টার পড়াতে পারেন না। "তখন বিদ্যাসাগর বললেন, তাহলে নরেন্দ্রনাথকে বলো—আর না আসে।"

শ্রীম-দর্শন থেকেই শুনুন : "ফার্স্ট ও সেকেন্ড ক্লাশের ছেলেরা লিখল তিনি ভাল পড়াতে পারেন না। বিদ্যেসাগরমশায় আমাকে (শ্রীমকে) বললেন, তাহলে নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে। দরকার হবে না। এই কথা শুনে আমাদের মাথা ঘুরে গেল।"

বিবরণ পড়ে আজও সারা বিশ্বে পাঠকের মাথা ঘোরে, বিশ্বসংসারকে শিক্ষা দেবার জন্য যাঁর অবিস্মরণীয় আবির্ভাব তিনি তাঁর ছাত্রদের এবং স্কুলের মালিকদের হাতে নিগৃহীত হলেন চরমতম অভিযোগে মানবজাতির শিক্ষক বিবেকানন্দ রূপে যিনি কিছুদিনের মধ্যে সারা বিশ্বের বিস্ময় হতে চলেছেন তিনি চাঁপাতলা স্কুলে শিক্ষকতার অযোগ্য!

কথামৃত-কথাকার শ্রীম'র স্মৃতির আলোকে আরও কিছু খবর : "যদি বা বহুকষ্টে একটি কর্ম যোগাড় হল, একি বিপদ আবার উপস্থিত! নরেন্দ্রকে বললাম। এই কথা শুনে নরেন্দ্র বলেছিলেন, কেন ঐরূপ বললে ছেলেরা? আমি তো বাড়ি থেকে খুব তৈরি হয়ে গিয়ে পড়াতাম। আর কিছু বললেন না। না আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন, না অপরকে দোষারোপ করলেন। কোনও কৈফিয়ৎ দিলেন না। তাও অতি শান্তভাবে বললেন এই কথা। নোব্‌ল সোল—মহাপুরুষ।"

সেই সময়ের কলকাতার নিয়োগকর্তারা কর্মহীন বিবেকানন্দর সঙ্গে কী ব্যবহার করেছিলেন তা ভাবলে আজও মাথা নত হয়ে যায়।

শ্রীম'র স্মৃতিসঞ্চয় থেকে আরও একটু উদ্ধৃতি প্রয়োজন : "আর একবার চাকরির জন্যে সিমলের বাড়ি থেকে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত গেলেন একজনের পিছু পিছু, তারপর বললেন, না আপনাকে আর যেতে

হবে না। নোব্‌ল সোল, উমেদারীতে যেতে রাজি নন। উপবাসী নরেন্দ্রনাথ কত রাত কলকাতার রাস্তার পাশের বাড়ির রোয়াকে বসে কাটিয়ে দিয়েছেন ঐ সময়। অত সব দুঃখকষ্ট নিজের জীবনে দেখেছেন, তবেই পরবর্তীকালে সেবাশ্রমগুলি করেছেন। তাই চিরকাল দরিদ্রের উপর দয়াবান ছিলেন। আমেরিকা থেকে আসার পর প্রায়ই বলতেন, যারা দুঃখকষ্টে পড়েনি তারা যে 'বেবিজ্'।"

পিতার দেহাবসানের পরে জীবিকাসন্ধানী নরেন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছেন স্বামী সারদানন্দ। সারদানন্দের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতির আগে বলে রাখি, এই বিবরণকে বিশ্বাস করতে সময় লাগতো যদি না সন্ন্যাসী গবেষক লিখতেন, "এই কালের আলোচনা করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন।" নরেন্দ্রনাথের এই আত্মকথায় বিড়ম্বিত মানুষটিকে ঠিক যেন চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। বহুপঠিত হলেও, এই আত্মকথার কিছু অংশ আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য।

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে আফিস হইতে আফিসান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম—অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ দুঃখের দুঃখী হইয়া কোনো দিন সঙ্গে থাকিত, কোনো দিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু সর্বত্রই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের, দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুই দিন পূর্বে যাহারা আমাকে কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন সংসারটা দানবের রচনা বলিয়া মনে হইত। মনে হয়, এই সময়ে একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠে মনুমেন্টের ছায়ায় বসিয়া

পড়িয়াছিলাম। দুই-একজন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল, অথবা ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজন বোধ হয় আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গাহিয়াছিল—'বহিছে কৃপাঘন ব্রহ্মনিঃশ্বাস পবনে' ইত্যাদি।

"শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত করিতেছে। মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথা মনে উদয় হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়াছিলাম, 'নে, নে, চুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদিগকে কখন সহ্য করিতে হয় নাই, টানাপাখার হাওয়া খাইতে খাইতে তাহাদিগের নিকটে ঐরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও একদিন লাগিত ; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছে।'

"আমার ঐরূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোধ হয় নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল—দারিদ্র্যের কিরূপ কঠোর পেষণে মুখ হইতে ঐ কথা নির্গত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে! প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য নাই এবং হাতে পয়সা নাই, সেদিন মাতাকে 'আমার নিমন্ত্রণ আছে' বলিয়া বাহির হইতাম এবং কোনো দিন সামান্য কিছু খাইয়া, কোনো দিন অনশনে কাটাইয়া দিতাম। অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে ঐকথা প্রকাশ করিতেও পারিতাম না। ধনী বন্ধুগণের অনেকে পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদিগের আনন্দবর্ধনে অনুরোধ করিত। এড়াইতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্বক তাহাদিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না—তাহারাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ-বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। তাহাদিগের মধ্যে বিরল দুই-একজন কখনও কখনও বলিত, 'তোকে আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্বল দেখিতেছি কেন, বল্ দেখি?' একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্যের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে

সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"যৌবনে পদার্পণপূর্বক যে-সকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন করিতেছিল, তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া সময় বুঝিয়া দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হীন পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সত্য সত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই।

"এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্য এক রমণী ঐরূপ প্রলোভিত করিতে আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'বাছা, এই ছাই-ভস্ম শরীরটার তৃপ্তির জন্য এতদিন কত কি তো করিলে, মৃত্যু সম্মুখে—তখনকার সম্বল কিছু করিয়াছি কি? হীন বুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।'

"যাহা হউক এত দুঃখকষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে তাঁহাকে স্মরণ-মননপূর্বক তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যা ত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান—ভগবান তো সব করলেন!'

"কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অ-শিব কোথা হইতে আসিল—

মঙ্গলময়ের রাজত্বে এতপ্রকার অমঙ্গল কেন?

"বিদ্যাসাগর মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়া এক সময় যাহা বলিয়াছিলেন—ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন?—তাহা কঠোর ব্যঙ্গস্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

"গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন তো তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই, একথা হাঁকিয়া-ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি?

"ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয়ে পর্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সকলের নিকটে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দুরদৃষ্টের কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য যদি কেহ মদ্যপান করে, অথবা বেশ্যাগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই তাহাই নহে, কিন্তু ঐরূপ করিয়া আমিও তাহাদিগের ন্যায় ক্ষণিক সুখভোগী হইতে পারি—একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।

"কথা কানে হাঁটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে-ইশারায় জানাইলেন।

"আমাকে তাঁহারা এতদূর হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া দণ্ড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্বলতা, একথা প্রতিপন্নপূর্বক হিউম, বেন, মিল, কোঁতে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে পারিলাম আমার অধঃপতন হইয়াছে, একথায় বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া তাঁহারা বিদায়গ্রহণ করলেন বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও হয়তো ইঁহাদের মুখে শুনিয়া এরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল।

"স্থির করিলাম, তা করুন—মানুষের ভালমন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ, না কিছুই বলেন নাই ; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর!'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন সে কখন ঐরূপ হইতে পারে না ; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখতে পারিব না!'...

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল। এখন পূর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটিতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটির রকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা রং-এর চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পরপর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখি এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন,

ঈশ্বরে কঠোর ন্যায়পরায়ণতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি সেসকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ে স্থির মিমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটি ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।"

পরমহংসের কৃপাধন্য হলেই যে সংসারের সমালোচকরা তাঁদের নির্মম সমালোচনা বন্ধ করে দেবেন একথা ভাববার কোনো অবকাশ নরেন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দর জীবনে নেই। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পর বরাহনগরের এক ভাঙা বাড়িতে রামকৃষ্ণ-শিষ্যদের মধ্যে যে অধ্যাত্মসাধনার সূচনা হয়েছিল একালের ইতিহাসে তা যে অভূতপূর্ব তা পরবর্তীযুগে উচ্চকণ্ঠে স্বীকৃত হলেও, সমকালীন বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্ত হতে পারেননি নরেন্দ্রনাথ, যিনি বিবিদিষানন্দ নামে সন্ন্যাসপথের প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলেন।

বরাহনগর পর্বের তরুণ সংসারত্যাগীদের সুকঠোর জীবনযাত্রা মনকে অবশ্যই নাড়া দেয়, মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্যও মনে হয়। নরেন্দ্রনাথ তখন "অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন,... কি ত্যাগ, কি বৈরাগ্য! কি জপ-ধ্যান, কি অধ্যয়ন, কি তেজস্বী বাণী আর গুরুভাইদের প্রতি কি ভালবাসা!"

রামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে তখন জ্বলন্ত বৈরাগ্য। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তখন প্রকাশে কি বলে বেড়াচ্ছেন তার কিছু নমুনা স্বামীজির ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন। "সাধারণের ভিতরে কথা উঠিল 'নরেনটা পাগল হয়ে গেছে, তার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কি বকে তার মাথামুণ্ড নাই, আবার বলে বেদান্ত অদ্বৈতবাদ...আমরা তো কোনকালে এসব কথা শুনি নাই বাপু, আর শিখেছেন কতকগুলো বচনের

ঝুড়ি। কাজকর্ম করবার নাম নেই, চাকরিবাকরি করবার নামগন্ধ মুখে নেই। এর বাড়ি, ওর বাড়ি পেট ঠেসে আসে, আর কাজের মধ্যে কতকগুলো ছোঁড়া বকিয়েছে। সেগুলোকে নিয়ে কিরকম করছে সব—একটা কর্মনাশার দল করেছে।”

শুধু অচেনা মহলে নয়, ভক্তপরিমণ্ডলে নরেন সম্বন্ধে মন্তব্য, তিনি নাকি শ্রীরামকৃষ্ণকেই মানতেন না। প্রসঙ্গত বলে রাখা যাক, শ্রীরামকৃষ্ণেরও একটা ব্যঙ্গনাম জুটেছিল। পরমহংস না বলে টিটকিরি দেওয়া হত 'গ্রেটগুজ্' বলে।

নরেন সম্বন্ধে গরম গুজব, তিনি রামকৃষ্ণের মুখের ওপর তর্ক করতেন, বড় হামবড়াইয়ের ভাব। পরিব্রাজক জীবনের শুরুর পরেও এইসব বিড়ম্বনার অবসানের কোনো লক্ষণ ছিল না।

লোকে বলছে, “নরেন এখন আবার গুরুগিরি ধরেছে, সে পশ্চিমে গিয়ে চেলা করছে—সন্ন্যাসী করছে। ঠাকুর কি তাকে গুরুগিরি করতে বলেছিলেন? তখন তাঁকেই মানতো না, তাঁর মুখের ওপর তর্ক করত। এখন তো দেখছি স্বয়ং গুরু হয়ে আর একটা দল পাকাচ্ছে।” এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ বরানগর সম্বন্ধে সমকালের মন্তব্য!

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দুর্বিষহ পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছে; লোকেরা যখন উপহাস করছে, নরেন পাগলা হয়ে গেছে, কি বলে, কি কয়, কথার মাথামুণ্ডু নেই, তখন বরানগরে নরেন্দ্রনাথের জীবনে মহাকষ্ট—“অনাহার, অনিদ্রা, সকলেই বিবস্ত্র, বিকট, মলিন, পাংশুগুণ্ঠিত এবং রাত্রে শয়ন ধরণীতলে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন অন্নাভাবে কাতর ও নিরাশ্রয়। জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা।”

মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জনৈক বন্ধুর সেই সময়কার একটি উক্তি ভাবীকালকে উপহার দিয়েছেন: “তাইত হে, নরেন্দ্রনাথ পাগল হয়ে বেরিয়ে গেল। এমন গানটা মাটি করে গেল ; এত বছর গানটা শিখে গলা সেধে সব মাঠে মারা গেল।”

গায়ে ধুলো কাদা মাখা, বড় বড় নখ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া উড়ি খুড়ি চুল, তাতে কত ধুলো কাদা রয়েছে, কোনো হুঁশ নেই, কোনো লক্ষ্য নেই,

এই হচ্ছে তখনকার নরেন্দ্রনাথের পরিচিতমহলের ভাবমূর্তি।

শুধু মুখের নিন্দা এবং কুৎসা নয়, আমরা এখন ভালভাবেই জানি যে নরেন্দ্রনাথকে বরাহনগরে খুন করার চেষ্টাও হয়েছিল। বরাহনগরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং অনাহারে নরেন্দ্রনাথ প্রায়ই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

১৮৮৭ সালে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নরেনের টাইফয়েড এমনই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে জননী ভুবনেশ্বরী তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে বরাহ্নগরের ভাড়াটে বাড়িতে ছুটে এলেন। বড্ড গায়ের জ্বালা, একসময় গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দ নাড়ির গতি খারাপ দেখে কেঁদে উঠলেন। মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "কাঁদিসনি, আমি এখন মরব না, তুই ভয় করিসনি। আমাকে ঢের কাজ করতে হবে, আমি কাজগুলো যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমার মরবার সময় নেই।"

কিন্তু রোগ ছাড়াও মৃত্যু তখন অন্যপথে তার অভীষ্ট সিদ্ধ করার চেষ্টায় রয়েছে। সেদিন ছিল রবিবার। সকাল দশটা-সাড়ে দশটার দু'জন ভাড়া করা গুণ্ডা নিয়ে একজন লোক বরাহ্নগরের মঠে ঢুকলো। তার এক আত্মীয় বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, তার সন্দেহ নরেন দত্ত আত্মীয়টিকে ছাড়পত্তর দিয়েছে। আগন্তুকটি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গালমন্দ করছে। লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শী নিরঞ্জন মহারাজ সেদিন বাধা না দিলে অসুস্থ নরেন্দ্রনাথের কি হত কে জানে। নিরঞ্জন মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ।

শুধু প্রাণের আশঙ্কা নয়, মহেন্দ্রনাথ দত্ত বরাহনগর মঠের সন্ন্যাসীদের অন্য প্রলোভনের একটি মনোগ্রাহী ছবি উপহার দিয়েছেন। "খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকরা খবর পেল যে বরাহনগরে কতকগুলি যুবক একটি বাড়িতে থাকে, বিবাহ করে নাই এবং বেশ ঈশ্বরানুরাগী।" যুবক সন্ন্যাসীদের নিজধর্মে টানবার জন্য প্রচারকরা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে লাগলো 'অনেক যুবতী মেম এসেছে, তাহাদের সহিত বিবাহ করাইয়া দিব, তোমরা খৃষ্টান হও,' রাগে অগ্নিশর্মা তরুণ সন্ন্যাসীগণ তাদের প্রতি এতই বিরক্তি প্রকাশ করলেন যে বরাহনগর বাজারে প্রচারকরা যে আড্ডাটি খুলেছিল তা বন্ধ

হয়ে গেল।

আমাদের আলোচনার বিষয়টি বড়ই সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে। রসিক চূড়ামণি বিবেকানন্দ এই সর্বদাগম্ভীর ভাব মোটেই বরদাস্ত করতেন না। পরিব্রাজক জীবনে একবার গাজীপুরে পওহারী বাবার দর্শন করতে গিয়ে স্বামীজির সঙ্গে ব্রাহ্মপ্রচারক অমৃতলাল বসুর সাক্ষাৎ হয়। অমৃতলাল সত্যিই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করেন কিনা জানবার জন্যে নরেন্দ্রনাথ সেবার কপট রামকৃষ্ণ নিন্দা আরম্ভ করলেন : "কি একটা লোক ছিল : পুতুল পুজো করতো আর থেকে থেকে ভিরমি যেত, তাতে আবার ছিল কি।"

ফাঁদে পা দিলেন অমৃতলাল, বেশ চটে গিয়ে বললেন, "নরেন, তোমার মুখে এমন কথা! পরমহংসমশাই তোমাকে কত সন্দেশ খাওয়াতেন, কত ভালবাসতেন, আর তুমি অবজ্ঞা করে কথা কইছো?"

সুরসিক নরেন্দ্রনাথ এবার পরমহংসের প্রতি আরও কটূক্তি করলেন, তখন অমৃতলাল রেগে গিয়ে বললেন, "যাও তোমার সঙ্গে কথা কইতে নেই," তারপর জায়গা ছেড়ে উঠে গেলেন।

উঠে যাবার পরে নরেন্দ্রনাথের মন্তব্য "লোকটির ভিতর পরমহংস মশায়ের প্রতি যে এরকম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল তা আমরা জানতাম না।"

অমৃতলালের রাগ অনেকদিন ছিল, অনেকদিন পরে তাঁর ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ বসু স্বামীজির কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, অমৃতলাল বসু বলেন, "কি হে সুরেন, গুরু কি আর খুঁজে পেলে না, শেষকালে একটি কায়েত ছোঁড়ার কাছে সন্ন্যাস নিলে।"

কায়স্থ সন্ন্যাসী এই সুবাদে স্বামীজি যে ঘরে-বাইরে কতবার বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত হয়েছেন তার কয়েকটি নমুনা এখনই দিয়ে দেওয়া বোধ হয় মন্দ হবে না। এই বিড়ম্বনা সন্ন্যাসজীবনের শুরু থেকে তাঁর মৃত্যুর বহুবছর পরেও এমনভাবে জীবিত ছিল যে বিশ্বাস হয় না বিবেকানন্দ বিংশ শতকেও বসবাস করেছিলেন।

শিকাগো ধর্মসভায় অপ্রত্যাশিতভাবে বক্তৃতার সুযোগ পাওয়া ও সভায় অবিশ্বাস্য সাফল্যের পরে স্বার্থপররা প্রচার শুরু করে যে নিজের দেশেই লোকটি ভ্যাগাবন্ড, কোথাও কোনো খুঁটি নেই। এই অবস্থায় স্বদেশের কিছু

সমর্থন তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয়।

স্বদেশ থেকে তিনি কোনো নিদর্শন পত্র নিয়ে আসেন নি, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করছে তাঁদের সামনে "আমি যে জুয়াচোর নই তা কি করে প্রমাণ করবো?"

বিবেকানন্দর আশা ছিল মাদ্রাজ ও কলকাতায় কতকগুলি ভদ্রলোক জড়ো করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা হবে এবং প্রস্তাবগুলি আমেরিকায় পৌঁছবে। "কিন্তু এখন দেখছি ভারতের পক্ষে এ কাজটি বড় গুরুতর ও কঠিন। এক বৎসরের ভিতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলো না—আর এখানে সকলে আমার বিপক্ষে।"

গুরুভাই শশীমহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) ও কালীবেদান্তী (স্বামী অভেদানন্দ) উঠে পড়ে লাগলেন কলকাতায় কিছু একটা করবার জন্য। সভাপতি নির্বাচনের জন্য তাঁরা মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গেলেন।

এরপর শুনুন সেই সাক্ষাতের বর্ণনা : "প্রথম হইতেই স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহহীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়। পরে তিনি বলেন যে, কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গুরুদত্ত নহে, শাস্ত্রমতে শূদ্রের সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার আছে কিনা এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে এবং সন্ন্যাসী হইয়াও ম্লেচ্ছদেশে গমনেও বিশেষ প্রত্যবায় আছে ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন।" যেসব কাজে সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে সেসব কাজের ভিতর আর স্যার গুরুদাস যেতে চান না।

"নগেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি যে ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার দোষ দিলেন কিন্তু আপনি তো শুদ্ধ আচারী ব্রাহ্মণ হইয়াও চিরকাল ম্লেচ্ছের চাকরি করিলেন, এতে যে শাস্ত্রে তুষানলের ব্যবস্থা রহিয়াছে', এই বলিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া আসেন।"

এই দ্বন্দ্বের অবসান যে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দর মহাপ্রয়াণের পরেও শেষ হয়নি তার ইঙ্গিতও রয়েছে স্বামীজির কনিষ্ঠভ্রাতার রচনায়।

"স্বামীজির স্মৃতিসভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানানো হয় দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে, একজন ব্রাহ্মণ এবং অপরজন কায়স্থ। এঁরা স্বামীজির প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বিচারপতিটি বলেছিলেন, দেশে হিন্দু রাজার শাসন থাকলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। আর বিচারপতিটিও স্বামীজির তীব্র নিন্দাবাদ করেছিলেন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি একসময়ে প্রস্তাব করেছিলেন যে ব্রিটিশ রাজপরিবারের কোন সদস্য যেন ভারতে এসে শ্বেতাঙ্গ রাজন্যবর্গের সহায়তায় নৃপতি হিসেবে দেশ শাসন করেন। এবিষয়ে কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সংযোজন : "বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র একবার সংবাদপত্রে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। স্বামীজির মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করবার জন্যে অনুরোধ করা হ'লে তিনি স্বামীজিকে নিন্দাবাদ ও সমালোচনা করেছিলেন।"

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর জীবনকথায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখেছেন, "প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা-জপাদি করিতেন। তাহা ছাড়া শুনিয়াছি—প্রাচীনপন্থী-ব্রাহ্মণ্যধর্মকে তিনি অত্যন্ত সম্মানের আসন দিতেন। সেইজন্য তথাকথিত শূদ্র কুলোৎপন্ন দত্তবংশীয় নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।"

আমেরিকা থেকে নরেন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়েছিলেন, "তোমরা কলিকাতায় একটি সাধারণসভার আয়োজন করিয়া আমার কার্যাবলীর সমর্থন ও সঙ্গে সঙ্গে আমি যে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি এই উল্লেখ করিয়া...একটি পত্র প্রেরণ কর।"

স্বামী অভেদানন্দ তখন আহার নিদ্রা ভুলে বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে গিয়ে সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। একজন বিশিষ্ট মাড়ওয়ারি নাগরিকের কাছে গেলে তিনি বললেন, "বাবুজি, হিন্দু হইয়া যাহারা বিলেত গমন করে তাহারা তো ভ্রষ্টাচারী। তাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ রাখা উচিত হইবে কি?"

মনোমোহনবাবু মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীদের সহিত বিশেষভাবে

মেলামেশা করতেন, সুতরাং তাঁদের প্রকৃতি ভালভাবেই জানতেন। "তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন : 'শেঠজি, আপকা নাম তো কমিটিমে চড় গিয়া।' এই কথা শুনিবামাত্র মাড়ওয়ারী-ভদ্রলোকের মুখে আর কোনো কথা নাই।"

শেষ পর্যন্ত উত্তরপাড়ার রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করতে রাজি হন, কিন্তু তিনিও "স্বামী বিবেকানন্দ কথাটিকে আপত্তি করিয়া 'ব্রাদার বিবেকানন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন, কারণ কায়স্থ সন্ন্যাসী হইতে পারে কিনা এবিষয়ে তখনও তাঁহার সন্দেহ ছিল।"

শিকাগোর ঐতিহাসিক ধর্মসভায় আরও একজন বিশিষ্ট বাঙালি যে উপস্থিত ছিলেন তা আজ প্রায় কারও মনে নেই। ইনি বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, উত্তর কলকাতায় বসবাসকালে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন, একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বইও লিখেছিলেন, যে বইটি স্বামীজি আমেরিকায় চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। এই প্রতাপ মজুমদারই যে কেন প্রবলভাবে চটে উঠে স্বামীজির নিন্দায় মেতে উঠলেন তা নিয়ে বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান হয়েছে।

আমরা কেবল মহেন্দ্রনাথ দত্তর রচনা থেকে কিছু খবর উদ্ধৃত করবো। "প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, নরেন, সেই ছোঁড়াটা, যে ভ্যাগাবন্ডের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াত, সে এক লম্বা জামা পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চিকাগো পার্লামেন্টে তো গিয়ে হাজির। সে আবার লেকচার করতে উঠলে, আবার বেদান্তর উপর কথা কয়, মায়াবাদ—সে সব অযৌক্তিক কথা, আর পৌত্তলিক ধর্ম সমর্থন করে। এসব জিনিস কি এযুগে আর চলে। যত সব বাজে জিনিস। ছোঁড়া এমনি অসভ্য রমণীদের সম্মুখে বসিয়াই চুরুট টানিতে লাগিল। আর কি লেকচার করে তার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই, হাউড়ের মতন যত সব আবোল তাবোল বকে।"

এই নিন্দায় যে ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল তা স্বামীজির পত্রাবলী থেকে আমরা দেখবো। কিন্তু সব খারাপ জিনিসেরই একটা ভাল দিক থাকে। বিখ্যাত ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মশায়ের

নিকট-কুটুম্ব নরেন্দ্রনাথ সেন রেগে উঠে মুখ ছুটিয়ে গালি দিতে লাগলেন নিজের আত্মীয়কে। মহেন্দ্রনাথ সবিস্তারে লিখেছেন সেইসব প্রতিবাদের কথা : "দেখ দেখি একটা বাঙালির ছেলে নিঃসম্বল, বিদেশ ভূমিতে গিয়ে নিজের দেশের জন্য, নিজের জাতের জন্য, নিজের ধর্মের জন্য লড়াই করছে, আর কি করে বিদেশির কাছে এদেশের একটুমাত্র সম্মান হয় তার চেষ্টা কচ্ছে, আর এই এক বুড়ো মিন্‌সে কোথা তাকে সেখানে তার হয়ে দুটো কথা বলবে না তার নিন্দাবাদ করে কিসে তার অনিষ্ট হয় তার চেষ্টা কচ্ছে।"

বিবেকানন্দের বিড়ম্বনার ক্ষেত্র প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন স্তরে কিরকম ষড়যন্ত্র চলেছিল তার প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে নানা জায়গায়। অধ্যাপক এন ঘোষের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় বিবেকানন্দকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে একটা বড় প্রবন্ধ বেরুলো। অবাক কাণ্ড। তারপর সম্পাদক স্বীকার করলেন, "মাদ্রাজ হইতে কে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দেয়, অনবধানবশতঃ সেটা বিশেষ না পড়িয়াই সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই ভুলের জন্য তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন।"

প্রবল নিন্দার পরিবেশেও ধৈর্যশীল স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করতেন। এই নীতির ফল যে সুদূরপ্রসারী তা বিবেকানন্দ অনুসন্ধানীরা পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন। কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা হচ্ছে দেখলে অনেকসময় সাধারণ মানুষের সহানুভূতি নিগৃহীত মানুষটির দিকেই চলে যায়, নিন্দুক বিন্দুমাত্র লাভবান হন না। তার কয়েকটি নিদর্শন প্রখ্যাত প্রতাপ মজুমদারের ব্যবহার ও অপপ্রচার থেকে দেওয়া যেতে পারে।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ আমেরিকা থেকে বিবেকানন্দ তাঁর বন্ধু মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে এক দুর্ধর্ষ চিঠি লেখেন। বিবেকানন্দর নিজের ভাষাতেই শুনুন মজুমদার নিন্দার ফলাফল : "কত আগ্রহ এদের। দেশশুদ্ধ লোক আমাকে জানে, পাদ্রীরা বড়ই চটা। সকলে নয় অবশ্যি, এদের লার্নেড পাদ্রীর মধ্যে অনেকে আমার চেলা আছে। মূর্খ-গোঁয়ারগুলো কিছু

বোঝে সোঝে না হাঙ্গামা করে। তাতে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারে। মজুমদার আমায় গাল পেড়ে তাঁর যেটুকু এদেশে পসার ছিল তার তিন ভাগ খুইয়েছেন। আমি হচ্ছি এদের পুষ্যি—আমায় গাল দিলে মেয়ে-মহলে তার নামে ধিক্কার পড়ে যায়।" এই চিঠিটায় বন্ধুর কাছে অনুরোধ আছে, "চিঠিটা ফাঁস করবেন না—বুঝতে পেরেছেন—আমায় এখন প্রত্যেক কথাটি হুঁসিয়ার হয়ে কইতে হয়—পাবলিক ম্যান—সব বেটারা ওৎ পেতে থাকে।"

নিন্দা সম্পর্কে স্বামীজির সুচিন্তিত নীতি কি তা তিনি নিজেই আলাসিঙ্গাকে লেখা এক চিঠিতে (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) বিশ্লেষণ করেছেন। "আমার বন্ধুগণকে বলবে যাঁরা আমার নিন্দাবাদ করছেন, তাঁদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাটকেল মারতে যাই, তবে তো আমি তাদের সঙ্গে একদরের হয়ে পড়লুম। তাদের বলবে—সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, আমার জন্যে তাদের কারও সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না। আমার বন্ধুদের এখনও ঢের শিখতে হবে, তারা তো এখনও শিশুতুল্য।...সাধারণের সঙ্গে জড়িত এই বাজে জীবনে এবং খবরের কাগজের হুজুগে আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।"

নিন্দায় অবিচলিত থাকার সংকল্প গ্রহণ করলেও স্বামীজি একটি বিষয়ে বিচলিত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে চারিত্রিক নিন্দা ছড়াচ্ছেন তা তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছলে কি হবে? এই সময়ে তাঁর একটি করুণ চিঠি : "আমার বুড়ি-মা এখনও বেঁচে আছেন, সারাজীবন তিনি অসীম কষ্ট পেয়েছেন, সেসব সত্ত্বেও মানুষ আর ভগবানের সেবায় আমাকে উৎসর্গ করার বেদনা তিনি সহ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে ভালবাসা যে ছেলেটিকে তিনি দান করেছেন, সে দূরদেশে গিয়ে—কলকাতার মজুমদার যেমন রটাচ্ছে—জঘন্য নোংরা জীবনযাপন করছে, এ সংবাদ তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবে।"

চরিত্রহননের অপচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে শিকাগো থেকে অধ্যাপক

রাইটকে (২৪মে ১৮৯৪) স্বামীজি লেখেন, "আমি যে যথার্থই সন্ন্যাসী, এ-বিষয়ে সর্বপ্রকারে আপনাকে আশ্বস্ত করতে আমি দায়বদ্ধ। কিন্তু সে কেবল 'আপনাকেই'। বাকি নিকৃষ্ট লোকরা কি বলে না বলে, আমি তার পরোয়া করি না। 'কেউ তোমাকে বলবে সাধু, কেউ বলবে চণ্ডাল, কেউ বলবে উন্মাদ, কেউ বলবে দানব, কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের পথ চলে যাও'—এই কথা বলেছিলেন বার্ধক্যে সন্ন্যাসগ্রহণকারী রাজা ভর্তৃহরি—ভারতের একজন প্রাচীন সম্রাট ও মহান সন্ন্যাসী।"

শিকাগোর অভাবনীয় সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মজুমদার সম্বন্ধে পাঠকের মনে যেসব কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক তার কিছুটা মহেন্দ্রবাবুর জবানিতে বলে রাখা যায়। প্রতাপ মজুমদার কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেনের সমাজে ও রামকৃষ্ণদেবের কাছে এসেছিলেন, তাঁকে চিনতেন। "তাঁর ধারণা ছিল যে স্বামীজি একটা কলকাতার গাইয়ে, ডেঁপো ছোঁড়া, পরে সন্ন্যাসী হইয়াছে, পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ভিক্ষা করিয়া খায়। লেখাপড়া বা ভদ্র আচার ব্যবহার কিছুই জানে না, মোটকথা একটি ভ্যাগাবন্ড ছোঁড়া।"

আমেরিকায় ধর্মসভায় এসে প্রতাপচন্দ্রের "আর্থিক অবস্থা তখন তত সচ্ছল ছিল না, তাহার উপর তিনি বৃদ্ধও হইয়াছিলেন। এই সময় এক বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুধর্মের উপর বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজিকে নির্বাচন করেন। যে চারটি বক্তৃতা দিতে হইবে, প্রত্যেক বক্তৃতার জন্য ১০০০ টাকা সম্মানমূল্যে। স্বামীজি অর্থ লইবেন না এইজন্যে নিজে এই বক্তৃতার ভার গ্রহণ না করিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া দেন। প্রতাপচন্দ্র সেই চারটি বক্তৃতা দিয়া চারি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।"

ফল হল প্রতাপ শুরু করলেন কুৎসা—"ছোঁড়াটা রাস্তায় ভিক্ষে করে খায়, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বোধ হয় কোন বিপদে পড়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।" প্রতাপের নিন্দা সম্বন্ধে স্বামীজি তখনও নিশ্চিন্ত—"করুকগে, আমরা রামকৃষ্ণের তনয়। করিয়াই বা কি করিবে? মহাশক্তির প্রভাবে তৃণবৎ সব উড়িয়া যাইবে।"

প্রবাসে গোঁড়া পাদ্রিদের বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধেও স্বামীজির একই নীতি। কত কুৎসা কাগজে প্রচার হল। স্বামীজি তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতাম না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য হয় না ; তাই ওইসকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। কি জানিস বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারী। ঠিক সৎ, সাহসী, জ্ঞানী কি এসব দুনিয়াদারীতে ভোলে রে বাপ। জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে ও কি বলছে এসব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোনো মহৎ কাজ করা যায় না।"

সন্দেহ এবং বিরুদ্ধাচরণ শুধু বাইরে নয়, ঘরেও। আমেরিকায় যাবার ব্যাপারটা গোপন রাখবার জন্য স্বামীজি বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ও স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন।

এর কারণ নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছে। "কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিলেন যে সেখানে ইংরাজিতে কথা কহিতে হয় ও ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে হয়, স্বামীজি তো এ সব কিছু জানেন না, তবে যাইয়া কি করিবেন। কেহ কেহ আপত্তি তুলিলেন যে সেখানে অপরের সহিত আহার করিতে হইবে, সাধু বা হিন্দুর পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? কেহ কেহ বলিল, হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা তো নিষেধ তবে স্বামীজি কি করিয়া যাইতে পারেন? একজনের এক ভীষণ আপত্তি উঠিল এবং তিনি মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, আমেরিকা ঠাণ্ডা দেশ, সাহেবদের দেশ, সেখানে ইজের পরিতে হয়, স্বামীজি গেরুয়া পরেন, তিনি কি করিয়া ইজের পরিবেন এবং গেরুয়া কাপড় পরিত্যাগ করিয়া অন্য রঙের কাপড় কি করিয়া পরিবেন?...তখনকার কলিকাতার সমাজে এই সকল কথা অতি ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

ঘরের ভিতরের কিছু-কিছু খবর মহেন্দ্রনাথ ইত্যাদি কয়েকজনের স্মৃতিচারণে ধরা পড়েছে। "স্বামীজির চিকাগোর সংবাদ প্রকাশে আলমবাজার মঠে মহাগণ্ডগোল উঠিল। বলরামবাবুর (বসু) বাড়িতে সন্ধ্যার সময় যখন বক্তৃতাটি একজন পড়িতে লাগিলেন এবং অপর সকলে

বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, তখন জনকয়েক ব্যক্তি বিশেষত তাহার ভিতর একজন হস্ত প্রসারণ করিয়া নানা ভাব-ভঙ্গি করিয়া অতি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। নানারকম করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বক্তৃতা হইতে একটু একটু উদ্ধৃত করিয়া অবজ্ঞা করিয়া নানাপ্রকার ব্যঙ্গ ও কুৎসা করিতে লাগিলেন।"

আরও বিস্ময়কর প্রিয় গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দ হঠাৎ বেজায় চটে উঠলেন। পরে অবশ্য সব বুঝে ভুলের অবসান ঘটেছিল। কিন্তু আলমবাজারে গোড়ার দিককার অবস্থা উদ্বেগজনক। স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) বলতে লাগলেন, "নরেনটা অহংকারে ফুলে উঠেছে, নিজের নাম জাহির করছে, নিজে নাম কিনবার জন্য মহা হুড়াহুড়ি, চেলা করে নিজে এক বড়লোক মহান্ত হবে। ওটা অহংকারে মট্‌মট্ করে, এমনি অহংকার যে তার বক্তৃতায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামটা পর্যন্ত উল্লেখ করল না—শুধু নিজের নাম জাহির করছেন। আর প্রথম থেকেই জানা আছে ওটা তাঁকে কখনই মানতো না। মুখের ওপর তর্ক ও জবাব করতো। কেবল নিজের নাম জাহির করা আর নিজের মত প্রচার করা এইটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য।"

মহেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি অনুযায়ী : প্রেমানন্দ "সেইসময় যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আলমবাজার মঠে এবং কলিকাতায় আসিয়া তিনি সকল ভক্তের বাড়ি যাইয়া কুৎসা, নিন্দা ও গালি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।...বাবুরাম মহারাজের ব্যাপার দেখিয়া গিরিশবাবু (ঘোষ) একদিন বললেন, বাবুরাম কচ্ছে কি! ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

স্বামীজির অন্য গুরুভাইরা ক্রমশ তাঁকে আয়ত্তে আনবার জন্য মাঝে মাঝে বকুনি দিতে শুরু করলেন। স্বামীজির সবচেয়ে বিশ্বাসের মানুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই সময়ে যে রস রসিকতা করতেন তা জেনে রাখা মন্দ নয়। গালাগালি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্বামী প্রেমানন্দ যখন চুপ করে যেতেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে উসকে দেবার জন্য বলতেন, 'ও বাবুরাম, শুনেছ আর এক খবর কি এসেছে। নরেন সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে তো খাচ্ছেই আবার সে কি বলছে জান? খুব টাকাওয়ালা একটা বড় মানুষ মেমকে বে করে সেখানে সে বাস করবে আর এদেশে সে আসবে না, তোমাদের সঙ্গে সে আর দেখা করবে না।"

সাময়িক পাগলামো এতখানি গড়িয়েছিল যে বাবুরাম মহারাজ ও স্বামীজির সহপাঠী হরমোহন মিত্র একটা বিবেকানন্দ বিরোধী পুস্তিকা ছাপিয়ে বিডন উদ্যানে এবং অন্যত্র বিতরণ শুরু করেছিলেন। অপর গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ পুস্তিকাটি দেখে বিরক্ত হয়ে প্রেমানন্দকে বললেন, "কি বাবুরাম, নরেন বুঝি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তাই বুঝি টেনে টুনে খোঁটায় এনে বাঁধছ!"

শিকাগো সাফল্যের পরবর্তী পর্যায়কে যদি খ্যাতির বিড়ম্বনা বলে স্বাভাবিক মনে হয় তাহলে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন, অখ্যাত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হিসেবে বিবেকানন্দ যখন ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনও তিনি অপরের অকারণ নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাননি।

বিদেশে যাবার আগে বিহারের কোনো অঞ্চলে ব্যাপারটি ঘটে। অতি প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করে স্বামীজি গ্র্যান্ডট্রাংক রোড ধরে হেঁটে চলেছেন, প্রত্যাশা কেউ ভিক্ষাগ্রহণের জন্য সন্ন্যাসীকে আহ্বান করবেন। এমন সময় শুনলেন, কে যেন তাঁকে পিছন থেকে ডাকছে। স্বামীজি "ফিরিয়া দেখিলেন অশ্বারোহী এক পুলিশ কর্মচারী তাঁহার দিকে আসিতেছেন। কর্মচারী কর্কশস্বরে তাঁহার পরিচয় চাহিলে তিনি বলিলেন, 'দেখছেনই তো খাঁ সাহেব, আমি সাধু।' 'সব সাধুই বদমাস, আমার সঙ্গে চলে এসো, তোমার শ্রীঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' 'কত দিনের জন্য?' মৃদুভাবে প্রশ্ন করলেন স্বামীজি। উত্তর এল, দু-সপ্তাহে হতে পারে, একমাসও হতে পারে।

স্বামীজি আরও কাছে গিয়ে অনুনয়কারে বললেন, 'শুধু একমাস খাঁ সাঁহেব? ছ'মাসের ব্যবস্থা করতে পারেন না, অন্তত তিন-চার মাস?' অদ্ভুত আবদার, কর্মচারীর মেজাজ নরম হল, তিনি বললেন, 'এক মাসের বেশি দিন থাকতে চাও কেন?' স্বামীজি পূর্বেরই ন্যায় ধীরভাবে বললেন, 'কারাজীবন এর চেয়ে অনেক সহজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই অবিরাম হাঁটার তুলনায় দিনের পরিশ্রম কিছুই নয়। ভোজনই পাই না রোজ, আর উপোস থাকতে হয় প্রায়। জেলে দু-বেলা পেটভরে খেতে

পাব! আপনি যদি আমায় বেশ কয়েকমাস জেলে পুরে রাখেন তো সত্যি উপকার হয়।' শুনতে শুনতে খাঁ সাহেবের মুখ নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে ভরে উঠল, তিনি হঠাৎ স্বামীজির প্রতি আদেশ দিলেন 'ভাগো।'

পথের বিপদ ঘরছাড়া সন্ন্যাসীকে কিন্তু ঘরে ফেরাতে পারে না। পথই তো তাঁর ঘর। কতবার কতভাবে তিনি ট্রেনে চড়েছেন অজানার সন্ধানে তার একটা নির্ভরযোগ্য বিবরণী ভারতীয় রেলপথের পরিচালকরা তৈরি করলে তা আমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর জোগাতে পারতো। আমরা জানি পরিব্রাজককালেই স্বামীজি পেটের অসুখের রোগী হয়েছিলেন। এই পেটের অসুখের তাড়নাতেই তিনি আমেরিকায় যাবার সময় ডেকের যাত্রী হবার ঝুঁকি নিতে পারেন নি। ডেকের টিকিটের অর্থ সংগৃহীত হবার পরও খেতড়ির মহারাজা সমস্যাটা বুঝে তাঁকে উচ্চ শ্রেণীর টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজির পেটের অবস্থা কতখানি শোচনীয় ছিল তার সমর্থন রয়েছে এস এস পেনিনসুলার জাহাজ থেকে খেতড়ি নরেশ অজিত সিংকে লেখা চিঠি থেকে। রাজাসাহেবকে স্বামীজি লিখছেন, "আগে দিনেতে লোটা হাতে করে ২৫ বার পাইখানা যেতে হতো, কিন্তু জাহাজে আসা অবধি পেটটা বেশ ভাল হয়ে গেছে, অতবার আর পায়খানায় যেতে হয় না।"

শরীরের এই অবস্থা হলে যে কোনো যাত্রীর পক্ষে রেলের থার্ড ক্লাশ খুবই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বিষয়েও তাঁর ভাগ্যে নিন্দা জুটেছে, সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ভোগবিলাসী, তাই ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রা পছন্দ করেন। এদেশে একসময় সাধু-সন্ন্যাসীরা ছিলেন বিনাটিকিটের যাত্রী, কিন্তু স্বামীজির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ঘটনার উল্লেখ তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পাইনি। বরং দেখা যাচ্ছে, তিনি কোনো শুভানুধ্যায়ীকে পেলে তাঁকে তাঁর পরবর্তী গন্তব্যস্থানের টিকিটটা কাটতে অনুমতি দিতেন, কিন্তু তার বেশি নয়, অর্থাৎ সন্ন্যাসী কপর্দক শূন্য অবস্থায় সব সময় অজানার অনুসন্ধানে চলেছেন।

বিনা টিকিটের যাত্রী না হয়েও ভারতীয় রেলের কামরায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দর মতন মহামানব কিন্তু কয়েকবার নিগৃহীত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর ও পিতৃদেবের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা বহুদিন পরে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, যার থেকে প্রমাণ হয় পথের অবমাননা সহজে স্মৃতি থেকে মুছে যায় না। স্বামীদির ক্ষেত্রে তিনি সবসময় নীরব, সৌভাগ্যক্রমে বেশ কয়েকটি বিড়ম্বনার ঘটনা তাঁর বিশ্বস্ত জীবনীকাররা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা দু'একটি ঘটনার দিকে তাকাতে পারি—দেখা যাবে রেলের অপমান কখনও আসে দুর্বিনীত সহযাত্রীদের কাছ্ থেকে এবং কোথাও সভ্যতাহীন দাম্ভিক কর্মীদের কাছ্ থেকে।

বিবেকানন্দ জীবনীকার স্বীকার করেছেনও ঘটনার স্থান ও কাল সঠিক জানা নেই। "রাজস্থানের মধ্যে একবার ট্রেনে যাইবার কালে তাঁহার কামরাতে দুইজন ইংরেজ সহযাত্রী ছিলেন ইঁহারা। ভাবিলেন, স্বামীজি একজন ফকির মাত্র ; অতএব ইংরেজীতে অপমান করিতে-করিতে তাঁহার প্রসঙ্গ তুলিয়া হাসিঠাট্টায় মাতিয়া গেলেন। স্বামীজি যেন কিছুই বুঝিতেছেন না এমনিভাবে নীরবে অম্লানবদনে বসিয়া রহিলেন। একটু করে ট্রেনটি একটি স্টেশনে থামিলে স্বামীজি স্টেশনমাস্টারের নিকট ইংরেজীতে একগ্লাশ জল চাহিলেন, সহযাত্রী দুইজন দেখিলেন যে স্বামীজি তাঁহাদের ভাষা জানেন, তখন বিশেষ লজ্জিত ও আশ্চার্যান্বিত হইয়া স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সব বুঝিয়াও কেমন করিয়া বিন্দুমাত্র ক্রোধ না দেখাইয়া বসিয়া ছিলেন? উত্তরে স্বামীজি বলিলেন, 'দেখুন বন্ধুগণ, আপনাদের সংস্পর্শে আসা তো আমার জীবনে এই নয়।' ইহাতে সহযাত্রীদের ক্রোধ হইল নিশ্চয়, কিন্তু স্বামীজির তেজপূর্ণ সুগঠিত চেহারা দর্শনে তাহারা ক্রোধ চাপিয়া বরং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।"

পরের ঘটনাটি আবু স্টেশনে। যুগনায়ক বিবেকানন্দর পূজ্যপাদ লেখক স্বামী গম্ভীরানন্দ এই অপ্রীতিকর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : "স্বামীজির সহিত গাড়িতে বসিয়া স্বামীজির ভক্ত এক বাঙালি ভদ্রলোক আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় এক শ্বেতাঙ্গ টিকিট পরীক্ষক আসিয়া ভদ্রলোককে নামিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক নিজেও রেলকর্মচারী ছিলেন, তাই উহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, প্রত্যুত সাহেবের সহিত বচসায় প্রবৃত্ত হইলেন। অগত্যা স্বামীজি, উহা থামাইতে সচেষ্ট

হইলে সাহেব আরও চটিয়া গিয়া রূঢ় ভাষায় বলিলেন, 'তুম কাহে বাত করতে হো?' সামান্য সন্ন্যাসী ভাবিয়া এক ধমকে থামাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই সাহেব হিন্দির সাহায্য লইয়াছিলেন ; কিন্তু স্বামীজি যখন ইংরেজিতে গর্জিয়া উঠিলেন, তুম তুম করছ কাকে? উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে কি করে কথা বলতে হয় জান না? আপ বলতে পার না?

"তখন টিকিট পরীক্ষক সাহেব বেগতিক দেখিয়া বলিলেন, 'অন্যায় হয়েছে, আমি হিন্দি ভাষাটা ভাল জানি না। আমি শুধু ও লোকটাকে (ফেলো)—' স্বামীজির আর সহ্য হইল না। কথা শেষ করিতে না দিয়াই তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি এই বললে হিন্দি ভাষা জান না, এখন দেখছি তুমি নিজের ভাষাও জান না। 'লোকটা কি?' 'ভদ্রলোক বলতে পার না?' 'তোমার নাম ও নম্বর দাও, আমি উপরওয়ালাদের জানাব।' ততক্ষণে চারিদিকে ভিড় জমিয়া গিয়াছে এবং সাহেবও পলাইতে পারিলে বাঁচেন। স্বামীজি তবু বলিতেছেন, 'এই শেষ বলছি, হয় তোমার নম্বর দাও, নতুবা লোকে দেখুক, তোমার মতন কাপুরুষ দুনিয়ায় নাই।'

"সাহেব ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া পড়িলেন। শ্বেতাঙ্গ চলিয়া গেলে মুনসী জগমোহনের দিকে ফিরিয়া স্বামীজি বলিলেন, "ইউরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে গেলে আমাদের কি চাই দেখছ? এই আত্মসম্মানজ্ঞান। আমরা কে, কি দরের লোক না বুঝে ব্যবহার করাতেই লোকে আমাদের ঘাড়ে চড়তে চায়। অন্যেব নিকট নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখা চাই। তা না হলেই তারা আমাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অপমান করে—এতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়।" শিক্ষা ও সভ্যতায় ভারতীয়রা জগতের কোন জাতির চেয়ে হীন নয়, "কিন্তু তারা নিজেদের হীন মনে করে বলেই একটা সামান্য বিদেশীও আমাদের লাথি ঝাঁটা মারে—আমরা চুপ করে তা হজম করি।"

রেল স্টেশনে এবং ট্রেনে অপ্রত্যাশিত বিড়ম্বনার যেন শেষ নেই। শেষবারের মতন হিমালয় ভ্রমণ করে স্বামীজি সেবার বেলুড়ে ফিরছেন। সময় ১৯০১ সালের শুরু। স্বামীজি পিলভিত স্টেশনে এসেছেন, সহযাত্রী চিরবিশ্বস্ত স্বামী সদানন্দ, যিনি বহুদিন আগে হাতরাস স্টেশনে কর্মী

ছিলেন। পিলভিত স্টেশনের দৃশ্যটি স্বামী গম্ভীরানন্দ এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "ট্রেন আসিলে স্বামীজি ও সদানন্দ একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় এক হাঙ্গামা উপস্থিত হইল।" একালের পাঠকপাঠিকাদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, সেকালের সেকেন্ড ক্লাস ও একালের সেকেন্ড ক্লাস এক নয়। তখন থার্ড ক্লাস ও ইন্টার ক্লাস-এর ওপরে সেকেন্ড ক্লাস।

পিলভিতের ঘটনা : "ঐ কক্ষে কর্নেলপদস্থ এক ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নেটিভদ্বয়কে তথায় প্রবেশ করতে দেখিয়া তাঁহার মন বিদ্বেষপূর্ণ হইল, তখন এতগুলি নেটিভ ভদ্রলোক সন্ন্যাসিদ্বয়কে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিতেছেন দেখিয়া সরাসরি বাধা দিতে সাহসে কুলাইল না। অগত্যা এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপসারণের জন্য তিনি স্টেশন মাস্টারের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেজ-পুঙ্গবের দাপটে হতবুদ্ধি স্টেশন মাস্টার আইন-এর মর্যাদা লঙ্ঘনপূর্বক স্বামীজির নিকট আসিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে কক্ষত্যাগের অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজি কিন্তু এভাবে নতিস্বীকার করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির অপমান বাড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ঐ ব্যক্তির কথা শেষ হইতে না হইতে গর্জিয়া উঠিলেন, আপনি কি করে এ-কথা আমায় বলতে সাহস করলেন? আপনার লজ্জা হলো না? বেগতিক দেখিয়া স্টেশন মাস্টার সরিয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে স্বাভিপ্রায়ানুরূপ কার্য সমাধা হইয়া গিয়াছে এই বিশ্বাসে কর্নেল স্বস্থানে ফিরিয়া দেখেন, স্বামীজি ও সদানন্দ পূর্ববৎ সেখানেই বসিয়া আছেন। তখন তাঁহার পুনর্বার গাত্রদাহ আরম্ভ হওয়ায় তিনি স্টেশনের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্যন্ত উচ্চরবে 'স্টেশন মাস্টার', 'স্টেশন মাস্টার' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্টেশন মাস্টার গা ঢাকা দিয়াছেন, আর এদিকে ট্রেন ছাড়িবারও বিলম্ব নাই। অতএব সাহেবের মাথায় সুবুদ্ধি আসিল, তিনি স্বীয় বোঁচকা-বুঁচকি লইয়া অপর এক কামরায় চলিয়া গেলেন—বীরত্ব সেখানেই সমাপ্ত হইল। স্বামীজি তাঁহার পাগলামি দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। এমনি ছিল সমসাময়িক ভারতবর্ষের অবস্থা।"

মহাসমুদ্রের অপরপারে সুদূর মার্কিন দেশে বিজয়ী বিবেকানন্দকে আঘাতে অপমানে ক্ষতবিক্ষত করার যে বিরামহীন প্রচেষ্টা চলেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ মার্কিন গবেষিকা মেরি লুইস বার্ক তাঁর ছ'খণ্ডের ইংরিজি বইতে রেখে গিয়েছেন। এমন ধৈর্যময় গবেষণার জন্য এই মার্কিনী লেখিকা আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে শ্রদ্ধার আসনটি দখল করে নিয়েছেন। গুরু অশোকানন্দের নির্দেশে এই গবেষিকা ১৯৪৪ সাল থেকে কয়েক যুগ ধরে স্বামীজি সম্বন্ধে নানা অজানা তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের বিস্ময়ের পাত্রী হয়েছেন।

সুদূর মার্কিন মুলুকে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বহুজনের হৃদয়েশ্বর হয়ে উঠেছিলেন, তেমন একই সঙ্গে প্রবাসের পরিবেশে কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর ভাগ্যে জুটেছে নানা ধরনের অত্যাচার ও অপমান। কখনও তিনি বিচিত্র বেশবাসের জন্য পথচারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, কখনও বিতাড়িত হয়েছেন চুলছাঁটার সেলুন থেকে, কখনও পয়সা দিয়েও প্রবেশ করতে পারেন নি রাতের আশ্রয়স্থল কোনো হোটেলে। এই সেই সন্ন্যাসী যাঁর সম্বন্ধে মেরি লুইস বার্ক আবিষ্কার করেছেন রেল ইয়ার্ডে ওয়াগনে শুয়ে থাকার কথা।

মেরি লুইস বার্ক পাঁচহাজার পাতা ধরে মার্কিনদেশের সংবাদপত্র এবং সমসাময়িক ব্যক্তিদের যে স্মৃতিকাহিনি বিপুল নিষ্ঠার সঙ্গে পুনরুদ্ধার করেছেন এই নিবন্ধে তার প্রতি সুবিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মহাসমুদ্রকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশিতে সংক্ষেপিত করার প্রচেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। আমরা বরং প্রথমে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার উদ্দেশ্যে খোদ বিবেকানন্দর মার্কিনদেশ থেকে লেখা কিছু চিঠিপত্রের ওপর নির্ভর করি।

২৮ ডিসেম্বর ১৮৯৩, হেল পরিবারের ডিয়ারবর্ন এভিনিউ, চিকাগো থেকে হরিপদ মিত্রকে লেখা স্বামীজির চিঠি : "আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।"

২৪ জানুয়ারি ১৮৯৪, একই ঠিকানা থেকে স্বামীজি খবরের কাগজের অংশ কেটে পাঠাচ্ছেন মাদ্রাজী ভক্তদের কাছে। "কাগজটার অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও আমাকে গালাগালি দিয়া একটা নাম জাহির করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে আমি সর্বসাধারণের প্রিয় বক্তা ছিলাম।"

১৮ মার্চ ১৮৯৪ ডেট্রয়েট থেকে মিস মেরী হেলকে লেখা চিঠি : পত্রে গুরুভাইরা কলকাতা থেকে লিখেছেন, : "ম—কলকাতায় ফিরে গিয়ে রটাচ্ছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করছে...এই তো তোমাদের আমেরিকার অপূর্ব আধ্যাত্মিক পুরুষ।' ম—বেচারীর এতোদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ দুঃখিত। ভগবান ভদ্রলোককে ক্ষমা করুন।" বলাবাহুল্য এই ম প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছাড়া আর কেউ নন।

পরের দিন ১৯ মার্চ চিকাগো ডিয়ারবর্ন এভিনিউ থেকে শশীমহারাজকে কলকাতায় লেখা চিঠি : "বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরমকাপড়, তার উপর সালোম চামড়ার কোট. জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাইরে যেতে হয়।...প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদারমশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকিাগো-সুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙে পড়তে লাগলো তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বললো...দাদা আমি দেখেশুনে অবাক! বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে আঘাত করেছি? তোর খাতির তো যথেষ্ট এদেশে, তবে আমার মতো তোদের হ'ল না, তা আমার কি দোষ?...আর মজুমদার পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, 'ও কেউ নয়, ঠক জোচ্চোর ; ও তোমাদের দেশে এসে বলে—আমি ফকির ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারেজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে যথাসাধ্য আমাকে দাবাবার চেষ্টা ; কিন্তু গুরুসহায় ভাগ্য। মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান যে আমায় ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মত মানে—মজুমদার করবে কি?...দাদা মজুমদারকে

দেখে আমার আক্কেল এসে গেল।...ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হামবড়া, আর কেউ বড় হবে না।”

৯ এপ্রিল ১৮৯৪ নিউ ইয়র্ক থেকে প্রিয় আলাসিঙ্গা পেরুমলকে স্বামী বিবেকানন্দ : “গোঁড়াপাদ্রীরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠলেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর ম—বাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চয় হিংসেয় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদমাশ, আবার কলকাতায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বলছেন, আমি ঘোর পাপে মগ্ন, বিশেষত আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি!!! প্রভু তাঁকে আশীর্বাদ করুন।”

মে, ১৮৯৪, ১৭ বীকন স্ট্রিট, বস্টন থেকে অধ্যাপক রাইটকে স্বামী বিবেকানন্দ : “হে সহৃদয় বন্ধু, সর্বপ্রকারে আপনার সন্তোষ বিধান করতে ন্যায়ত আমি বাধ্য। আর বাকি পৃথিবীতে—তাদের বাতচীতকে আমি গ্রাহ্য করি না। আত্মসমর্থন সন্ন্যাসীর কাজ নয়। আপনার কাছে তাই আমার প্রার্থনা...বুড়ো মিশনারীগুলোর আক্রমণকে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। কিন্তু আমি দারুণ আঘাত পেয়েছি মজুমদারের ঈর্ষার জ্বালা দেখে। প্রার্থনা করি, তাঁর যেন চৈতন্য হয়।...সাধু ও পবিত্র হবার যত চেষ্টাই কেউ করুক না কেন, মানুষ যতক্ষণ এই পৃথিবীতে আছে তার স্বভাব কিছু পরিমাণে নিম্নগামী হবেই।”

মেরি লুইস বার্ক-এর ছটি খণ্ড ধৈর্য ধরে পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন বিবেকানন্দ এক শ্রেণীর মানুষের বিদ্বেষের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজির বক্তৃতার ফলে ভারতের যথার্থ সংবাদ পেয়ে অনেকেই ভারতে ধর্মান্তরিতকরণের চাঁদা কমিয়ে দেন। এর ফলে চার্চ তহবিলে দানের পরিমাণ এক বছরে দশ লক্ষ পাউন্ড তখনকার হিসেবে দেড় কোটি টাকা (এবং এখনকার হিসেবে সাড়ে আট কোটি টাকা) কমে যায়। তাই কেউ কেউ ক্ষতিটা করলেন, “জাহান্নাম যেতে হয় তাও স্বীকার, কিন্তু নচ্ছার বিবেকানন্দর সর্বনাশ করতেই হবে।”

ডেট্রয়েটে প্রাক্তন গভর্নরের স্ত্রী শ্রীমতী জন জি ব্যাগলি ছিলেন বিবেকানন্দর গুণমুগ্ধ, তাঁর বাড়িতে স্বামীজি আতিথেয়তা নেন। ক্ষিপ্তপ্রায় শত্রুপক্ষ গুজব ছড়িয়ে দিল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আচরণে উত্ত্যক্ত হয়ে একটি অল্পবয়স্কা ঝিকে ব্যাগলির গৃহ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। অতিথিটি অসম্ভব রকম আত্মসংযমহীন।

মিথ্যা গুজবে বিরক্ত হয়ে মিসেস ব্যাগলি ২২ জুন ১৮৯৪ সালে চিঠি লিখলেন, "তিনি আমাদের বাড়িতে অতিথিরূপে তিন সপ্তাহের অধিক ছিলেন এবং তাঁকে আমি, আমার ছেলেরা, আমার জামাই ও গোটা পরিবার সর্বদা ভদ্রলোকরূপে পেয়েছি—তাঁর ব্যবহার অতি অমায়িক ও সৌজন্যপূর্ণ, সঙ্গী হিসেবে তিনি আনন্দময় ও অতিথিরূপে সদাবাঞ্ছিত। বহুদিন পর মেরি লুই বার্ক জানতে পারেন, মিসেস ব্যাগলির ন'বছর বয়সের নাতনীকেও এইসময় অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, স্কুলের সহপাঠিনীরা বাড়িতে বিধর্মী রাখা হয়েছিল বলে নাতনীকে মুখ ভেঙচাত।

অমন যে অমন হেল পরিবার সেখানেও প্রবল ধাক্কা গিয়েছিল। শ্রীমতী হেলকে একখানা বেনামী চিঠিতে বলা হলো, স্বামীজি দুশ্চরিত্র, অতএব হেল পরিবারের কন্যাদের সঙ্গে যেন তাঁকে মিশতে না দেওয়া হয়।

শুধু কুৎসা রটানো নয়, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসে মার্কিন মুলুকে যে স্বামীজিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হতে পারে এমন আশঙ্কাও মনে জেগেছিল। যাঁরা অলৌকিকে বিশ্বাস করেন তাঁরা জানেন, ডেট্রয়টের এক ডিনারে স্বামীজি যখন কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে যাবেন তখন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছেন, 'খাসনি, বিষ!"

স্বদেশ থেকেও যে নিন্দার নিরন্তর প্রচার চলেছে তার মোদ্দা কথাটা বলে—স্বামীজি অধুনা বিবেকানন্দ হলেও আসলে তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি খাঁটি হিন্দু নন, তিনি ম্লেচ্ছাকারী তাম্রকূটসেবী সাগরলঙ্ঘনকারী গায়ক ও অভিনেতা—স্বেচ্ছাচারী এবং আমোদপ্রিয়।

কাল ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮, স্থান বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটি। স্বামীজি তাঁর প্রিয়শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে বলছেন :

"অল্প বয়স থেকেই আমি ডানপিটে ছিলুম, নইলে কি নিঃসম্বলে দুনিয়া ঘুরে আসতে প্যরতুম রে?"

আমেরিকার কথা ওঠায় একসময় তিনি বললেন, "আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কতলোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বললো। আমি কিন্তু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—চালাকি দ্বারা জগতে কোনো মহৎ কার্য হয়না। তাই ঐ সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেকসময় যারা আমায় অযথা গালমন্দ করত, তারাও অনুতপ্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই কাগজে প্রতিবাদ করে ক্ষমা চাইত। কখন কখন এমনও হয়েছে—আমায় কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেউ কেউ আমার নামে ঐ-সব মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে তিনি দোর বন্ধ করে কোথাও চলে গিয়েছেন। আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভোঁ, কেউ নেই, আবার কিছুদিন পরে তারাই সত্য কথা জানতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আমার চেনা হতে এসেছে। "কি জানিস বাবা, সংসার সবই দুনিয়া-দারি! ঠিক সৎসাহসী ও জ্ঞানী কি এ-সব দুনিয়াদারিতে ভোলে রে বাপ! জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমার কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ।...লোকে তোর স্তুতিই করুক বা নিন্দাই করুক, তোর প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা হোক বা না হোক, আজ বা শতবর্ষপরে তোর দেহপাত হোক, ন্যায় পথ থেকে যেন ভ্রষ্ট হোসনি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌঁছানো যায়। যে যত বড় হয়েছে তার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় কষ্টিপাথরে তার জীবন ঘষে মেজে দেখে তবে তাকে জগৎ বড় বলে স্বীকার করেছে। যারা ভীরু কাপুরুষ, তারাই সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তীরে নৌকা ডোবায়।"

ডাঃ ব্যারোজ যে প্রথমে স্নেহপরায়ণ হয়েও ক্রমশ কানপাতলা হয়ে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিগড়েছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণ শঙ্করীপ্রসাদ বসুমহাশয় আমাদের উপহার দিয়েছেন। পুরনো অনুরাগী যখন নতুন শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করেন তখন অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়।

ডাঃ ব্যারোজ ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, প্রবল শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ তাঁর অভ্যর্থনার জন্য যেসব ব্যবস্থা করেছিলেন তা বোধ হয় তাঁর মনঃপূত হয় নি। পরবর্তীকালে তাঁর একটি ছোট্ট বক্তব্য এদেশে বিরাট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রশ্নটি ভারতীয় সমাজে গুরুতর। চিকাগো বক্তৃতার পরেই স্বামীজিকে নিয়ে ব্যারোজ নাকি একটি ভোজনালয়ে গিয়েছিলেন এবং কি খাবেন জিজ্ঞেস করায় স্বামীজি নাকি বিফের অর্ডার দিয়েছিলেন। বিলম্বে হলেও কলকাতায় সমাজে গেল-গেল রব উঠলো। অসুস্থ অবস্থায় বিবেকানন্দ তখন কলকাতা থেকে অনেক দূরে। খবর গেলো, কিন্তু খবরটা মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীজি প্রকাশ্যে তর্কযুদ্ধে নামলেন না। জীবনের বড় বড় সমস্যার মোলাকাত করার সময় বিবেকানন্দ নির্বাক থাকাটাই শ্রেয় মনে করেছেন, তার ফলাফল কী হলো তা নিয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি উত্তেজিত হন নি।

শুধু শত্রু নয়, স্বামীজি তাঁর আপনজনদের হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছেন সেও এক দীর্ঘ ইতিহাস। ঠিকমতন লিখতে গেলে কেবল তাঁর দুই সন্ন্যাসী শিষ্য লিয়োঁ ল্যান্ডসবার্গ ও মেরি লুইস সম্বন্ধে পুরো একখানা বই লিখতে হয়। স্বামীজী এঁদের সন্ন্যাস দিয়ে কৃপানন্দ ও অভয়ানন্দ নামে অভিহিত করেন। প্রবাসের কালে শিষ্য ও শিষ্যা নিয়ে স্বামীজি যে অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়েছিলেন তা বড়ই দুঃখজনক।

ল্যান্ডসবার্গ পুরো তিনবছর ছিলেন স্বামীজির অবিচ্ছেদ্য সাথী, বন্ধু, সেক্রেটারি ও সেবক। তিনি নিউইয়র্কের বিখ্যাত খবরের কাগজ নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে কাজ করতেন। স্বামীজির সঙ্গে তিনি একই বাড়িতে (৩৩ নম্বর রাস্তা) নিউ ইয়র্কে থাকতেন এবং তাঁর অসীম স্নেহের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। প্রথমপর্বে বস্টন থেকে (১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) স্বামীজি প্রিয় শিষ্য কৃপানন্দকে লিখছেন, "তুমি নিজের ব্যবহারের জন্য কিছু বস্ত্রাদি অবশ্যই ক্রয় করবে, কারণ এগুলির অভাব এদেশে কোন কাজ করার পক্ষে তোমার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।...আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ এটা আমার কর্তব্যমাত্র। হিন্দু আইন অনুসারে শিষ্যই সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী, যদি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে তার কোন পুত্র

জন্মিয়াও থাকে, তবু সে উত্তরাধিকারী নয়। এ-সম্বন্ধ খাঁটি অধ্যাত্মিক সম্বন্ধ—ইয়াঙ্কির 'অভিভাবকগিরি' ব্যবসা নয়, বুঝতেই পারছো।"

কৃপানন্দ জাতিতে ইহুদি এবং আদিতে পোল্যান্ডবাসী ছিলেন। ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন।

এরপর শুনুন স্বামী অভেদানন্দর 'আমার জীবনকথা' থেকে বর্ণনার আঙ্গিকে : "২৭ মার্চ ১৮৯৮ নিউ ইয়র্ক হেরাল্ডে স্বামী বিবেকানন্দকে আক্রমণ করে এবং রাজযোগকে বিদ্রুপ করিয়া একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক মোগলাই চেহারার কৃষ্ণকায় ব্যক্তির পদতলে এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলার চিত্র ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই প্রবন্ধ স্বামীজির অধঃপতিত শিষ্য কৃপানন্দ লিখেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ এই প্রবন্ধ সঙ্গে নিয়ে মিস্টার লেগেট্‌কে দেখাবার জন্য তাঁর বাড়িতে গমন করেন। তাঁরা সেই প্রসঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় কৃপানন্দ অকস্মাৎ লেগেটের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। কৃপানন্দের আগমনবার্তা পেয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মিস্টার লেগেট বেরিয়ে আসলেন এবং প্রবন্ধটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

'তুমি কি এই প্রবন্ধ লিখেছ?'

কৃপানন্দ বলল—হ্যাঁ।

'কত পেয়েছ?'

'বেশি নয়, পঞ্চাশ ডলার মাত্র।'

'তুমি এত নীচ, এত স্বার্থপর যে, সামান্য অর্থের জন্য তোমার আচার্যকে উপহাসাস্পদ করলে? আমার বাড়ি থেকে বের হও।' কৃপানন্দ যেমন এসেছিলেন তেমনই বেরিয়ে গেলেন।"

এবিষয়ে পরবর্তীকালে আমরা স্বামী অভেদানন্দর মুখে আরও কিছু শুনেছি। "অভয়ানন্দ, যোগানন্দ, কৃপানন্দ—এরা শেষে সব স্বামীজির বিরুদ্ধে গেছেন। যোগানন্দ ভাল লোক ছিল, বেদান্ত বলতে পারতো না, ভান্দান্ত বলত।...১৮৯৯-১৯০১ স্বামীজি দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকায় যান, তখন শরীর খুব খারাপ...তিনি লেগেটের বাড়িতে ওঠেন। এক ডাক্তার (ডাক্তার গার্নসি) ওঁকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর এক ছেলে মারা

গেল। তার মুখ নাকি স্বামীজির মতন দেখতে। তা সেই ডাক্তারের বাড়িতে তখন স্বামীজি আছেন।

একদিন স্বামীজির শরীর পরীক্ষা করছেন ডাক্তার গার্নসি। হঠাৎ কৃপানন্দ সেখানে এসে পড়েন। তাই দেখেই স্বামীজির নাড়ি বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। জিজ্ঞেস করাতে বললেন, ওকে দেখেই ও রকম হলো। ডাক্তার তখন কৃপানন্দকে চলে যেতে বললেন।

আটলান্টিক পেরিয়ে ইংলন্ডে ফিরে এসেও স্বামীজি যে মানসিক শান্তি পান নি তার বিবরণও নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যারা একসময় বন্ধু থাকে তারাও ভাগ্যের পরিহাসে অনেক সময় শত্রুতে পরিণত হয়ে মহাপুরুষদের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ান। দুটি চরিত্রের কথা বিশেষভাবে মনে এসে যায়—মিস্ হেনরিয়েটা মুলার, যিনি একসময় প্রবল উৎসাহী হয়ে বেলুড় মঠের জমি কেনবার জন্য বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন, আর একজন এডওয়ার্ড স্টার্ডি, একসময় স্বামীজি তাঁর ওপর বড় বেশি নির্ভর করেছিলেন।

লন্ডনে মিস্ মুলারের আতিথ্যে থাকার সময় থেকেই পরিস্থিতি যে খারাপ আকার ধারণ করছে তা বিবেকানন্দভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের 'লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' বইটিতে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামীজির ক্ষিপ্রলিপিকার গুডউইনের বিভিন্ন অস্বস্তিকর মন্তব্য থেকেই বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এডওয়ার্ড স্টার্ডির ব্যাপারটাও বিশেষ বেদনাদায়ক, এই লোকটির আচরণে স্বামীজি যে খুবই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ চিঠিতে।

একজন ভক্ত পত্রযোগে জানান, মিস্ মুলার স্বামীজির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি কোন কথাই বুঝবেন না, বললেন ইন্ডিয়া ইজ এ গড্ ফরশেকেন কানট্রি। ইনিই স্বামীজিকে ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ান বলেছিলেন।

এর আগের পর্বে প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মিস মুলার : "একেই স্ত্রীলোক তাতে আবার বুড়ী, মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে, কাহারও সহিত বনিবনা হয় না।" আরও একটি বর্ণনা—"তাঁহার ঠোঁটে পুরুষের মতো একটু গোঁফ

এবং দাড়িতে সামান্য একটু চুল হইয়াছিল।”

এই মহিলাই চিঠি লেখেন ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারকে এবং পরে এঁকে এবং স্বামী সারদানন্দকে নিয়ে বিবেকানন্দ দেখা করেন ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে।

এঁর বাড়িতেই টেবিলে একটি বই দেখে স্বামীজির ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ সেটি পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহেন্দ্রনাথের বর্ণনা— মিস মুলার : “বই কাহাকেও দিব না। বই লইয়া গেলে কেউ ফেরত দেয় না। স্বামীজি বললেন, 'না, মহিম বই ফেরত দেবে।' বইটি বিরক্তভাবে মহেন্দ্রনাথকে দিয়ে মিস মুলার বললেন, “ব্যাটাছেলেকে কখনও বই পড়তে দিতে নেই, নিয়ে গেলে আর তারা কখনও ফিরত দেয় না, পুরুষদের এটা ভারি দোষ। আর মাগীদের কথা যদি বল তো নিডিলবক্স, থিম্বুল ও কাঁচি দেখতে পেলেই সুবিধামতো নিয়ে সরে পড়বে।” স্বামীজি ব্যঙ্গচ্ছলে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তাদের বাড়িতে কি কাঁচি, নিডিলবক্স সব থাকে না?” মিস মুলার উত্তেজিত হয়ে বললেন, “থাকে না কেন! মাগীদের তো ঐসব রোগ, এই জন্যে মাগীরা এলে অত ভয় করে,”

খুব রাগী ছিলেন মিস মুলার, তাই স্বামী সারদানন্দ বলতেন, এই দেবীকে পুজো করবার মন্ত্র :

ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।

এঁকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য ভাই ও গুরুভাইকে স্বামীজির বিশেষ উপদেশ : “খুব সাবধানে চলবি। ঘরে ঢুকলেই দাঁড়িয়ে উঠবি, কেমন আছেন জিজ্ঞেস করবি, প্যান্টালুনের পকেটে হাত রাখবি না, বুকে হাত রাখবি না। বুড়ী যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তবে বাপু তোরা বসিস্ নি।”

স্বামীজির জীবনে উইম্বলডন-নিবাসী মিস হেনরিয়েটা মুলারের ভূমিকাকে স্বামী প্রভানন্দ “যুগপৎ আনন্দের ও দুঃখের” বলে বর্ণনা করেছেন। আনন্দের হেতু তিনি অর্থদান করে মঠ-কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব জমি কিনতে সাহায্য করেছিলেন, “দুঃখের হেতু, তিনি পরে সঙ্ঘের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।”

দেখা যাচ্ছে বেলুড়ের জমি সন্ধান কালেই মিস মুলার অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। ৩০ নভেম্বর ১৮৯৭ স্বামীজি তাঁব প্রিয় গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখছেন, "মিস মুলার যে টাকা দিবেন বলিয়াছেন, তাহার কতক কলকাতায় হাজির। বাকি পরে আসিবে শীঘ্রই...তুমি নিজে ও হরি পাটনায় সেই লোকটিকে ধর গিয়া—যেমন করে পারো influence কর ; আর জমিটে যদি ন্যায্য দাম হয় তো কিনে লও।"

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ শশী মহারাজকে স্বামীজি লিখলেন, "যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব।" ৬ মার্চ স্বামী প্রেমানন্দ লিখছেন শশী মহারাজকে "গতকল্য ঐ জায়গাটি ৩৯,০০০ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।" ইঙ্গিত রয়েছে শ্বেতপাথরে মন্দির তৈরির— "দেখেশুনে লোকে অবাক হয়ে যাবে।" ২৫ ফেব্রুয়ারির আর একচিঠিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতা লিখলেন প্রমদাদাস মিত্রকে :" চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আঠারো বিঘা উত্তম জমি গঙ্গার পশ্চিমকূলে ক্রয় করা হইয়াছে। আরও মঠের জন্য প্রায় একশত বিঘা জমি ঐ জমির চতুস্পার্শ ক্রয় করিবার মত আছে। জমিতেই প্রায় দুইলক্ষ টাকা পড়িয়া যাইবে।"

মিস মুলার সম্পর্কে আরও খবরাখবর স্বামী প্রভানন্দ দিয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৯৭ মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে। খেয়ালী ও আগ্রাসী প্রকৃতির মিস মুলারের আচরণে স্বামীজি কিরকম বিব্রত বোধ করতেন তার আন্দাজ পাওয়া যায় স্বামীজির অপ্রকাশিত একটি চিঠি থেকে। আলমোড়া থেকে ৯ জুলাই ১৮৯৭ স্বামীজি সিংহলে তাঁর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দকে লেখেন, "এখানে আমরা দু-তিনদিন বিনসর ডাকবাংলোয় ছিলাম—পরে আমি শ্যামমধুরায় যাত্রা করায় মিস মুলার ক্ষেপিয়া আলমোড়ায় গিয়াছে। মিস মুলার বিষম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে...। আমি বন্ধুর বাটীতে যাইতেছি। অতি খিক্‌নে মন। এই বৃহৎ বাড়ি আমাকে না বলিয়া কহিয়া ৮০ টাকা মাসে এক সিজ্‌নের জন্য ভাড়া করাইল। সকলের উপর মহারাগ, গালিমন্দ! এক্ষণে আমি অর্ধেক দিব বলায় কিঞ্চিৎ সুস্থ। বেচারীর মাথা খারাপ বোধ হয়।...এখন বলে, আমি ও বদ্রি শাহরা সকলে তাহাকে লুটিতেছি।"

স্বামীজির সহ্যশক্তিতে এই মহিলার সাময়িক পরিবর্তন হয়েছিল। স্টার থিয়েটারে সিস্টার নিবেদিতার পরে (১১ মার্চ ১৮৯৮) একটা ভাষণ দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন বেলুড়ের জমির জন্য মিস মুলার কত দিয়েছিলেন। জমির দাম ৪০,০০০ টাকা এবং জমি লেভেল করার জন্য আও চার হাজার টাকা। গুডউইনের মাধ্যমে মিস মুলার দিয়েছিলেন ৩০,০০০ টাকা।

মেরি লুইস বার্ক জানাচ্ছেন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ অবস্থায় মিস মুলার ইংলন্ডে ফেরেন ১৮৯৯-এর গোড়ার দিকে। "কিন্তু ভারত ত্যাগের পূর্বে তিনি একটি অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন। তাঁর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়লো।" তাঁর বিষোদ্‌গাব বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮ গোঁড়া খ্রিস্টান পত্রিকা দ্য ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফরমারে ঘোষণা, মিস মুলার স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর খ্রিস্টান বিশ্বাসে ফিরে গিয়েছেন।

মিস মুলার শেষবারের মতন বেলুড় মঠে এসেছিলেন ৯ নভেম্বর ১৮৯৮।

মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, লন্ডনে নানা ভাবে বিব্রত হয়ে থেকেও স্বামীজি বিপুল বিক্রমে নিজের কাজ করে চলেছিলেন। সমস্যার কোনো শেষ নেই, তারই মধ্যে ভাই মহেন্দ্রনাথ আচমকা বিলেতে হাজির হয়েছেন, ব্যারিস্টারি পড়বার সাধ নিয়ে। আরও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে এই সময়েই আমরা প্রথম স্বামীজির হার্ট অ্যাটাকের রিপোর্ট পাচ্ছি। অনুরাগী ফক্স ও মহেন্দ্রনাথ সেই সময় উপস্থিত। মধ্যাহ্নভোজনের পর একটা চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে, হঠাৎ স্বামীজির মুখে বড় কষ্টের ভাব দেখা গেল।

খানিকক্ষণ পরে তিনি শ্বাস ফেলে বললেন, "দেখ ফক্স আমার প্রায় হার্ট ফেল করছিল। আমার বাবা এই রোগে মারা গেছেন। বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল ; এইটা আমাদের বংশের রোগ।"

প্রবাসে ভাইকে নিয়ে যে স্বামীজির দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না তা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। খেতড়ির মহারাজার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মহেন্দ্রনাথ বিলেতে গেলে তিনি ভাইয়ের ওপর খুব রেগে গিয়েছিলেন।

"তাঁর পরিচিত বন্ধু প্রভৃতির কাছ থেকে কেউ টাকা নেয়—এ স্বামীজি মোটেই পছন্দ করতেন না। ভাই যখন ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আমেরিকায় যেতে রাজি হলেন না তখন রেগেমেগে স্বামীজি বলেছিলেন, "আমি এক পয়সা দেবো না। তুমি পায়ে হেঁটে ফিরে যাও।" যা সবচেয়ে আশ্চর্য, মহেন্দ্রনাথ পায়ে হেঁটেই ভারতে ফিরে এসেছিলেন। মানুষ কতখানি একগুঁয়ে এবং দুঃসাহসী হতে পারে তা সিমলার দত্ত পরিবারের তিন ভাইকে না দেখলে বোঝা অসম্ভব। স্বদেশে বিবেকানন্দ নিজেও একবার বলেছিলেন আমেরিকা যাবার জাহাজভাড়া জোগাড় করতে না পারলে তিনিও পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়বেন।

লন্ডনের বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজি যেমন বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, তেমন একই সঙ্গে চলেছে বিরামহীন ভোগান্তির পালা। বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে একই সঙ্গে লড়াই করতে করতে রোগজীর্ণ শরীরের মানুষটি কেমন করে মানুষের জন্য এতো ভেবে গেলেন এবং করে গেলেন তা ভাবলে কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

লন্ডনের এক বিখ্যাত সভায় জনৈক পেনসন পাওয়া সায়েব এসে উপস্থিত—ইনি বোধ হয় সারাজীবন বেঙ্গলে কাজ করেছেন। বক্তৃতার শুরুতেই সায়েবটি অত্যন্ত অসভ্য মন্তব্য শুরু করলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, স্যর মনিয়ার উইলিয়মস্ কোন বইতে লিখেছেন, বুদ্ধ অতি স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর লোক ছিলেন, নিজের স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীজি তাঁকে তোয়াক্কা না করে বুদ্ধ সম্বন্ধে বলছেন, তখন সায়েবটি বললেন, "আমি জানি সাধুরা চোর, সব চোর। আমি তাদের পিছনে পুলিস লাগিয়ে দিতাম, অনেক সময় পুলিস দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতাম। চোর ছ্যাঁচড় লোকরাই গেরুয়া পরে, আর তাদেরই সাধু বলে।"

সায়েব মনে করেছিল, "স্বামী বিবেকানন্দ কোন মাদ্রাজী হইবে, কারণ পূর্বে অর্শচিকিৎসার জন্য অনেক মাদ্রাজী বউবাজারে বাস করিত এবং তাহাদের লম্বা মাদ্রাজী নামের পূর্বে স্বামী কথাটি থাকিত।"

সায়েব বুঝলেন বক্তা বাঙালি। তখন বললেন, এই বেঙ্গলীবাবুদের আমরা মিউটিনির সময় বাঁচিয়ে ছিলুম। স্বামীজির অনুরাগী এক ইংরেজ চিৎকার করে উঠলেন, তার জন্যে মোটা মোটা মাইনে তো নিয়েছিলে।

সভায় প্রবল উত্তেজনা, হাতাহাতি হবার উপক্রম।

সারদানন্দ ও মহেন্দ্রবাবু প্রবাসের মাটিতে হাঙ্গামা দেখে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন। তখন স্বামীজি শান্তমূর্তি ত্যাগ করে অন্য এক ভীষণ মূর্তি ধারণ করলেন।... সেই ইংরেজটির দিকে মুখ করে ৩৫ মিনিট অনর্গল অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলেন। হেনজেস্ট ও হরসার সময় হ'তে সেইদিনকার সময় পর্যন্ত ইংরেজ জাতি কোন দেশেতে কোন সময়ে, কিরূপ অত্যাচার ও অনাচার করেছে তার ইতিহাস অনর্গল বলে যেতে লাগলেন।...

স্বামীজির ইতিহাসের জ্ঞান দেখে শ্রোতারা সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইল। অপমানিত ইংরেজটি পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁদতে লাগল এবং রুমালে নাক ঝাড়তে লাগল।

"পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে শ্রোতাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে শান্ত স্নিগ্ধভাবে স্বামীজি শুরু করলেন, 'নাউ আই কাম টু প্রত্যাহার অ্যান্ড ধারণা।'—যেন এখানে কিছুই ঘটে যায় নি। স্থির, নিশ্চল সিদ্ধ যোগীর মতন স্বামীজি বলে যেতে লাগলেন।

"আপনি আমাদের সহ্যশক্তির শিক্ষা দিয়েছেন," এই বলে বক্তৃতার শেষে শ্রোতারা স্বামীজিকে অভিনন্দন জানালেন। অনুগতরা বললেন, অসভ্য চোয়াড়ে লোকটাকে কোঁৎকানো উচিত ছিল। স্বামীজি এতক্ষণ স্থিরভাবে বসেছিলেন। তিনি তখন বললেন, "প্রত্যেকেই নারায়ণ। এই লোকটিও নারায়ণ। তবে ওর মধ্যে দুষ্ট নারায়ণ রয়েছেন।" এরপর গুডউইনকে টুপি, ক্লোক, ছড়ি নিয়ে আসতে বললেন এবং মুখে একটি সিগারেট দিয়ে বেড়াতে বেরোলেন, ফিরলেন অনেক রাতে।

স্বামীজির জীবনের নানা বিড়ম্বনার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে মেরি লুইস বার্কের গবেষণায়।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু স্বামীজির বিদ্রোহিনী শিষ্যা স্বামী অভয়ানন্দ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। যেমন, পূর্বাশ্রমে (মেরি লুই ডেভিড)

অভয়ানন্দ আদতে ফরাসি। পরে মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কৃপানন্দ ২ মার্চ ১৮৯৬ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় নিজেই লেখেন, তিনি ও মেরি লুই বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় স্বামীজি অগত্যা রাজি হয়েছিলেন সন্ন্যাস দিতে। শিষ্যরূপে এঁদের দু'জনকে নির্বাচন করার পিছনে ছিল স্বামীজির ধারণা—গোঁড়া খ্যাপামি বিপথগামী শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ শক্তিকে যদি রূপান্তরিত করে ঊর্ধ্বতর প্রণালীতে প্রবাহিত করা যায় তাহলে তা বিরাট মঙ্গলশক্তি হয়ে উঠতে পারে। ১৮৯৫ সালেই নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতি এবং কৃপানন্দের সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ দূর করবার জন্য (ডিসেম্বর ১৮৩৫) স্বামীজি মিস ওয়ালডোকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে যান কিন্তু তেমন সফল হননি। ১৮৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভয়ানন্দ ভারতে আসেন এবং ঢাকা, মৈমনসিংহ ও বরিশাল ভ্রমণ করেন। পরে বেদান্ত ত্যাগ করে গৌরাঙ্গ সমাজে যোগ দেন এবং বৈষ্ণব শক্তি চালিত অমৃতবাজার গোষ্ঠির উদার প্রশ্রয় লাভ করেন। এই সময় তাঁর গলায় বৈষ্ণবকণ্ঠী দেখা যেতো।

৭ মে ১৯০২ সালে সংবাদ থেকে জানা যায় কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজার অর্থানুকূল্যে মাদাম মেরি লুই আবার ভারতে আসেন। স্বামীজির দেহত্যাগের সময় (৪ জুলাই ১৯০২) তিনি এদেশে ছিলেন এবং বিভিন্ন ধনীপরিবারে গিয়ে বক্তৃতা করেন। ৭ জুলাই ১৯০২-এর আগে স্বামীজির তিরোধান সংবাদ অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরোয়নি—রিপোর্টের আকার সিকি কলম, কিন্তু একই দিনে অভয়ানন্দের একটা বক্তৃতার রিপোর্ট ছিল ঠাসা কয়েক কলম ভর্তি। ১৪ জুন ১৯০২ মিসেস সারা বুলকে স্বামীজি এই শিষ্যা সম্বন্ধে লেখেন, "শুনতে পাচ্ছি, জনকয়েক ধনী তাকে লুফে নিয়েছে। সে যেন এবারে প্রচুর অর্থ পায়— এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

"আমাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি সেভাবেই তাকে অনুগ্রহ করি। সে টাকা চেয়েছিল। ভগবান তাকে প্রচুর টাকা দিন।"

স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতি কথায় আরও একটি কাহিনী আছে। সেটাও জেনে রাখা মন্দ নয়। অভেদানন্দ সূত্র থেকে আরও জানা যায়, পরে আমেরিকায় অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে অতি শোচনীয় ভাবে সন্ন্যাসিনী

শিষ্যা অভয়ানন্দের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯১৩ সালে শিকাগোর বাড়িতে আগুন লেগে অভয়ানন্দ সর্বস্বান্ত হন। ১৯১৫ সত্তর বছরের এই বৃদ্ধাকে কোল্ড, হাংরি ও পেনিলেস বলে বর্ণনা করা হয়। তিনি দুঃখ করেন, জীবনে অনেক ভুল করেছি, এখন কর্মফল ভুগতে হবে। কিন্তু তারও আগে স্বামী অভেদানন্দের মুখে শোনা যায়, মেরি লুই ভারতে এসে বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন এবং ঢাকায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করেন। সেখান থেকে ফিরবার পরে তিনি বেলুড়ে উপস্থিত হন, তখন সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা, মিসেস ওলি বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতি হোমাগ্নির চারপাশে ব্যাঘ্র ও মৃগচর্মাসনে বসেছিলেন। মেরি লুই আচমকা উপস্থিত হওয়ায় এবং অন্য কিছু না পাওয়ায় তাঁকে একখানি ছাগচর্মের আসন দেওয়া হয়। এতে তিনি ভীষণ রেগে যান এবং স্বামীজির বিরুদ্ধ-দলে যোগ দেন।

শুধু এক কোকিলে যেমন বসন্ত আসে না তখন একজন অভয়ানন্দ বা কৃপানন্দ কোনো মহামানবের জীবনে কষ্ট আনেন না। নির্দোষ বিবেকানন্দের হতভাগ্য জীবনে এঁরা অনেকেই হাজির হয়েছেন কালো মেঘের মতন।

ই টি স্টার্ডির জীবনের সঙ্গে বিবেকানন্দ ও তাঁর আন্দোলন একসময়ে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। ইনি একজন স্কট ভদ্রলোক। ভাগ্যানুসন্ধানে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বছরখানেকের মধ্যে দশ হাজার পাউন্ড উপার্জন করে তিনি ইংলন্ডে ফিরে আসেন। থিওজফি তাঁকে ভারতে নিয়ে আসে, পরে তিনি সন্ন্যাসী হন এবং যথাসময়ে বিবেকানন্দের কয়েকজন গুরুভাইর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। পরবর্তী সময়ে স্টার্ডি ইংলন্ডে ফেরেন এবং বিয়ে করে সংসারী হন। মহেন্দ্রনাথের লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে আমরা স্টার্ডি ও তাঁর স্ত্রীর অনেক বর্ণনা পাই। আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ রয়েছে শ্রীমতী মেরি লুইস বার্কের বইতে।

অনেকের ধারণা স্টার্ডির স্ত্রীর প্রচণ্ড প্রভাব থেকেই পরবর্তী কালে অশান্তির সূত্রপাত। ১৮৯৯ সালের মাঝামাঝি তিনি স্বামীজির কাজের নিন্দা শুরু করলেন এবং বেদান্ত আন্দোলনের সঙ্গে হঠাৎ সম্পর্ক ছিন্ন

করলেন। ব্যাপারটা যে স্বামীজির কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল তা এখন কারও অজানা নয়।

সম্পর্ক ছিন্ন হবার আগে ই টি স্টার্ডি মিসেস ম্যাকলাউডকে জানান, স্বামীজি লন্ডনে এসে তাঁর বাড়িতে থাকুন। কিন্তু ছ'মাস পরে স্বামীজি যখন লন্ডনে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন তাঁর পক্ষে কোনো খরচাপাতি করা সম্ভব হবে না। ৩১ জুলাই ১৮৯৯ স্বামীজি যখন বিলেতে ফিরে এলেন তখন স্টার্ডি তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বন্দরেও এলেন না।

মিস হেনরিয়েটা মুলারের বাবা ছিলেন জার্মান, চিলিতে গিয়ে কাঠের ব্যবসায় তিনি রীতিমতো ধনী হন এবং পরে ইংলন্ডে ফিরে এসে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর সম্পদ ভাগ করে দেন। মিস মুলার পরে দলত্যাগী হয়ে, প্রকাশ্যে অভিযোগ তুললেন, মুখে যাই বলা হোক, হিন্দুধর্মের প্রধান কথা হলো লিঙ্গপূজা। আরও গুরুতর অভিযোগ তুললেন, ভারতবর্ষে কাজের জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা তিনি নিজের পরিবারের পিছনে ঢেলেছেন।

এই ধাক্কা যসাসময়ে ই টি স্টার্ডির ওপরও এল। তিনি সম্পর্ক ছাড়বার আগে যুক্তি খুঁজতে গিয়ে স্বামীজির কাছে টাকা কড়ির হিসেব চাইলেন। ৬ আগস্ট ১৮৯৯ স্বামীজি ইংলন্ডের উইম্বলডন থেকে মিসেস বুলকে হিসেব সংক্রান্ত একটা স্পষ্ট চিঠি লেখেন। "আপনি এবং অন্যরা কাজের জন্য আমাকে যে টাকা দিয়েছেন তাব থেকে একটা টাকাও আমি নিইনি। আমার মাকে সাহায্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত জানিয়ে ক্যাপটেন সেভিয়ার আমাকে ৮০০০ টাকা দিয়েছিলেন আমার মাকে দেবার জন্য। সে টাকারও বারটা বেজেছে মনে হচ্ছে। এর বাইরে আমার পরিজনের জন্য অথবা এমনকি আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যও আর কিছুই খরচ করা হয়নি। আমার খাইখরচের দায়িত্ব নিয়েছেন খেতড়ির রাজা, তারও প্রধান অংশ প্রতিমাসে মঠে চলে যায়। যদি না ব্রহ্মানন্দ তার থেকে কিছু অংশ আমার খুড়ির বিরুদ্ধে মামলায় খরচ করেন। যদি তিনি তা করে থাকেন তা হলে যে কোনো উপায়েই হোক আমি তা পূরণ করে দেব, যদি তা করতে বেঁচে

থাকি।" এই চিঠি এখনও বাংলা বাণী ও রচনায় স্থান পায়নি।

স্টার্ডির সঙ্গে স্বামীজির পত্রবিনিময়ের কিছু অংশ এখনও রচনাবলীতে স্থান না পেলেও মেরি লুইস বার্ক কিছু অংশ উদ্ধার করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। রিজলি ম্যানর থেকে লেখা একটি চিঠির তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯। "আমি মিসেস সুটারের কাছ থেকে $ ৫০০ = ৭৫০০ টাকা + ৫০০ = ৭৫০০ পেয়েছিলাম, গুডউইনের মাধ্যমে মিস মুলারের কাছ থেকে এসেছিল ৩০০০০ টাকা, মোট ৪৫০০০ টাকা। এর থেকে জমি কেনার দাম ৪০০০০ টাকা এবং নিচু জমি ভরাট করতে আরও ৪০০০ টাকা। আমি নিজের জন্যে একটা আধলা নিই নি, আমার খরচ আসে বক্তৃতা থেকে, লেখা থেকে। কিছু এসেছে খেতড়ির রাজার কাছ থেকে, কি মিসেস সেভিয়ারের কাছ থেকে।...আমি কি তোমার কাছ থেকে কোনো টাকা চেয়েছি? আমি কারও কাছে হাত পেতেছি মনে পড়ে না, যদিও নিজে থেকে কেউ কেউ কিছু দিয়েছেন।" এর পর স্বামীজি বলেছেন, মিস মুলার ইত্যাদি কেউ যদি টাকা দেওয়ার জন্য দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে একটু সময় দিন, আমি টাকা ফেরত দিয়ে দেব।

স্টার্ডিকে লেখা স্বামীজির চিঠিগুলি এখনও পূর্ণভাবে বাংলা পাঠকের কাছে আসেনি। কিছুটা ঔৎসুক্য মিটিয়েছেন মেরি লুইস বার্ক তাঁর দুঃসাহসিকতাপূর্ণ গবেষণা-পুস্তকে। এই পর্যায়ে ২১ ওয়েস্ট থার্টি ফোর স্ট্রিট, ইস্ট ইয়র্ক থেকে নভেম্বরে (১৮৯৯) লেখা স্বামীজির চিঠিটি আছে।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু বিস্তারিত বঙ্গানুবাদ করলেও পুরো চিঠিটা অনুবাদ করেননি, সুতরাং সাধারণ পাঠককে নির্ভর করতে হবে মেরি লুইস বার্কের ওপর। আমরা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর অনুবাদ দু'এক জায়গায় অতি সামান্য পরিবর্তন করে এখানে উপস্থিত করলাম। চিঠির আকার দীর্ঘ, কিন্তু বিপন্ন বিবেকানন্দ তাঁর উনচল্লিশ বছরের জীবনে এমন খোলাখুলিভাবে কখনও আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেননি। সিংহবিক্রম বিবেকানন্দের রূপ ঠিকভাবে বুঝতে গেলে এই পত্রাংশ পাঠ করাটা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

"আমার আচরণের সমর্থনের জন্য এই চিঠি নয়। যদি অন্যায় কিছু করে থাকি, কথা দিয়ে তাকে মোছা যাবে না; আর যদি কোনো সৎকাজ করে

থাকি, নিন্দায় তার নিরোধ করা সম্ভব নয়।

"বিলাসিতা!—গত কয়েক মাস ধরে কথাটা বড়-বেশি শুনতে পাচ্ছি—পাশ্চাত্ত্যবাসীরা যার উপকরণ নাকি যুগিয়ে গেছে! আর আমি নাকি, ভন্ড আমি, সারাক্ষণ ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে তাকে ভোগ করেছি! এই ভোগ-বিলাসই নাকি পাশ্চাত্ত্যে, বিশেষত ইংলন্ডে, আমার কাজের পথে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যেন আত্মসম্মোহনের ঘোরে ভাবতে চাইলাম—তাহলে আমার ঊষর মরুজীবনের মধ্যে অন্ততঃ ক্ষুদ্র একটি মরূদ্যান আছে— সারাজীবনের নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারের মধ্যে রয়েছে আলোকিত একখণ্ড ঠাঁই—কঠোর পরিশ্রমে ও কঠোরতর অভিশাপের জীবনের মধ্যে আছে মুহূর্তের বিশ্রাম—হোক না তা ক্ষণেকের ইন্দ্রিয়সুখের ব্যাপার!

"কী আনন্দ আমার! ঐটুকু পেতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের দিনে শতবার আশীর্বাদ করেছি। কিন্তু অহো! তোমার শেষ চিঠিটি বজ্রের মতো নেমে এল আর স্বপ্নও মিলিয়ে গেল।"

স্বপ্নভঙ্গে, বাস্তব স্মৃতি হাতড়ে, ইংলন্ডের 'বিলাসিতাময়' জীবনের যে-রূপ দেখেছেন, তাকেই এর পর স্বামীজি খুলে ধরেছেন, সেইসঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন : "আশা করি, যদি প্রয়োজন মনে করো, এই চিঠি বন্ধুদের মধ্যে ঘুরিয়ে পড়াবে, আর যদি কিছু ভুল লিখে থাকি, সংশোধন করে দেবে।"

"রীডিং-এ তোমার বাড়ির কথা মনে পড়ে—যেখানে দিনে তিনবার আমাকে খেতে দেওয়া হত—বাঁধাকপি-সেদ্ধ, আলু-সেদ্ধ, মসুরডাল-সেদ্ধ—আর, একটু আচার দেওয়ার হিসেবের জন্য তোমার পত্নীর অবিরাম অভিশাপ। বেশি কি, কম দামের কোনো প্রকার সিগার ধূমপানের জন্য দিয়েছ বলে মনে পড়ে না। ঐ ধরনের খাবার এবং তোমার পত্নীর অভিশাপের বিষয়ে আমি কোনো অভিযোগ করেছি বলেও মনে পড়ে না, যদিও আমি কার্যতঃ চোরের মতো ভয়ে-ভয়ে থাকতাম সর্বদা এবং খেটে যেতাম তোমাদেরই জন্য।

"দ্বিতীয় স্মৃতি সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়ির। ওখানে তোমার এবং

মিস মুলারের তত্ত্বাবধান। আমার হতভাগ্য ভাই রোগে পড়ল আর তাকে মিস মুলার তাড়িয়ে দিলেন। ওখানেও স্মরণ করতে পারি না কোনো বিলাসের মধ্যে ছিলাম—খাদ্য, পানীয়, শয্যা কিংবা যে-ঘরে ছিলাম—তার দিক দিয়েও।

"পরবর্তী স্মৃতি মিস মুলারের বাড়ির। তিনি অবশ্যই দয়াবতী কিন্তু আমাকে বাদাম ও ফলের উপর জীবনধারণ করতে হয়েছিল।

"তার পরের স্মৃতি লন্ডনের একটি অন্ধকূপের [১৪ গ্রোকেট গার্ডেনস্] যেখানে দিবারাত্র আমাকে খাটতে হয়েছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে পাঁচ ছ'জনের জন্য রাঁধতে হয়েছে এবং অধিকাংশ রাত্রি কাটাতে হয়েছে দু'এক কামড় রুটি-মাখন খেয়ে।

"স্মরণ হচ্ছে, মিসেস জনসন তাঁর বাড়িতে একবার ডিনার খাইয়েছিলেন, রাত্রে থাকতেও দিয়েছিলেন—তার পরদিন বুনো কালা আদমীকে নাগাড়ে গালমন্দ করে গেছেন, কেন-না সে এত নোংরা যে, সারা বাড়ি ধূমপান করে বেড়িয়েছে।

"ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ারকে বাদ দিলে রুমাল-মাপের ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোও ইংলন্ডে কেউ আমাকে দিয়েছে মনে পড়ে না। অপরপক্ষে ইংলন্ডে আমার শরীর ও মনের উপরে যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল, তাতেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা—ইংরেজরা—আমায় এই তো দিয়েছ—আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ খাটিয়ে-খাটিয়ে—এখন আবার আমার বিলাসিতার নিন্দা!! তোমাদের মধ্যে কে আমাকে একটা কোট দিয়েছ? কে দিয়েছ একটা সিগার? কে দিয়েছ মাছ বা মাংসের টুকরো? তোমাদের মধ্যে কার বলবার সাহস আছে বলবে আমি তার কাছ থেকে খাদ্য-পানীয় চেয়েছি, ধূমপানের জিনিস চেয়েছি, জামা-কাপড় বা টাকাকড়ি চেয়েছি? ঈশ্বরের দোহাই, স্টার্ডি, জিজ্ঞাসা করো সেকথা, জিজ্ঞাসা করো তোমার বন্ধুদের, আর সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করো তোমার 'অন্তর্যামী ঈশ্বরকে, যিনি চির জাগ্রত।'

"তোমরা কাজের জন্য টাকা দিয়েছিলে, তার পাই পয়সা পর্যন্ত রয়েছে [বা কাজে লেগেছে]। তোমাদের চোখের সামনে আমি [অসুস্থ] ভাইকে

[অন্যত্র] সরিয়ে দিয়েছি— মৃত্যুর দিকেই বোধহয়। কিন্তু যা আমার ব্যক্তিগত টাকা নয়, তার থেকে তাকে একটা পয়সাও দিই নি।”

“যাঁরা কিন্তু সত্যই সেবা করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু সমালোচনা করেন নি। ইংলন্ডে তেমন মানুষ ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার।

“তাঁরা শীতের সময়ে পোষাক দিয়েছেন, অসুস্থ হলে মায়ের থেকেও স্নেহে সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে সমব্যথী হয়েছেন।”—তাঁরা কেবল আশীর্বাদই করে গেছেন।

“আমেরিকায় তেমন মানুষ মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিস্টার ও মিসেস লেগেট। এঁদের কেউ-কেউ ভারতে গেছেন, ভারতের মানুষকে মানুষ বলে মনে করেছেন, তাদের সুখ-দুঃখকে নিজেদের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করেছেন এবং সর্বদা চেয়েছেন বিবেকানন্দকে একটু আরামে রাখতে, একটু ভাল খাওয়াতে।

“আমি যখন তোমাদের দেশের মানুষদের জন্য প্রাণপাত করেছিলাম, যখন নোংরা গর্তে অনাহারের মধ্যে রেখে আমার গায়ের মাংস খাবলা করে তুলে নিচ্ছিলে এবং সঞ্চয় করে রাখছিলে বিলাসিতার অপবাদ—তখন ঐ লেগেট ও বুলদের রুটিই আমি খেয়েছি, তাঁদের দেওয়া পোষাকে গা ঢেকেছি, তাঁদের টাকাতেই ধূমপান করেছি, কয়েকবার তাঁরাই আমার বাড়িভাড়া মিটিয়েছেন।”

এ বিলাসিতার সমালোচনা করছিল কারা? “সমালোচকদের এক এক করে ধরো—শুধু দেহজীবী তারা!—আত্মা বলে কিছু নেই সেখানে।...এইসব হৃদয়হীন স্বার্থপর লোকগুলির ইচ্ছায় আমার আচরণ ও কার্য নিয়ন্ত্রিত করতে বলো—আর বিভ্রান্ত হও তা করি না বলে?”

“আমার গুরুভাইদের আমি যা করতে বলি তারা তাই করে।...তারা আমার ভাই, আমার সন্তান—আমার জন্য তারা অন্ধকূপে মরুক আমি তা চাইনি—আমি চাই নি...তারা খেটে মরবে আর তার বিনিময়ে পাবে অনাহার ও অভিশাপ।”

স্বামীজী জানালেন, পাশ্চাত্যদেশে অকারণ কঠোরতা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে তিনি সন্ন্যাসের নিয়মভঙ্গ করেছেন। শাস্ত্রে সন্ন্যাসী বা পরমহংসের

ক্ষেত্রে শরীর-নির্যাতনের বিধি নেই।

স্বামীজি লিখলেন, "প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা বলেছ। স্টার্ডি, সে ভারত এখনো বেঁচে আছে কারো-কারো মধ্যে, মরেনি একেবারে—সেই জীবন্ত ভারত আজও ধনীর অনুগ্রহ-নিগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে নির্ভয়ে নিজ বাণী উচ্চারণ করতে পারে। সে পরোয়া করেনা কারো—এদেশে, যেখানে তার পায়ে জড়ানো শিকল, কিংবা ওদেশে, যেখানে ঐ শিকলের প্রান্ত ধরে আছে তার শাসকেরা। সে ভারত আজও বেঁচে আছে—অমর প্রেমের ভারতবর্ষ—চিরন্তন বিশ্বস্ততার ভারতবর্ষ—অপরিবর্তনীয়, কেবল রীতি-নীতিতে নয়, প্রেমে, বিশ্বাসে, বন্ধুত্বে। সেই ভারতের অতি নগণ্য এক সন্তান আমি, তোমাকে ভালবাসি স্টার্ডি, ভারতীয় প্রেমের ধর্মে—এবং তোমাকে এই মায়াঘোর থেকে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে সহস্রবার দেহপাত করতে পারি।"

শঙ্করীপ্রসাদ বসু যে-অংশটি অনুবাদ করেননি তার কয়েকটি লাইন আমাকে মুগ্ধ করে। স্বামীজি লিখছেন, "স্টার্ডি, আমি সব বুঝি। আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে, আমি বুঝি তুমি যাদের খপ্পরে পড়েছো তারা তোমাকে ব্যবহার করতে চায়। আমি তোমার বউয়ের কথা বলছি না, সে এতোই সরল যে ডেনজারাস হওয়া তার পক্ষে কঠিন। মাই পুওর বয়, তোমার মধ্যে মংসের গন্ধ পাচ্ছে শকুনরা।"

আমরা শুধু জানি দু'জনের পত্র বিনিময় এর পরেও বন্ধ হয়নি। ১৯০০ সালের শরৎকালে স্টার্ডিপত্নী লুসি সন্তান প্রসব কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বামীজি খবর পেয়ে ফ্রান্স থেকে এডওয়ার্ড স্টার্ডিকে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু উত্তর পাননি।

বিশ্ববিজয়ে বেরিয়ে বিদেশী শত্রু ও বিদেশী মিত্রদের হাতে স্বামী বিবেকানন্দ কীভাবে নিগৃহীত ও আদৃত হয়েছিলেন তার বিবরণ সংগ্রহ করতে বেবিয়ে কেউ যেন ভেবে না বসেন যে স্বদেশের মানুষদের কাছে তিনি উন্নততর ব্যবহার লাভ করেছিলেন। সেখানেও প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং সীমাহীন ভালবাসার সঙ্গে অবহেলা, অপমান, বিদ্বেষ ও বিশ্বাস-

ঘাতকতার অবিশ্রান্ত প্রবাহ।

এতদিনের দূরত্ব থেকে শুধু একটা প্রশ্নই মনের মধ্যে জেগে ওঠে, এই প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে এবং সারাক্ষণ সংখ্যাহীন শারীরিক ব্যাধির সঙ্গে লড়াই করেও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কীভাবে এত চিন্তা করলেন এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য এত কাজ করলেন?

জীবিত কালের প্রধান অংশটা পথে পথে ঘুরে, কারও কাছে মাথা নত না করে, শত শত্রুর আঘাতে আত্মসমর্পণ না করেও, জটিলতার চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে মানুষকে কীভাবে তিনি এতো ভালবাসলেন? সেই বিস্ময়কর প্রাণশক্তির, সেই দুর্জয় মনোবলের বিশ্লেষণ চলেছে শতাব্দীর বেশি সময় ধরে, কিন্তু এখনও পরিপূর্ণ বিবেকানন্দকে আমরা সময়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে আনতে পারিনি।

প্রায় অর্ধশতাব্দীর অনুসন্ধান চালিয়েও, মেরি লুইস বার্কের মতো গবেষিকাও স্বীকার করেছেন মানুষটির কীর্তিকাহিনী অশেষ, তাঁর সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জেনেছি তার থেকে অনেক বেশি ঘটেছে তাঁর জীবনে, আরও অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টার সবেমাত্র শুরু হয়েছে, ধৈর্য ধরে আমাদের আরও অনেক কিছু খুঁজে বার করতে হবে, ব্যাখ্যা প্রয়োজন হবে আরও অনেক কিছুর। তার পর যদি বা আমরা বলতে পারি, উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা, নর্থ ক্যালকাটার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের শরিকি বাড়িতে জন্মানো, দেরেটোনার দত্ত-পরিবারের বংশধর স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা কিছুটা বুঝতে এবং জানতে সক্ষম হয়েছি।

হাতে বেশি সময় নেই, অকারণে লেখার আকার বৃদ্ধি করে নবযুগের পাঠক-পাঠিকাদের ধৈর্য পরীক্ষায় নেমেও লাভ নেই। আমরা দ্রুত কয়েকটি বিষয় স্পর্শ করে যাই—জীবিতকালে আপনজনদের কাছ থেকে তিনি কী পেয়েছিলেন অর্থাৎ কী পাননি তার ছোট্ট একটি তালিকা।

স্বামীজির বিরুদ্ধে কত না অভিযোগ সমকালের। "কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দর সন্ন্যাসী হওয়া, কালাপানির পারে যাওয়া, মাংসাহার করা ও তাকে সমর্থন করা, প্রকাশ্যে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে আহারাদি করা, ছুৎমার্গের এবং পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা" এদেশের স্বার্থপরদের

হাড়ে হাড়ে বেজেছিল।

কলকাতায় স্বামীজির সংবর্ধনা সভা বানচাল করবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছিল।

শূদ্রর সন্ন্যাস নেওয়ার বিষয়ে বিবেকানন্দ শুধু কলকাতার হৃদয়হীন বাঙালিদের হাতে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন ভাবাটা ঠিক হবে না। তাঁর একই অবস্থা হয়েছিল দক্ষিণে।

"একবার কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামীজি আপনার কি জাতি?' স্বামীজি গম্ভীর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "যে জাত রাজা সৃষ্টি করে আমি সেই জাতের লোক—সন্ন্যাসীর আদেশে রাজা সিংহাসনে বসেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকিলে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন এবং সন্ন্যাসীকে অবজ্ঞা করিলে রাজা সিংহাসনচ্যুত হন।... স্বামীজির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা নির্বাক হইয়া রহিলেন।"

কিন্তু এই স্তব্ধতা যে সাময়িক তা স্বামীজির সাহসী ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন।

"স্বামীজি আমেরিকায় যাইবেন, মাদ্রাজে এই খবর প্রচারিত হইলে ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইলেন এবং নানাপ্রকারে আপত্তি তুলিতে লাগিলেন। একবার স্বামীজি কয়েকজন অন্তরঙ্গ লইয়া মাদ্রাজ বন্দরের উপর বসিয়া বৈকালবেলা বায়ুসেবন করিতেছিলেন, সেইসময় কতকগুলি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ আসিয়া স্বামীজিকে অনেক কটূক্তি করিয়াছিল।"

এতকাল পরে শুধু বাঙালি এবং মাদ্রাজিদের অশোভন অন্যায়গুলির উল্লেখ করে লাভ নেই। কে না তখন সুযোগ পেয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কুৎসা রটিয়েছেন? থিওজফিস্ট কর্নেল অলকটের সঙ্গে স্বামীজির দেখা হয়েছিল প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার আগে।

রোমাঁ রোলাঁর কলমে : "আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তিনি যখন থিওজফিক্যাল সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি কর্নেল অলকটের নিকট

১৮৯৪ সালে শিকাগোয় তোলা স্বামীজির এই বিখ্যাত ছবির ফটোগ্রাফার ই বি স্নো। পরবর্তীকালে শিকাগো কন্দ্রের প্রধান স্বামী বিশ্বানন্দ ছবিটি উদ্ধার করেন হেল পরিবারের আত্মীয়দের মারফৎ।

আর এক শুভার্থী ফ্রান্সিস এইচ লেগেট (১৮৪০-১৯০৯)। প্যারিসে স্বামীজির উপস্থিতিতে এঁর বিবাহ হয় জোসেফিন ম্যাকলাউডের দিদির সঙ্গে। নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির কার্যকরী সমিতির প্রথম সভাপতি ছিলেন, স্বামীজির সুখ-দুঃখের চিরসাথী।

মিসেস লেগেট আদিতে মিসেস উইলিয়ম স্টার্জেস, কন্যা অ্যালবার্টা ও পুত্র হলিস্টারকে নিয়ে বৈধব্য জীবনযাপন করতেন। লেগেট-দম্পতিদের বাড়িতে (রিজলিম্যানর) স্বামীজি আড়াই মাস ছিলেন। পরে প্যারিসে এঁদের আতিথেয়তায় একমাস থাকেন স্বামীজি এঁকে মা বলে ডাকতেন।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নেতা, শিকাগো ধর্মমহাসভার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (১৮৪০-১৯০৬)। শিকাগোয় নিন্দায় মুখরিত হয়ে তিনি স্বামীজির মনোবেদনার কারণ হয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে প্রতাপচন্দ্র রটান, "বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করেছে"। স্বামীজির মনোভাব, "বেচারির এতদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ দুঃখিত। ভগবান ভদ্রলোককে কৃপা করুন"।

শিকাগো বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের কর্মকর্তা রেভারেন্ড জন হেনরি ব্যারোজ। প্রথমে গুণগ্রাহী পরে ঈর্ষান্বিত ব্যারোজ স্বামীজির প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেন। ১৯ মার্চ ১৮৯৫ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে চিঠিতে স্বামীজি দুঃখ করেন, "মজুমদার পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, ও কেউ নয়, ঠক জোচ্চোর!...ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কয় না"।
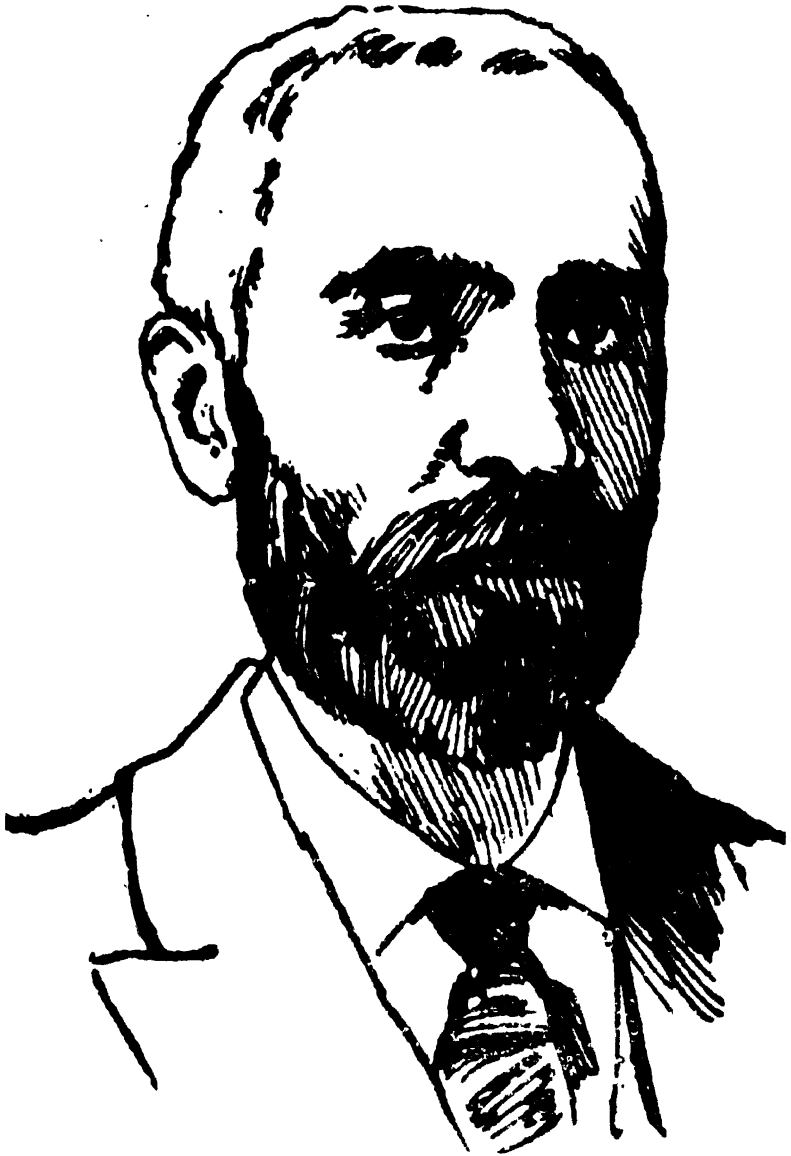
জন্মসূত্রে রাশিয়ান ইহুদি, পরে আমেরিকান নাগরিক ও সাংবাদিক লিওঁ ল্যান্ডসবার্গের সঙ্গে স্বামীজির প্রথম পরিচয় মে ১৮৯৪ নিউইয়র্কে। স্বামীজির কাজের সহায়করূপে বেশ কিছুদিন একত্র বসবাস এবং ২২ জুলাই ১৮৯৫ সহস্রদ্বীপোদ্যানে কৃপানন্দ নামে সন্ন্যাস গ্রহণ। পরের বছর বিরোধ ও আনুগত্যে ছেদ যা স্বামীজিকে বিশেষ কষ্ট দিয়েছিল। ইনি নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড পত্রিকায় ব্যাঙ্গাত্মক প্রবন্ধ লিখে স্বামীজেকে নিগৃহীত করেন। পরবর্তী সময়ে (১৮৯৯) ডাক্তারের বাড়িতে এঁকে আচমকা দেখে স্বামীজির পাল্‌স বন্ধ হয়ে যায়। তার আগে শিষ্যের অভব্য আচরণ সম্পর্কে স্বামীজি আর এক অনুগত বিদেশী গুডউইনকে লেখেন, আমাকে কষ্ট দেওয়া ভগবান বা শয়তান কারও পক্ষে সাধ্য নয়।

কাছে আসতেও যেমন, দূরে সরে যেতেও তেমন, স্বদেশে ও বিদেশে এমন অস্বস্তিকর ঘটনা বারবার ঘটেছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। যে চারজন আমেরিকান ও ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাকে নিয়ে তিনি বিশেষ বড়ম্বিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতমা মাদাম মেরি লুই (পরে স্বামী অভয়ানন্দ)। স্বামীজি এই বৈদেশিনীকেই প্রথম সন্ন্যাস দেন (জুলাই ১৮৯৫), কিন্তু পরবর্তীকালে দু'জনের মধ্যে যে দুঃখজনক দূরত্বের সৃষ্টি হয় তার অস্বস্তিকর বিবরণ নানা বইতে এবং পত্রাবলীতে ছড়ানো রয়েছে।

সিস্টার নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ এঁকেই লোকমাতা বলেছিলেন।

সিস্টার ক্রিস্টিন (১৮৬৬-১৯৩০)—জীবনের শেষপর্বে এঁকেই স্বামীজি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চিঠি লেখেন। জন্ম জার্মানিতে, তিন বছর বয়সে ডেট্রয়েট (আমেরিকা) শহরে, ১৮৯৪ বান্ধবীর সঙ্গে স্বামীজির বক্তৃতা শুনতে গিয়ে মুগ্ধ হন, পরের বছর ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা নিয়ে, ১৯০২ সালে নারীশিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নিউ ইয়র্কে দেহাবসান ২৭ মার্চ ১৯৩০।

প্রথমে প্রবল অনুরাগিনী, পরে দলত্যাগিনী মিস এফ হেনরিয়েটা মূলার। লন্ডনে স্বামীজি স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে কিছুদিন এঁর বাড়িতে ছিলেন। বেলুড় মঠের জমি কেনার (৪ মার্চ ১৮৯৮) দু'হাজার পাউন্ড ইনিই দেন। মনোমালিন্যের পর ১৯০১ সালে কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু স্বামীজির স্বাগতপত্র সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

এডওয়ার্ড টি স্টার্ডি—অনেকদিনের বন্ধুত্ব এবং পরে অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব। এঁর অভিযোগে বিরক্ত হ
ধৈর্যহীন স্বামীজি যে বিরাট চিঠি লিখেছিলেন তা আজও অপমানিত ও আহত বিবেকানন্দের ওপ
বিশেষ আলোকপাত করে।

চিরঅনুগত জে জে গুডউইন। এই ক্ষিপ্রলিপিকার না থাকলে স্বামীজির অনেক ইংরিজি রচনা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম।

আর এক ভুবনবিদিতা বিবেকানন্দ-অনুরাগিণী ফরাসি অভিনেত্রী মাদাম সারা বার্নাহার্ড (১৮৪৪-১৯২৩)। এঁর অভিনীত দুটি থিয়েটার স্বামীজি নিউ ইয়র্ক ও প্যারিসে দেখেন এবং 'পরিব্রাজক' বইতে তাঁর কথা লেখেন।

ফ্রান্সের ভুবনবিদিতা গায়িকা মাদাম এমা কালভেব (১৮৫৮-১৯৪২) সঙ্গে স্বামীজির প্রথম সাক্ষাৎ শিকাগোয় সম্ভবত ১৮৯৪ সালে, এই সময় তাঁর একমাত্র কন্যা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। পরবর্তী সাক্ষাৎ শিকাগোয় (১৮৯৯) এবং প্যারিসে (১৯০০)। সঙ্গী হিসেবে এঁর সঙ্গে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে বেরিয়ে স্বামীজি যখন কায়রোতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন মাদাম কালভে তাঁর দেশে ফিরবার টিকিট কিনে দেন। স্বামীজিকে তিনি 'Monpere' (আমার পিতা) বলে সম্বোধন করতেন। এঁর বিখ্যাত আত্মচরিত 'মাই লাইফ' ইংরিজিতে অনুদিত হয়ে ১৯২২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ সালে কলকাতায় এসে তিনি বেলুড়ে স্বামীজির সমাধি দর্শন করেন, সঙ্গে ছিলেন বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দাসী।

প্রথমে হাতরাস রেল স্টেশনের কর্মী, পরে অবিশ্বাস্য স্বামীজির অবিশ্বাস্য শিষ্য স্বামী সদানন্দ (১৮৬৫-১৯১১)। মিশনের সন্ন্যাসীদের মহারাজ ডাকনাম ইনিই প্রচলন করেন এবং বরাহনগর মঠে নিজেই গুপ্তমহারাজ নামে পরিচিত হন। শেষজীবনে স্বয়ং নিবেদিতা তাঁব সেবা করেন, প্রয়োজনে রান্না করে খাওযান।

অবিশ্বাস্য গুরুর আর এক অবিশ্বাস্য শিষ্য মারাঠী সুরজ রাও (১৮৬৫-১৯৩৪)। এক সময় সেনাবাহিনীর কর্মী সুরজ রাও ১৯০১ সালে বেলুড়ে আসেন, স্বামীজির কাছে সন্ন্যাস দীক্ষার পর নাম হয় স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। গুরুর অপ্রত্যাশিত দেহাবসানের পরে হরিদ্বার কুম্ভমেলায় আর এক বিস্ময়কর গুরুভাই কল্যাণানন্দের সঙ্গে পরিচয় ও কনখল সেবাশ্রমে তিন দশকের অবিস্মরণীয় দ্বৈত সেবাকার্য। ২২ অক্টোবর ১৯৩৪ কনখলে পদ্মাসনে ধ্যানযোগে দেহাবসান।

স্বামীজির চির অনুগত কাশী সেবাশ্রমের অন্যতম স্তম্ভ স্বামী শুভানন্দ (চারুচন্দ্র দাস)। কলকাতা আটর্নি অফিসের এই কর্মী ১৮৯৭ সালে স্বামীজির সঙ্গলাভ করেন, পরে কাশীতে অবিশ্বাস্য সেবাকর্ম এবং যথাসময়ে স্বামীজির কাছে মন্ত্রদীক্ষা (১৯০২)। পরে ১৯২১ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ। কনখলে (১৪ এপ্রিল ১৯২৬) স্নানের সময় নদীতে অপ্রত্যাশিত দেহাবসান।

অবিশ্বাস্য গুরুর আর এক অবিশ্বাস্য শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দ, পূর্বাশ্রমে দক্ষিণারঞ্জন গুহ (১৮৭৪-১৯৩৭)। গুরুর নির্দেশে অসুস্থ সাধুদের চিকিৎসার জন্য কপর্দকহীন অবস্থায় কনখলে আগমন ও সেবাশ্রম স্থাপন। তুলনাহীন এই অনুরাগী দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করে দুর্গত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। গুরুর নির্দেশ মান্য করে কর্মক্ষেত্র ছেড়ে আর কখনও বেলুড় মঠে ফিরে আসেননি কল্যাণানন্দ। খ্যাতির আলোক এড়িয়ে প্রবাসেই তাঁর দেহাবসান ২০ অক্টোবর ১৯৩৭।
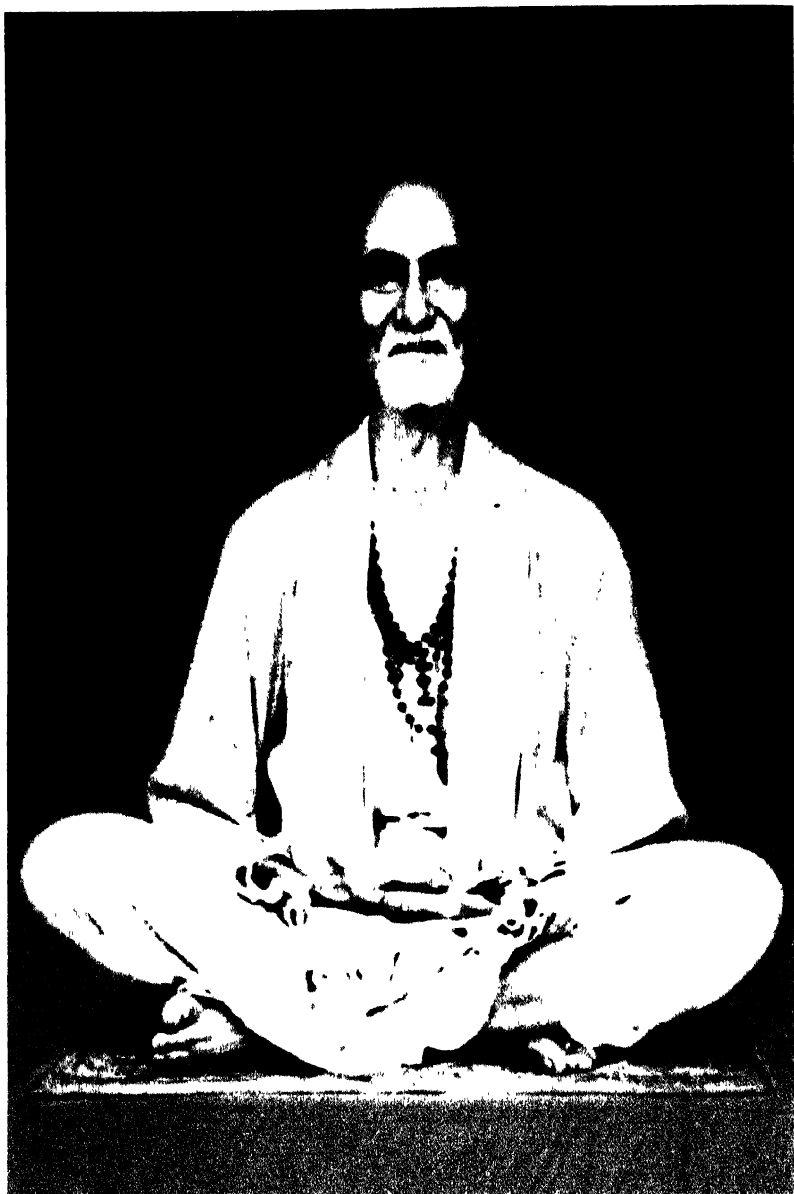
স্বামীজির শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য চির-অনুগত স্বামী অচলানন্দ, যাকে তিনি সস্নেহে কেদারবাবা বলে ডাকতেন। পূর্বনাম কেদারনাথ মৌলিক। জন্ম কাশীতে, ১৯০০ সালে সংসার ত্যাগ করে রাজপুতনার কিষেণগড়ে দুর্ভিক্ষ ত্রাণকার্য এবং পরে কাশী সেবাশ্রমে আত্মনিয়োগ। ভক্তি ও সেবায় আপ্লুত স্বামীজি একবার তাঁকে বলেন, "যা তোর কিছুই করতে হবে না। তোর সব আপনা আপনি হয়ে যাবে।" কাশী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ ১১ মার্চ ১৯৪৭।

আমেরিকার জন্য পরিচয় চাহিতে গিয়াছিলেন, কর্নেল অলকট তখন স্বামীজিকে সচ্চিদানন্দ নামেই জানিয়াছিলেন।... কর্নেল অলকট স্বীয় বন্ধুগণের নিকট স্বামীজিকে পরিচিত করিয়া তো দেনই নাই বরং তাঁহাদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।"

'স্বামী-শিষ্য-সংবাদ' থেকে এবার সামান্য উদ্ধৃতি : স্থান বেলুড় মঠ, কাল—১৯০১ "বেলুড়মঠ স্থাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজি কর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় এবং ভক্ষ্যভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথায় বিশ্বাসী হইয়া শাস্ত্রানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের কার্যকলাপের অযথা নিন্দাবাদ করিত।"

স্বামীজি ঐসব সমালোচনা শুনে বলতেন, "হাতী চলে বাজারমে, কুত্তা ভোঁকে হাজার। সাধুন্‌কো দুর্ভাব নহি যব্ নিন্দে সংসার।"

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী আরও লিখেছেন, "সমাজের তীব্র কটাক্ষ ও সমালোচনাকে স্বামীজি তাঁহার নবভাব-প্রচারের সহায় বলিয়া মনে করিতেন, কখনও উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেন বা তাঁহার আশ্রিত গৃহী ও সন্ন্যাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না।" বরং বলতেন, "ফলাভিসন্ধিহীন হয়ে কাজ করে যা, একদিন ওর ফল নিশ্চয়ই ফলবে।"

কলকাতায় স্বামীজির সংবর্ধনা সভা বানচাল করবার জন্য বড় বড় খবরের কাগজ যে উঠে পড়ে লেগেছিল তা আজ কারও অজানা নয়। স্বামীজি এক চিঠিতে (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) দুঃখ করেছেন, "এদেশ হিংসুক লোকে ভর্তি, যারা আমার কাজকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে কসুর করবে না।"

শুনুন সমকালের ব্যঙ্গোক্তি : "আজিকাল স্বামী হওয়ার যেরূপ হুজুক পড়িয়াছে তাহাতে বোধ হয় কালে স্ত্রী খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইবে।...বিবেকানন্দর বক্তৃতায় নতুন কিছুই নাই।"

"নরেন্দ্রনাথ কি এতই শ্রুতিকঠোর যে উহা না বদলাইলে চলিত

না?...সুরম্য অট্টালিকায় বাস, রাজভোজ ও অনেক বিষয়ে অখাদ্যভোজন ও ভদ্রসন্তানের দ্বারা পদসেবা—সংসারবিরাগী, সন্ন্যাসী নামধারী ব্যক্তির পক্ষে কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়।"

আরও বেদনাদায়ক, সারা বিশ্বে ভারতের জয়গাথা শুনিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শন করতে এসে স্বামীজি বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্রমাণিত হয়েছে, স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরে ঢুকেছিলেন বলে দেবীর পুনরাভিষেকের প্রয়োজন হয়েছিল। এ-বিষয়ে অনেক জলঘোলা হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে বলেন : "যে ব্যক্তি বিদেশে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হিন্দু বলিতে পারে—এমন কাহারও সহিত আমার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকা উচিত বলিয়া আমি বিবেচনা করি নাই।"

স্বামীজির চিহ্নিত ও এই অপমানকার ঘটনার যে উল্লেখ আছে তা পড়লেও লজ্জায় মাথা নত হয়।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামীজিকে অপমানের কলঙ্কিত অধ্যায়টি ভুলে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু এ-বিষয়ে সেই সময়ের সংবাদপত্রে কিছু বাদানুবাদ হয়েছিল। চিঠিপত্রও বেরিয়েছিল। মন্দিরের খাজাঞ্চি ভোলানাথবাবু বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষতঃ মন্দির হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, আর তাঁহার প্রভু লিখিলেন : তাড়ানো হয়েছিল ঠিকই, তবে প্রত্যক্ষতঃ নহে, পরোক্ষতঃ।"

পরবর্তীকালে এবিষয়ে স্বামীজির নিজস্ব বক্তব্য স্টার্ডিকে লেখা একটি চিঠি (১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯) থেকে পাওয়া যায়। "ভারতে অনেকে... ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইউরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল।"

১৮৯৮ সালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবকালে দক্ষিণেশ্বরের সমস্যাটি যে আরও পাকিয়ে উঠেছিল তার স্বীকৃতি রয়েছে লাহোর থেকে ইন্দুমতি মিত্রকে লেখা স্বামীজির আর একটি চিঠিতে (১৫ নভেম্বর ১৮৯৭)— "এবার মহোৎসব হওয়া পর্যন্ত অসম্ভব ; কারণ রাসমণির (বাগানের) মালিক বিলাত-ফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না।"

এই চিঠির আরও অংশ : "আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে কলকাতায় একটি মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোক বরং পূর্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমি ইংলন্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি!!... আমার প্রথম কর্তব্য এই যে রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই-চারিটি বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একটি স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এইসব কারণের জন্য আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ-যাত্রা স্থগিত রাখিলাম।...কলকাতায় একটি মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখ-কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়।"

আপনজনদের অত্যাচার ও অবহেলার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে গেলেও অভিমানী বিবেকানন্দকে আমরা প্রায়ই খুঁজে পাই। ভগ্নশরীরে আলমোড়া (৩০মে ১৮৯৭) থেকে তিনি শেষ চিঠি লেখেন বহুদিনের পরিচিত প্রমদাদাস মিত্রকে। এই চিঠিটি পড়লে হৃদয় আজও বিষণ্ন হয়ে ওঠে। "শুনিলাম, গৌরচর্মবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়...আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা খাই, যার-তার সঙ্গে খাই—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে।...স্মৃতি পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা—ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য।...রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার, কারণ ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ ; রামানুজ-শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র।... আমি পড়েশুনে দেখছি যে, ধর্মকর্ম শূদ্রের জন্য নহে ; সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি করে তো তাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র ও ম্লেচ্ছ—আমার আর ওসব হাঙ্গামে কাজ কি?...এক কথা বুঝেছি যে পরোপকারেই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামো—নিজের মুক্তি-ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়।"

এর পরেও কয়েক কাহন বিড়ম্বনাকাহিনি লিপিবদ্ধ করা কিছু কঠিন কাজ নয়। যেমন বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দের বেলুড় মঠের সঙ্গে স্থানীয় বালি মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক। মঠ হিসেবে স্বীকৃতি না জানিয়ে, এই প্রতিষ্ঠানকে নরেন দত্তর 'প্লেজার হাউস' হিসেবে নথিভুক্ত করে ট্যাক্সের বোঝা বাড়ানো হয়েছিল। এই বিরোধের মোকাবিলায় অপমানিত স্বামীজিকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। সেখানে কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এইমঠে সন্ন্যাসীরা শোফা ব্যবহার করেন, চা পান করেন এবং বিদেশিনীরা নিয়মিত আসেন। এসব যদি বাগানবাড়ির লক্ষণ না হয় তো কী বলা চলে? আদালতে স্বামীজির শেষপর্যন্ত জয় হয়েছিল, কিন্তু তার আগে অনেক কাঠখড় পুড়োতে হয়েছিল।

বেলুড় মঠের ব্যাপারে বিরোধীরা আরও যেসব গুজব ছড়িয়েছিল তা মঠের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

স্বামীজির দেহাবসানের পরেও বালি মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে মঠের সম্পর্ক সহজ হয়নি তারও যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। গঙ্গাতীরে মঠপ্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীর দেহসৎকারের প্রয়োজনীয় অনুমতি দিতে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ যে 'দ্বিধান্বিত' ছিলেন এবং ৩রা জুলাই সকালে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে এবিষয়ে তাঁদের কয়েকবার পত্রবিনিময় হয়েছিল এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি আসতে বিলম্ব হয়েছিল তার ইঙ্গিতও রয়ে গিয়েছে।

শেষপর্বে আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত, রোগযন্ত্রণায় কাতর বিবেকানন্দর ছবিটি মনকে বড় কষ্ট দেয়। মানুষের নিষ্ঠুরতা যে চিরদিনই সীমাহীন তা ভাবলে দুঃখ আরও বেড়ে যায়। আমরা জানি স্বাস্থ্যোদ্ধারে বেরিয়ে স্বামীজি শেষপর্বে শিলং শহরে বড়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রবল হাঁপানির প্রকোপে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হতো, সারা রাত ঘুমোতে পারতেন না। শিলং-এ তোলা স্বামীজির শেষ আলোকচিত্রটি মনে বড় দাগ কেটে যায়। কিন্তু তখনও এই কলকাতায় কেউ কেউ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে বিবি-কা-আনন্দ এই নামে ডেকে কেউ কেউ আনন্দ পাচ্ছেন।

অন্যদিকের রিপোর্ট, বিলেতে অনেকেই তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ

হয়েছিলেন। স্বদেশে নদীয়া ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামী বংশীয় জনৈক অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিবেকানন্দর অভ্যর্থনায় চাঁদা দিয়েছিলেন বলে পরে পরিতাপগ্রস্ত হয়ে একদিন নাকি উপবাসও করেছিলেন।

মহাপণ্ডিত শঙ্খনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বিবেকানন্দবিরোধী ছিলেন। স্বামীজি দেহাবসানের প্রায় দুই দশক পরে কাশীধাম ব্রাহ্মণসভা (১৯২৩) থেকে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন : "শিলং হইতে ফিরিয়া স্বামীজি গৌহাটিতে দুই চারিদিন অবস্থান করেছিলেন। এবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ করিয়াছিলাম। একটি 'রুমে' তিনি ও আমি নির্জনে বসিয়া কথা বলিয়াছিলাম। হাঁপানিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, স্বামীজি, শুনিয়াছি যোগীদের শ্বাসের উপর অধিকার জন্মে—এ দেখিতেছি শ্বাস আপনার উপর অধিকার করিয়া বসিয়াছে! ইহার অর্থ কি?' মনে মনে যাহা ভাবিলাম—তাহা (যখন স্বামীজিকে বলিতে সাহসী হই নাই, তখন) এস্থলে না বলাই সঙ্গত।"

বেলুড়মঠে এই রোগ-জর্জরিত বিনিদ্র বিবেকানন্দের শেষপর্বের ছবি তাঁর প্রিয় গুরুভাই স্বামী ব্রহ্মানন্দের মুখেই শোনা যাক। শেষ পর্ব শরীরের যন্ত্রণায় স্বামীজি অতিপ্রিয়জনদের মাঝে-মাঝে বকতেন। একদিন বকুনি খেয়ে দুঃখে অভিমানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। "কিছুক্ষণ পরেই স্বামীজি দরজায় টোকা মারছেন। দরজা খুললুম। চোখে জল দেখে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দাদা, ঠাকুর তোমাকে কত আদর করতেন, ভালবাসতেন, সেই তোমাকেই আমি বকি, কত কটুকথা বলি, আমি আর তোমাদের কাছে থাকবার যোগ্য নই।"

"বলতে বলতে স্বামীজির চোখে জল ঝরছে, আমি তখন তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে, বললাম, 'তুমি ভালবাস বলেই বকো, বুঝতে পারি না বলে অনেক সময় কান্না পায়।'

স্বামীজি বলতে লাগলেন, 'আমি কী করবো, আমার শরীরটা চব্বিশ ঘণ্টাই জ্বলছে, মাথার ঠিক থাকে না। আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের হয়তো বৃথা কষ্ট দেব। দেখ রাজা, একটা কাজ করতে পারো? ওদের রেসিং হর্স যখন অকেজো হয়ে পড়ে তখন কী করে জানো? তাকে

বন্দুকের গুলিতে মেরে ফেলে। আমি তোমাকে একটা রিভলবার জোগাড় করে দেব, তুমি আমাকে গুলি করে মারতে পারবে? আমাকে মারলে কোনও ক্ষতি হবে না, আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে।'

অবশেষে ৪ঠা জুলাই এলো সমকালের সব বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে আমাদের মহামানবকে।

সমকালের ক্ষুদ্রতা কিন্তু মহামৃত্যুকেও পথের কুকুরের মত তাড়া করে থাকে কখনও কখনও।

শুনুন বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বঙ্গবাসী পত্রিকার মরণোত্তর মন্তব্য : মঠে মৃত্যু।—২৪ পরগণা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঁরামকৃষ্ণ অনেকের পরিচিত। তাঁহার সেই বুদ্ধিমান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত—হাবড়া বেলুড়ের মঠে—ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নরেন্দ্রনাথ অধুনা বিবেকানন্দ-স্বামী বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয় মতভেদ আছে বটে। কিন্তু ইঁহাকে বাহাদুর পুরুষ বলিতে কুণ্ঠিত নহি। ইনি অল্পবয়সে ঁরামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়া আপন মেধা ও বুদ্ধির প্রভাবে এবং বক্তৃতার মোহজালে অনেককেই আশ্চর্যপথে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মার্কিন মুলুকে ইঁহার বাক্-কৃতিত্বের একটা বিজয়ঘোষণা হইয়াছিল। কোনো কোনো রমণী তাঁহারই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া, তাঁহাকে পথপ্রদর্শক গুরুরূপে ভাবিয়া, নূতন পথে আসিয়া, এক নূতন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই বাহাদুরীর কথা। শুনিতে পাই, নরেন্দ্রনাথের বহুমূত্রের পীড়া ছিল। গত সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তিনি বেড়াইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন, কিয়ৎক্ষণ পর তিনি যেন কেমন একটু অসুস্থ হন। অতঃপর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।"

বিড়ম্বনার এই ইতিবৃত্ত শেষ করার সময় বোধ হয় এসে গেল। সম্মান ও অসম্মান, প্রশস্তি ও কুৎসা, সেবা ও অবমাননা, জয়মাল্য ও অবিচার, ভালবাসা ও তীব্র অবিচার, পুষ্পাঞ্জলি ও অন্যায় অবিচার, শ্রদ্ধা ও ঘৃণা, চরিত্রপূজা ও চরিত্রহননের সেই বিচিত্র ভূখণ্ডে আমাদের যুগের সবচেয়ে স্মরণীয় চরিত্রটি দাঁড়িয়ে রয়েছেন একই সঙ্গে নীলকণ্ঠ ও মহামানব রূপে।

কারণে এবং অকারণে বিড়ম্বনার ইন্ধন জুগিয়েছেন তাঁর আপনজন থেকে শুরু করে অপরিচিতরা। তাঁদের মধ্যে যেমন শত্রুরাও আছেন তেমন মিত্ররাও আছেন, বিরোধীরাও আছেন মন্ত্র শিষ্যরাও আছেন, বিদেশীরাও আছেন দেশবাসীরাও আছেন, অজ্ঞরাও আছেন বিজ্ঞরাও আছেন। উদাসীন ইতিহাস বোধ হয় এইভাবেই কীর্তিমানদের মহামূল্যবান জীবন নিয়ে অকারণে খেলা করে।

মৃত্যুঞ্জয়ী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের থেকে এই নির্মম সত্য যে কেউ বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি তার প্রমাণ তিনি নিজেই রেখে গিয়েছেন। দেহাবসানের দু বছর আগে আলামেডা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে (১৮ এপ্রিল ১৯০০) মার্কিনী বান্ধবী ও অনুরাগিনী মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে তিনি আশ্চর্য ভাষায় তা জানিয়ে গিয়েছিলেন :

"আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়।...লড়াইয়ে হার-জিত দুইই হল—এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি।...হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।... আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি–সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!–যাতে আমার প্রাণের ভিতরটা পর্যন্ত কণ্টকিত করে তুলছে! বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে, রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই, প্রভু যাই।"

আর্ত ও পীড়িতদের সেবায় সবধর্মের, বিশেষ করে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের ভূমিকার কথা আজও মানুষের হৃদয় হরণ করে। এঁদের একজন—সন্ন্যাসী উপগুপ্তর সেবাকাহিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে অমর হয়ে রয়েছে। খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের সেবাকাহিনি খ্যাত অখ্যাত নগরে ও জনপদে আজও নিঃশব্দে ঘটে চলেছে। আমরা মাদার তেরেজার অমৃতপ্রেমের কথা কিছুটা জানি, কিন্তু জানি না অখ্যাত আরও সব সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের আত্মত্যাগের কথা। যেমন উনিশ শতকের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণের কথা। একজন অস্ট্রেলীয় গবেষক কিছুকাল আগে এই হাসপাতালে এক শীর্ণতনু লরেটো সন্ন্যাসিনীর কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। যাঁর সেবা তিনি করছেন তাঁর সমস্ত শরীরে সিফিলিসের ঘা—দেহের মাংস খসে খসে পড়ছে।

স্বামীজির সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত কয়েকজন সন্ন্যাসীর বিচিত্র ত্যাগের কথাও আমরা বিস্মৃত হয়েছি। এঁদের নাম স্বামী শুভানন্দ (আদি ঠিকানা কলকাতার মুসলমানপাড়া লেন), স্বামী কল্যাণানন্দ (আদি নিবাস বরিশাল বানারিপাড়া), স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যাঁর জন্ম মহারাষ্ট্রে, স্বামী স্বরূপানন্দ (জন্ম কলকাতায়) এবং স্বামী অচলানন্দ (আদি ঠিকানা কাশী)। জীবিতকালে যাঁদের হাতে নিগৃহীত হয়ে স্বামীজি জীবনের শেষ পর্বে বেশ মনোকষ্ট পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর প্রিয় শিষ্য, শিষ্যা, অনুরাগী এবং অনুরাগিনীরা আছেন, জ্ঞাত অজ্ঞাত কারণে তাঁরা ভক্তের আসন ত্যাগ করে প্রবাসের মাটিতেও প্রক্তন গুরুর তিক্ত বিরোধিতা করেছেন। এঁদের কয়েকজনকে বিড়ম্বিত বিবেকানন্দ পর্বে আমরা দেখেছি, যেমন, স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ, মিস হেনরিয়েটা মুলার ও বহুদিনের ভারতপ্রেমী ই টি স্টার্ডি।

বিদেশের মাটিতে চারজন অনুরাগী যেমন তিক্ত বিচ্ছেদের সৃষ্টি

করলেন তেমন কয়েকজনের কথা বলা যেতে পারে যাঁরা গুরুনির্দেশে প্রতিটি কথা মান্য করার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে দ্বিধা করলেন না। কোন্ মন্ত্রে বিবেকানন্দ তাঁদের এমনভাবে অনুপ্রাণিত করলেন তা তিনিই জানেন।

মনে রাখতে হবে, প্রিয়জনদের অপ্রত্যাশিত শত্রুভাব এবং অনুরাগীর প্রশ্নাতীত প্রেম দুই-ই বিবেকানন্দকাহিনিকে অবিশ্বাস্য মহিমায় আলোকিত করেছে।

এবারের নিবন্ধে আমরা স্বদেশের চারজন অনুরাগীর গুরুনির্দেশে অবিশ্বাস্য ত্যাগের অনুসন্ধান করবো। তার আগে, অনেকের কৌতূহল, এদেশে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত যেক'টি আরোগ্যনিকেতন রয়েছে তার কোনটিকে হাসপাতাল বলা হয় না কেন? কলকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত এক প্রবীণ সন্ন্যাসী আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল বহু শত বর্ষ আগে বৌদ্ধ যুগে এই দেশেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর আরও নিবেদন, শুধু চিকিৎসাতেই আরোগ্য হয় না, মস্ত বড় ভূমিকা করেছে সেবার। নার্সিং কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝে সারা বিশ্ব এখন এই প্রফেশনের জয়গানে মুখর, কিন্তু সেবক ও সেবিকাদের আচরণবিধি বৌদ্ধযুগের ভারতীয় সন্ন্যাসীরাই রচনা করেছিলেন। অঙ্কটা এইরকম : চিকিৎসা + সেবা = আরোগ্য।

রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালগুলি তাই 'সেবাশ্রম' অথবা 'সেবা প্রতিষ্ঠান'।

কনখলের সেবাশ্রমের আদিযুগের এক গল্প বলা যেতে পারে। বরিশালের বানারিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করে এক গোঁয়ার বাঙাল স্রেফ স্বামীজির ইচ্ছায় হাজির হয়েছিলেন হরিদ্বারের লাগোয়া জনপদ কন্‌খলে। সেখানে একবার কয়েকজন কর্মী চাইলেন, এটাকে হাসপাতাল বলা হোক এবং কাজের সময় নির্দিষ্ট হোক।

সন্ন্যাসী তার উত্তরে বললেন, "দেখ, আমাদের তো আর হাসপাতাল নয়। স্বামী বিবেকানন্দ পাঠিয়েছেন সেবা করবার জন্য। এটা হচ্ছে সেবাশ্রম। এখানে বাপু ঘড়ি ধরে কাজ চলবে না। আমাদের হল সেবা ভাব।" অর্থাৎ হাসপাতাল নয়, সাধন-ক্ষেত্র—ভগবদুপাসনার স্থান।

ঘুরে-ফিরে কয়েকজন স্মরণীয় শিষ্য ও অনুরাগীর নাম এতদিন পরেও খুঁজে পাওয়া যায়। এঁদের একজনের জন্ম মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ কানাড়ায়, একজনের ভবানীপুরে, একজনের চব্বিশ পরগণা ইছাপুরে, একজনের বেনারসে এবং আর একজনের বরিশাল উজিরপুরের হানুয়া গ্রামে। কী ছিল বিধাতার মনে, এঁদের মানবপ্রেমের প্রকাশ ঘটল কাশিতে এবং কন্‌খলে।

তৃতীয় জনের বিবেকানন্দ অনুরাগের উৎস কাব্যপাঠ। সদ্য প্রকাশিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় স্বামীজি অবিশ্বাস্য একটি কবিতা লিখেছিলেন। অধুনালুপ্ত আর একটি পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় স্বামীজির হস্তক্ষরে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এবারের নাম 'আঁধারে আলোক।' উদ্বোধনে নাম ছিল 'সখার প্রতি'। কবি বিবেকানন্দের রচনাটি কলকাতায় ছাপা হয়ে সুদূর কাশীধামে পৌঁছে তাঁর জীবিতকালেই কী কাণ্ড করেছিল তা যথাস্থানে নিবেদন করবো। অনুপ্রাণিত ভক্তরা বলে থাকেন, এমন কবিতা পৃথিবীতে আর লেখা হয়নি।

কবিতার শেষ দুটি লাইন— বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।—বোধ হয় আমাদের পরমপ্রিয় মহামানবের মহত্তম বাণী, কিন্তু বাকি কবিতাটি কি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অকপট স্বীকারোক্তি? এবার বসুমতী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ফেরা যাক। "শ্রীমদ্‌ স্বামী বিবেকানন্দের হস্তলিপির নতুন শিরোনাম 'আঁধারে আলোক'।" এই নামটি কোথা থেকে এল? এই নামেই কি প্রথম কবিতাটি লেখা হয়েছিল? না পরে নামের পরিবর্তন হয়? এই পরিবর্তনের মালিকানা কি স্বয়ং কবির? না পরবর্তীকালের সম্পাদকের? কিন্তু এই কবিতা তো কবির জীবিতকালেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বসুমতীতে মুদ্রিত এই হস্তলিপিটিই কি কবি বিবেকানন্দের প্রথম পাণ্ডুলিপি? কারণ, যা এখন আমরা ছাপার অক্ষরে পঞ্চাশ লাইনে পড়তে অভ্যস্ত তা স্বামীজির নিজস্ব হস্তলিপিতে অর্ধেক আকারে পঁচিশ লাইনে আবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে।

বিবেকানন্দর এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় উদ্বোধন পত্রিকার

দ্বিতীয় সংখ্যায়। উদ্বোধন প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ১৪ জানুয়ারি ১৮৯৯।

এই সময়কার ঘটনা শুনুন। পাঠকের নাম চারুচন্দ্র দাস, কলকাতার ঠিকানা মুসলমানপাড়া লেন, রিপন কলেজে পড়াশোনা। একসময় কলকাতার অ্যাটর্নি ফার্ম সোইল্‌হ্‌ এন্ড চন্দ্রতে কেরানি হিসেবে সকাল দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত কাজ করতেন। স্বামীজি যেদিন পাশ্চাত্যদেশ জয় করে প্রথমবার স্বদেশে ফিরলেন, সেদিন (১৮৯৭, ২১ ফেব্রুয়ারি) শিয়ালদহে স্বামীজির ঘোড়ার গাড়ি টেনে চারুচন্দ্র ভেবেছিলেন পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানছেন। পরের বছর পিতা শ্যামশঙ্কর দাস ও মা কাশীবাসী হলে চারুচন্দ্রও কাশীবাসী হন, ওখানে একটা স্কুলে মাস্টারি করেন, মাইনে নেই তবে বিনামূল্যে মধ্যাহ্নভোজন আছে।

"কলিকাতা হইতে ডাকযোগে 'উদ্বোধন' আসিয়া চারুচন্দ্রের হাতে পৌঁছাইল। 'উদ্বোধন' খুলিয়াই চারুচন্দ্রের চোখে পড়িল স্বামীজি-রচিত অগ্নিগর্ভ কবিতা 'সখার প্রতি'। বার বার কবিতাটির শেষ পঙ্‌ক্তি চারিটি তিনি পড়িতে লাগিলেন :

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

"কবিতার প্রতি ছত্র চারুচন্দ্রের ভাবজগতে মহাবিপ্লবের সূচনা করিল। পড়িতে পড়িতে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, অন্তরে এক অননুভূতপূর্ব পুলক অনুভব করিলেন। স্বামীজির আহ্বানে তিনি শিহরিয়া উঠিতেছিলেন—আনন্দের আতিশয্যে অস্থির হইয়া 'উদ্বোধন' খানি হাতে লইয়া জনৈক বন্ধুর গৃহে তখনই ছুটিয়া যান।...

"সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল তখন। বন্ধুটি তাঁহার ঘরের কোণে বসিয়া একান্তে ভগবচ্চিন্তা করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই তাঁহাকে আসন হইতে তুলিয়া, পঠিত 'উদ্বোধন'-এর সেই পৃষ্ঠাটি খুলিয়া উদাত্তস্বরে তাঁহার কাছে পাঠ করিতে থাকিলেন। আনন্দে আবেগে বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'আরে স্বামিজীর কথা শোন। কি তুমি ঘরের

কোণে চোখ বুজে আছ! এই শোন স্বামিজীর বেদান্তবাণী। ঐ যে সম্মুখে ব্যাধি-পীড়িত বুভুক্ষু দরিদ্রদের দেখছ, ওরাই আমাদের ঈশ্বর— আমাদের নারায়ণ—আমাদের শিব।'

চারুচন্দ্রের কাশীপ্রবাসী এই ধর্মপ্রাণ বন্ধুটির নাম যামিনীরঞ্জন মজুমদার। পরবর্তীকালে স্বামীজি এঁকেও মন্ত্রদীক্ষা দেন। উভয় বন্ধুই যেন তাঁহাদের বহুপ্রতীক্ষিত আদর্শ-পথকে এতদিনে খুঁজিয়া পাইলেন। চারুচন্দ্র আবার বলিতে থাকিলেন, "শোন যামিনী, স্বামীজি বলেছেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই জগতের প্রত্যেক জীবের মধ্যেই অধিষ্ঠান করছেন। সর্বভূতে ব্রহ্ম রয়েছেন—এই ভাবটিকে জাগিয়ে তোলাই সকল ধর্মের, সকল সাধনার এবং সকল কর্মের সারকথা। আজ স্বামিজী আমাদের এই কথাই বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধনা।" যামিনীরও প্রতি শিরায় শিরায় তখন বিবেকানন্দ-তড়িৎপ্রবাহ ছুটতে শুরু করেছিল। স্বামিজীর ভাবাদর্শে দীক্ষাগ্রহণ চারুচন্দ্রের এইভাবেই হয়েছিল।

"অবিমুক্ত বারাণসী—সনাতন ভারতের প্রাচীনতম তীর্থ। যুগ যুগ ধরিয়া এই তীর্থভূমিতে কত মানুষের ভিড়—কত সাধু সন্ন্যাসী পরিব্রাজকের আনা-গোনা এখানে চলিতেছে! মুক্তিকামী অসংখ্য নরনারী জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার চরণ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া থাকেন। তখনকার দিনে সুবিধাবাদী পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের উপর নানাভাবে নির্যাতন করিত। যাত্রীদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইলে তাঁহার টাকাকড়ি সব কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় ধর্মশালা হইতে পথে বাহির করিয়া দিত। যাত্রীটি যদি বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা হইতেন, তবে তাঁহার যে কী শোচনীয় পরিণতি হইত, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। অসহায় এইসব যাত্রীরা পথে পড়িয়াই মরিতেন।

"চারুচন্দ্রের পূর্বোক্ত বন্ধু যামিনীরঞ্জন অনুরূপ একটি বৃদ্ধাকে পথের ধারে মরণোন্মুখ দেখিয়া, স্বহস্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেদিন ছিল ১৩ই জুন—অর্থাৎ চারুচন্দ্রের মুখে 'সখার প্রতি' আবৃত্তি শুনিবার ঠিক পরের দিন। যামিনী ছত্রের ভিক্ষায় জীবন ধারণ করিতেন, আর নিত্য

গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাদর্শন এবং সাধন-ভজন লইয়াই দিন কাটাইতেন। সেদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানান্তে ফিরিবার পথে মুমূর্ষু এই বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাণ ব্যথায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

"মৃতপ্রায় বুড়ীর সর্বাঙ্গ মল-মূত্রে ঢাকিয়া ছিল—যামিনীরঞ্জন বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে তাঁহার দেহ পরিষ্কার করিয়া, পরম যত্নে তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া একটি রোয়াকে শোয়াইয়া দিয়া পথ্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। পথ্য সংগ্রহ তিনি করিবেন কোথা হইতে? তিনি নিজে তো ভিক্ষাজীবী। তাই পথচারী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হাত পাতিয়া চার আনা পয়সা ভিক্ষা লইয়াছিলেন—উহা দিয়া একটু গরম দুধ কিনিয়া বুড়ীর মুখে দিয়া তখনকার মতো তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য অনেক চেষ্টায়, অনেক বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাকে ভেলুপুর হাসপাতালে ভর্তি করাইয়া দিয়া শুশ্রূষাদির ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। নিজেরাই চাঁদা তুলিয়া হাসপাতালের ঔষধ-পথ্যাদির খরচ বহন যামিনীপ্রমুখ যুবকরাই করিয়াছিলেন।

"যামিনীর এই সেবাকার্যে সেদিন চারুচন্দ্রই ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা। যামিনীর পশ্চাতে চারুচন্দ্র. কেদারনাথ প্রভৃতি যুবকরা আসিয়া একে একে দাঁড়াইতেই, তাঁহারও বুকে বল-ভরসা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, যামিনীরঞ্জনের উদ্যোগে ও চারুচন্দ্র-কেদারনাথের মিলিত উৎসাহ ও সমর্থনে এবং তাঁহাদের আর আর যুবক বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় সেদিনের এই ক্ষুদ্র সেবানুষ্ঠানেই বর্তমান কাশী সেবাশ্রমের বিরাট সেবাযজ্ঞের সূচনা। সেদিক দিয়া বলা যায়, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুন সেবাশ্রমের প্রারম্ভ-দিবস।

"চারুচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী পরম উৎসাহের সহিত বারাণসীর গলিতে গলিতে ঘুরিয়া আর্ত, পীড়িত, অসহায়, কাহাকেও দেখিলে, প্রাণপণ করিয়া নারায়ণজ্ঞানে তাঁহার সেবাদি করিতে আরম্ভ করিলেন।

"অনাথাশ্রম বা Poor Men's Relief Association নামে একটি সমিতি এইভাবে ধীরে ধীরে চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত হইয়া উঠিল। নিজেরা চাঁদা দিয়া এবং ভিক্ষা করিয়া রোগী-নারায়ণদের জন্য ঔষধ-পথ্য ও বিছানা-

কম্বল এবং হাসপাতালের খরচ ইত্যাদি নির্বাহ করিতেন। কেদারনাথের বাড়ীতেই এই সমিতির কার্যালয় ছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় রামাপুরায় ডি ৩২।৮২ জঙ্গমবাড়িতে একটি ঘরে এবং পরে ক্রমান্বয়ে কার্যের পরিবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, ২২৭ দশাশ্বমেধ ঘাটে (১৯০১-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি), ও ডি ৩৮।১৫৩ রামাপুরায় (১৯০১-এর ২রা জুন) উহা স্থানান্তরিত হয়। অনাথাশ্রম সমিতির কার্য ক্রমশঃ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। চারুচন্দ্রও সংসারের সংস্রব ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া অনাথাশ্রমের সেবাকার্যেই সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন।...”

সকলের বিস্ময় স্বামীজির একটি কবিতা থেকে কি করে বিশাল এক সেবাযজ্ঞের সূচনা হতে পারে। নৃত্যকালী দাসী সম্পর্কে আরও কিছু জানা যায় স্বামী অচলানন্দ (পূর্বশ্রমে কেদারনাথ মৌলিক) ও যামিনী মজুদারের জীবনকথা থেকে। “পথের ধারে একটি অনাথা বৃদ্ধাকে মরোণন্মুখ দেখিয়া তাঁহারা নিজেরাই ডুলি করিয়া বহন করিয়া ভেলপুরার হাসপাতালে লইয়া যান। বৃদ্ধার অবস্থা এতই শোচনীয় যে হাসপাতাল তাহাকে ভর্তি করিতে রাজি হইল না, নিরুপায় যুবকগণ পুনরায় ডুলি করিয়া বৃদ্ধাকে চৌকাঘাট হাসপাতালে ভর্তি করিয়া, সেবা-শুশ্রূষার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।”

১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বারাণসীতে এসেছিলেন তখন এই সেবাকর্মের কথা তিনি ভালভাবে জানতেন। একদিন স্বামীজি বললেন, তোমরা কিন্তু তোমাদের কর্মজীবনে দয়াকে উচ্চস্থান নির্দেশ করেছ। মনে রেখো, দয়া প্রদর্শনের অধিকার তোমাদের নেই। যিনি সর্বভূতের ঈশ্বর তিনিই দয়া প্রদর্শনের অধিকারী। যে দয়া করতে চায়, সে নিশ্চই গর্বিত ও অহঙ্কৃত। কারণ সে অপরকে নিজের চেয়ে নীচ ও হীন মনে করে। দয়া নয়—সেবাই তোমাদের জীবনের নীতি হোক।” শেষ পর্যন্ত নাম রাখা হলো রামকৃষ্ণ হোম অফ সার্ভিস। স্বামীজির দেহাবসানের চারমাস পরে (নভেম্বর ১৯০২) সেবাশ্রমের সেবকগণ এই প্রতিষ্ঠানকে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেন।

জীবনের শেষপর্বে অসুস্থ অবস্থায় স্বামীজি তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন,

"কাশীর কাজই আমার শেষ কাজ।" আরও একটা আশ্চর্য ঘটনা, কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামীজির দেহাবসানের দিনেই—৪ঠা জুলাই ১৯০২।

সম্প্রতি ছোট্ট একটি ইংরিজি বই হাতে এসে গেল। বইয়ের নামটা—'তুমি একদিন পরমহংস হবে'। লেখক আমার পরিচিত নন। কিন্তু খবর পেলাম, স্বামী সর্বগতানন্দর বয়স ৯৩ (জন্ম ১৯১২), বহুদিন বিদেশে আছেন, আগস্ট ১৯৫৮-এ বোস্টন, ইউ এস এ নিবাসী। পূর্বাশ্রমে মুসিভিভারমে (অন্ধ্রপ্রদেশে) থাকতেন, ডাকনাম নারায়ণ।

নারায়ণ মহারাজেরও জীবন নাটকীয়, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনে বিশেষ আগ্রহী হয়ে তিনি সারগাছিয়া আশ্রমে ঠাকুরের সাক্ষাৎশিষ্য, বিবেকানন্দর গুরুভাই এবং পরবর্তীকালে মঠমিশনের সভাপতি স্বামী অখণ্ডানন্দর সান্নিধ্যে আসেন। এই প্রেমিক পুরুষই প্রথম শিবজ্ঞানে জীবসেবার বাস্তব রূপায়ণের পথিকৃৎ হিসেবে অমর হয়ে আছেন। পরিব্রাজক জীবন থেকেই অখণ্ডানন্দ শুরু করেন তাঁর সেবাব্রত। রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা ১ মে ১৮৯৭। ঠিক ১৫ দিন পরে মুর্শিদাবাদের কেদারমাটি— মহুলায় মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের চণ্ডীমণ্ডপে অনাহারী মানুষকে বাঁচাবার জন্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ শুরু করেন দুর্ভিক্ষত্রাণ।

সারগাছিতে বসে অখণ্ডানন্দ বলতেন, স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সেবার মাধ্যমে নিজের মুক্তিসাধনা করবার পরামর্শ সন্ন্যাসীদের দিলেন। আগে ধারণা ছিল কাজকর্মের মাধ্যমে ভগবান লাভ করা সম্ভব নয়। ভগবান লাভের জন্য নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত মনকে একাগ্র করে রাখতে হয়। কাজকর্ম করতে গেলে মনের বিক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। সেই জন্য সন্ন্যাসীরা আগে কর্মত্যাগ করতেন।

সন্ন্যাসী জীবনের পূর্বাহ্নে স্বামীজি তাঁর গুরুভাই গ্যাঞ্জেসকে লিখেছিলেন, "যে আপনি নরক পর্যন্ত গিয়েও জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণর পুত্র। যে এই মহাসন্ধিক্ষণের সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বহন করবে সেই

আমার ভাই—সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা—যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না। প্রাণত্যাগ হলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী তারা।"

বিবেকানন্দের দেহাবসানের অনেক পরে তিরিশের দশকে সারগাছি আশ্রম থেকে সুদূর কনখলে লেখা স্বামী অখণ্ডানন্দের একটা চিঠি থেকেই নারায়ণ মহারাজ ওরফে স্বামী সর্বগতানন্দর স্মৃতিচারণার শুরু।

তারিখটা ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫, স্থান হরিদ্বার। "বাজারের কাছে এসে যখন আমি জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় কেন্দ্রটা কোথায় তখন কেউই আমার কথাটা বুঝতে পারছে না। খুঁজতে-খুঁজতে শেষ পর্যন্ত গঙ্গা খালের ধারে একটা সুন্দর বাড়ি নজরে এলো, সেখানে সাইনবোর্ড আঁটা 'ম্যাড্রাসি ধর্মশালা'। ভিতরে ঢুকে গিয়ে এক স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম; রামকৃষ্ণ মিশন সেন্টারটা কোথায়? সন্ন্যাসী বলল, ও! তুমি বাঙালি হাসপাতালের কথা জিজ্ঞেস করছ! তাই হবে নিশ্চয়। সন্ন্যাসী জানতে চাইল, কেন আমি ওখানে যেতে চাইছি? আমি বললাম, 'আমি মিশনে যোগ দিতে এসেছি।' আমি কোথা থেকে এসেছি জানতে চাইলেন সন্ন্যাসী, আমি বললাম। সন্ন্যাসী আমাকে নিরুৎসাহ করে বললেন, আমাদের এখানে যোগ দাও। 'না, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

এবার সন্ন্যাসীর কাছ থেকে পথের নিশানা মিলল। "ব্রিজ পেরিয়ে কনখল রোড ধরে এগিয়ে যাও।"

তরুণ ছেলেটি হাঁটতে-হাঁটতে নিজের ঠিকানার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বড়রাস্তা থেকে একটা ছোটরাস্তা ডানদিকে বেঁকে গিয়েছে। সেখানেই মস্ত এক কম্পাউন্ড দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে। সম্পত্তিটার একটা নয় পাঁচটা গেট। ওইখানেই এসে থমকে দাঁড়ালেন অন্ধ্রের যুবক নারায়ণ।

ভিতরে ঢোকা বেশ শক্ত, কারণ প্রত্যেকটা গেটই বন্ধ, দেখলেই বোঝা যায় নিয়মিত খোলা হয় না। একটা ছোট্ট গেটকে চালু অবস্থায় মনে হলো, সেইটা দিয়েই আগন্তুকের অবশেষে বাঙালি হাসপাতালের প্রাঙ্গণে প্রবেশ। কেউ কোথাও নেই। আরও একটু হেঁটে, একটা বেড়া টপকাতে হলো,

কারণ গেট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবার একটা প্রাঙ্গণ এবং সুন্দর বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। পরবর্তী দৃশ্য: হাফ হাতা শার্ট পরে এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গী বিরাট সাইজের এক কুকুর। কুকুর দেখে রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে নবাগতের, তবু সাহস ভর করে এগোতে হলো।

অবাক কাণ্ড! সন্ন্যাসী এই ছেলেটিকে বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, "তুমিই কি নারায়ণ?" "হ্যাঁ, মহারাজ।" সন্ন্যাসী বললেন, কিছুদিন আগে স্বামী অখণ্ডানন্দর চিঠি থেকে জানলাম, তুমি আসছ।"

ইনিই স্বামী কল্যাণানন্দ। "মহারাজ খুব খুশি হলেন, আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে দেখে কুকুরটা ধরে নিল, মহারাজের চেনাজানা লোক আমি, তাই সন্তুষ্ট হয়ে, সব সন্দেহ বিসর্জন দিয়ে সে খুব বন্ধুভাবে গা ঘেঁষে দাঁড়াল এবং ল্যাজ নাড়তে লাগল।"

আগন্তুক তখনও সব খবর দেয়নি। শুধু বলেছে, "আজই হরিদ্বারে পৌঁছনো গেছে।" মহারাজ এবার ব্রহ্মচারী বাসুদেবকে ডেকে বললেন যে-বাড়িতে মহারাজ থাকেন সেখানেই একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। বাংলায় আরও বললেন, ওর স্নানের ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু জামাকাপড়ও দিতে হবে। তিরানব্বই বছরের সর্বগতানন্দ পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিকথায় স্মরণ করছেন, ব্রহ্মচারীটি খুবই মধুর স্বভাবের, কথাবার্তা ভারি মিষ্টি। এবার আরও একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হলো, "তাদের আচরণে এমন ভাব যেন আমার সঙ্গে কতদিনের চেনাশোনা।"

নবাগত স্নান সেরে বেরিয়ে এসে দেখলেন একপ্রস্থ পরিষ্কার জামাকাপড় অপেক্ষা করছে, জামাটা এমন ফিট করে গেল যেন ওঁর মাপ নিয়েই তৈরি! এই ব্রহ্মচারীরা বিছানাও তৈরি করে দিল। তারপর যত্ন করে খাওয়াদাওয়া।

এবার মহারাজের কাছে প্রত্যাবর্তন। "আমাকে খুঁটিয়ে দেখে তিনি বললেন, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।" আত্মকথার এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখক সর্বগতানন্দ লিখছেন, "আমার পায়ে খুব কষ্ট, শরীরও এমন অসুস্থ যে পরেরদিনই হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো।"

মহারাজের দয়ার শরীর, এই মন্তব্যটুকু করেছেন সন্ন্যাসী সর্বগতানন্দ, কিন্তু যা উল্লেখ করেননি তা আমাকে অন্য সূত্র থেকে সংগ্রহ করতে হলো। অন্ধ্রপ্রদেশের এই তরুণটি মানুষের সেবা করবার উদ্দেশে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে দেখা করলে, গঙ্গাধর মহারাজ তাঁকে দীক্ষা দেন। তারপর একসময় বললেন, "এখান থেকে হাজার মাইল দূরে কন্‌খল, সেখানে মিশনের একটা সেবাশ্রম আছে। সেখানে তোমাকে যেতে হবে, কিন্তু পায়ে হেঁটে, পারবে তো?" এমন কথা তাঁর মুখেই সাজে, খালি পায়ে যিনি এই উপমহাদেশের হাজার হাজার মাইল চষে বেড়িয়েছেন। বাইশ বছরের নারায়ণ পায়ের জুতো খুলে ফেললেন, তারপর (ডিসেম্বর ১৯৩৪) শুরু হলো সুদূর হরিদ্বারের উদ্দেশে পদযাত্রা। নানা তীর্থ অতিক্রম করে হাঁটতে- হাঁটতে কপর্দকহীন নারায়ণ ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে হরিদ্বারে এসে পৌঁছলেন।

এবার শুনুন লেখকের নিজের মুখেই। "স্বামী কল্যাণানন্দ আমাকে আমার অতীত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, জানতে চাইলেন অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে আমার কিভাবে আলাপ হলো? তারপরে মহারাজের চিঠিটা পড়ে শোনালেন, 'এই ছেলেটিকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, ওকে দেখাশোনা কোরো।' আর কিছু বিবরণ নেই, এমন কি আমি যে সন্ন্যাস নিতে আগ্রহী তারও উল্লেখ নেই। পরে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য একসময় কল্যাণানন্দজী বলেছিলেন, সারাজীবনে কেউ আমার কাছে কাউকে পাঠায়নি যার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে।

"মাত্র কয়েকমাস আগে অখণ্ডানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি হতে চাই? আমি বলেছি, আমি বিবেকানন্দ বাণী ও রচনা পড়েছি, অরবিন্দ ও রমণ মহর্ষি সম্পর্কেও কিছু জেনেছি, মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশ্রয়ে কিছু সমাজসেবাও করেছি। অখণ্ডানন্দজীকে বলেছি, এমন একটা জায়গার সন্ধান করছি যেখানে মানুষের সেবা এবং নিজের সাধনা একই সঙ্গে চলবে। স্বামী অখণ্ডানন্দ বললেন, তুমি যেরকমটি চাইছ ঠিক সেইরকম একটা জায়গায় তোমাকে পাঠাব। জায়গাটা তোমার ভালো লাগবে, কারণ ওখানে একজন

যোগ্য লোক রয়েছেন। এইভাবেই আমার কনখলে উপস্থিত হওয়া এবং স্বামী কল্যাণানন্দকে খুঁজে পাওয়া—স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্যটি এইখানেই তাঁর সেবাকর্ম ও সাধনা একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষটিকে আমার খুব ভালো লেগে গেল, এমন একজন আদর্শ পুরুষকেই তো আমি খুঁজে মরছিলাম।"

স্বামী কল্যাণানন্দের অবিশ্বাস্য জীবনকথার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার সময় এবার উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তার আগে কনখলে স্বামী সর্বগতানন্দের প্রথম কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে, এইসব কথা তিরানব্বুই বছরের সন্ন্যাসী সুদূর আমেরিকার প্রবাসে বসেও ভুলতে সমর্থ হননি।

"কনখলে পৌঁছবার কদিনের মধ্যেই কল্যাণানন্দজীকে বললাম, 'হাসপাতালের কাজে আমি সাহায্য করতে চাই।' তিনি বললেন, করা তো সহজ, কিন্তু জানাটা সহজ নয়।' কি জানতে হবে রে বাবা? আমি ভেবে পাচ্ছি না। ওদের বেশ লোকাভাব, অথচ হাসপাতালে এত কিছু করার রয়েছে। আমি ওদের সাহায্য করতে চাই। হাতগুটিয়ে বসে থাকবার জন্যে আমি তো এখানে আসিনি।"

"এখানে আসবার আগে তুমি কি করতে?" কল্যাণানন্দজী একদিন জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ব্যাংকিং এবং অ্যাকাউন্টিং-এ যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে।

"এইটাই তো আমি চাইছিলাম!" ওঁর সহযোগী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কিছুদিন আগে শরীর রেখেছেন। তারপর কয়েকমাস অ্যাকাউন্টিং-এর কিছুই করা হয়নি। "এবার এসবের দিকে নজর দাও।" তারপরেই মহারাজের রসিকতা: 'জীবনকালে চুন-সুরকির ব্যবসা করত এমন একজন লোক স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে মানুষটা কি করবে?' ওখানে অবশ্যই চুন-সুরকি বেচবে। তুমিও সাক্ষাৎ স্বর্গে এসেছ, কিন্তু তোমার ভাগ্যেও একই অবস্থা হতে চলেছে।"

মহারাজ কাজের ব্যাপারটা নবাগতকে বোঝাতে বসলেন খুবই গম্ভীরভাবে। তাঁর নির্দেশ, সহযোগী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যেভাবে হিসেব

রাখতেন ঠিক সেইভাবে হিসেব রাখতে হবে, একচুল হেরফের চলবে না। মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসী সুরজ রাওয়ের (১৮৬৫) সামান্য পরিচয় প্রয়োজন। আপাতত জেনে রাখা ভালো, গুরু স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পরে বেলুড়মঠ ছেড়ে পরিব্রাজকরূপে নানা তীর্থ ঘুরতে ঘুরতে সেনাবিভাগের প্রাক্তন কর্মী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ এই কনখলে হাজির হন, তারপর একত্রিশ বছর ধরে গুরুভাই স্বামী কল্যাণানন্দের সঙ্গে এই হাসপাতালে সাক্ষাৎ নারায়ণের বিরামহীন সেবা করেছেন। পদ্মাসনে ধ্যানযোগে তাঁর দেহাবসান ২২ অক্টোবর ১৯৩৪।

"অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারে কল্যাণানন্দজী যা বলেছেন তা সত্য, ছ'মাস কিছু হয়নি, কিন্তু হিসেব নিকেশ হাল আমূল পর্যন্ত করে ফেলতে সময় লাগল না আমার। মহারাজকে জানালাম, আমি বকেয়া কাজ সেরে ফেলেছি। এবার মহারাজ নির্দেশ দিলেন, বেলুড়মঠে পাঠানোর জন্যে পাকা অ্যাকাউন্ট তৈরি করো। বেলুড়ে পাঠানোর অ্যাকাউন্ট খুবই মজার। মহারাজের অফিস দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝোলানো থাকত, যে মাসটা শেষ হয়ে গিয়েছে সেই পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে তার পিছনে হিসেবপত্তর লেখা হতো। তারপর ফাইনাল ফিগারগুলো বেলুড় মঠের অ্যাকাউন্টিং নিয়মকানুন অনুযায়ী লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ক্যালেন্ডারের ছেঁড়া পাতাটাই আমাদের অফিস কপি! মহারাজের নীতি, যথাসাধ্য কম দিয়ে যতসম্ভব বেশি কাজ করতে হবে।

"আমি একসময় সুযোগ বুঝে বললাম, ঠিক মতন অ্যাকাউন্টসের জন্যে একটা জার্নাল, লেজার বই এবং কিছু কাগজপত্তর লাগবে। মহারাজ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব আমাদের দরকার হবে কেন? আমি পঁয়ত্রিশ বছর হাসপাতাল চালিয়েছি এইসব ছাড়াই, এখন তুমি এসে বলছ, এসব ছাড়া কাজ চলবে না।'

"মহারাজ এসব থাকলে আমাদের হিসেব-নিকেশের খুঁটিনাটি স্বচ্ছ থাকবে!" কল্যাণানন্দজী এই সময় আমার নজরদারিতে স্থানীয় পোস্টাপিস থেকে কিছু বাড়তি টাকা ফেরত পান. তাতে খুব খুশি হয়ে নতুন হিসাববিশারদের উপযোগিতা তিনি বুঝতে পারলেন এবং খুশি হয়ে

অনুমতি দিলেন, যা যা তোমার দরকার তা কিনে নাও।

তরুণ সর্বগতানন্দের চোখ দিয়ে আমরা বিবেকানন্দের সৃষ্টি কল্যাণানন্দজীর অবিশ্বাস্য কাহিনি অনুসরণ করব। এদেশের ইতিহাস কত বিচিত্র মানবপ্রেমী-সাধকের নিঃশব্দ দানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার কিছুটা আমরা জানতে পারব। বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দর অন্ত্যলীলার শেষ দু'বছরে স্বামীজির দুই সন্ন্যাসী শিষ্যের আদিকথার সামান্য কিছু জেনে রাখলে মন্দ হয় না। আরও কয়েকজন বিবেকানন্দশিষ্যকে বিস্মৃতির অতল গর্ভ থেকে তুলে আনতে হবে। এই পাঁচজন হলেন: কল্যাণানন্দ (পূর্বাশ্রমে দক্ষিণারঞ্জন গুহ), নিশ্চয়ানন্দ (পূর্বাশ্রমে সুরজ রাও), স্বরূপানন্দ (পূর্বাশ্রমে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায়), অচলানন্দ (পূর্বাশ্রমে কেদারনাথ মৌলিক) এবং অবশ্যই শুভানন্দ (চারুচন্দ্র দাস)। এঁরা কি পেয়েছিলেন স্বামীজি কাছ থেকে, কোন মন্ত্রে তিনি এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এঁদের তা শুনলেও বিশ্বাস হয় না।

বরিশাল উজিরপুরের হালুয়াগ্রামের আদর্শপরায়ণ সংসারবিরাগী দক্ষিণারঞ্জন গুহ মহাশয় ২৪ বছর বয়সে (১৮৯৮) বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে দু'বছর ডাক্তাবি পড়েছেন. স্বামীজি স্বয়ং তখন বেলুড়মঠে উপস্থিত।

গ্রাম থেকে আসা সরল যুবকটিকে রসিকতাচ্ছলে স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ধর আমার কিছু টাকা দরকার, তার জন্যে যদি তোকে চা-বাগানের কুলী বলে বিক্রি করি—তুই রাজী আছিস তো?" বরিশালের বানারিপাড়া স্কুল থেকে পাশ করা দক্ষিণারঞ্জন এক কথায় রাজী!

স্বামীজি ঠিক কবে দক্ষিণারঞ্জনকে সন্ন্যাস দিয়ে কল্যাণানন্দ নাম দেন তা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়বার পশ্চিমে যাবার আগে ১৮৯৯ সালে কোনোসময় ব্যাপারটা ঘটেছিল। স্বামী সর্বগতানন্দ ভ্রমক্রমে সন্ন্যাসের বছরটি ১৯০০ বলে চিহ্নিত করেছেন। বেলুড়ে সন্ন্যাস দিয়ে স্বামীজি বললেন, "কল্যাণ, আমাকে কি গুরুদক্ষিণা দেবে?" কল্যাণের কাছে কিছুই ছিল না, তিনি বললেন, "আমি নিজেকেই আপনার দাসরূপে আপনাকে নিবেদন করছি।

আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই করব।”

স্বামীজির দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রার পরে কল্যাণানন্দ তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে ছিল স্বামী শুদ্ধানন্দের (পরবর্তীকালে মঠের অধ্যক্ষ) একটি পরিচয়পত্র। কাশীতে কল্যাণানন্দের দেখা হলো স্বামীজির আর এক ভক্ত (পরে স্বামী অচলানন্দ) কেদারনাথ মৌলিকের সঙ্গে। এঁর জন্ম শিক্ষা-দীক্ষা সব বারাণসীতে। স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচয়পত্র দেখে কেদারনাথ তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। নিজের মোক্ষের জন্য জগতের উদ্ধার মন্ত্রটি কল্যাণের কাছে অহর্নিশ শুনে সংসার ত্যাগের জন্য কেদারনাথও অস্থির হয়ে উঠলেন। যামিনী মজুমদারের সঙ্গে মিলে আর্তের সেবায় এঁরা সবাই মেতে উঠলেন।

কাশী থেকে এলাহাবাদ। সেখানেও কল্যাণানন্দের সেবাকার্য। তারপর জয়পুর। রেল স্টেশনে স্বামীজির অপর এক প্রিয় শিষ্য স্বরূপানন্দের সঙ্গে দেখা হলো।

পূর্বাশ্রমে অজয়হরি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বহুশাস্ত্রবিদ, স্বামীজির নির্দেশে কিছুদিন সিস্টার নিবেদিতাকে বাংলা শেখান এবং পরবর্তীকালে স্বামীজির রচনাবলী প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা। স্বরূপানন্দও তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন, কিন্তু খবর এল রাজপুতানার কিষেণগড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। সেখানেই ছুটলেন দু'জনে, সেবাকার্যের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হলো কিষেণগড়ে।

ভিক্ষে করে এঁরা দু'জন প্রতিদিন তিনশ ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন জোগাতেন। যেসব শিশুর বাবা মা দুর্ভিক্ষে দেহরক্ষা করেছেন তাদের জন্যে একটা সাময়িক অনাথ আশ্রমও তাদের ঘাড়ে চাপলো। এই কাজে পরে তাঁদের সঙ্গী হলেন স্বয়ং কেদারনাথ মৌলিক। পরবর্তী সময়ে স্বরূপানন্দ চলে গেলেন মায়াবতীতে, আরও প্রায় একবছর কল্যাণানন্দ থেকে গেলেন কিষেণগড়ে। অনাথ শিশুদের নিয়ে কল্যাণানন্দ ঘটস্থাপন করে যখন দুর্গাপূজা করেন তখন ৫০টি বালক ও ২০টি বালিকা সেখানে প্রতিপালিত হচ্ছে।

ডিসেম্বর মাসে বেলুড় থেকে চিঠি এল, স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ

থেকে ফিরেছেন, "ইচ্ছে করলে স্বামীজিকে তোমরা এখন দর্শন করতে পার।"

বেলুড়মঠে একবার পাঁচ টাকা দিয়ে বরফ আনতে বললেন স্বামীজি। কল্যাণানন্দ হাওড়া স্টেশন থেকে আধমণ বরফ মাথায় করে পায়ে হেঁটে বেলুড়ে ফিরে এলেন। দেখে তো স্বামীজির বিস্ময় কাটে না। এত বরফ তুই মাথায় করে এনেছিস! ভক্তের ভক্তি ও সহ্যশক্তি দেখে স্বামীজি আশীর্বাদ করলেন, "কল্যাণ একদিন তুই পরমহংস হবি।" স্বামীজি জানতেন কীভাবে ভক্তের মনে অনুপ্রেরণার প্রদীপশিখাটি জ্বেলে দিতে হয়।

একদিন বেলুড় মঠে কল্যাণকে ডেকে স্বামীজি তাঁর বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। "দেখ কল্যাণ, হৃষীকেশ-হরিদ্বার অঞ্চলের অসুস্থ রুগ্ন সাধুদের জন্যে কিছু করতে পারিস? ওদেব দেখবার কেউ নেই। তুই গিয়ে ওদের সেবায় লেগে যা।"

গুরুনির্দেশ শিরোধার্য করে নিলেন কল্যাণানন্দ। স্বামী সর্বগতানন্দের ভাষায়, স্বামীজি নির্দেশ দিলেন, "কিছু পয়সা জোগাড় করে হরিদ্বারে যাও। কিছু জমি কিনে জঙ্গল পরিষ্কার করে নাও। হরিদ্বারে তীর্থযাত্রীরাও বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আমি যখন ওখানে ছিলাম তখন চিকিৎসার জন্য একশ মাইল দূরে মীরাটে গিয়ে ডাক্তারের সন্ধান পেয়েছিলাম। ওখানে একটা হাসপাতাল আছে, কিন্তু ক'জন আর সেখানে যেতে পারছে? হরিদ্বারেই কিছু একটা খাড়া করো। যদি দেখো কোনো রোগী পথের ধারে পড়ে আছে তাহলে তাকে নিজের কুঠিতে তুলে নিয়ে এস চিকিৎসা করো।"

সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় গুরুনির্দেশ কিভাবে পালন করা যায় তা স্থির করবার জন্যে বন্ধু স্বামী স্বরূপানন্দের সন্ধানে মায়াবতীতে হাজির হলেন কল্যাণানন্দ। স্বামীজির ইচ্ছা শুনে তা বাস্তবায়িত করার জন্যে তিনি তো এক পা বাড়িয়ে আছেন। প্রথম পদক্ষেপ অনতিদূরে নৈনিতালে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা। প্রায় দেড়মাস এইভাবে ভিক্ষা করে সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কল্যাণের হাতে তুলে দিলেন স্বরূপানন্দ।

১৯০১ সালে জুন মাসে হরিদ্বারের কাছে কনখলে স্বামীজির ইচ্ছাপূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো সেবাশ্রম। এর পরে স্বামী স্বরূপানন্দ মাত্র পাঁচবছর বেঁচেছিলেন। ১৯০৬ সালের ২৭ জুন নৈনিতালে ভক্ত অমরশাহের বাড়িতে স্বরূপানন্দ নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এক শোকলিপিতে সিস্টার নিবেদিতা লেখেন, "পরমাত্মার মিলন-আকাঙক্ষী বরেণ্য সেই আত্মা, আজ তাঁহার চিরঈপ্সিত ধামে উপনীত। চরম আত্মত্যাগে অর্জিত সেই মৃত্যুর সহসন্ন্যাস নিশ্চয়ই আবার নবজন্মে অভ্যুদয় লাভ করবে--পরিপূর্ণ তেজে, নবীন প্রাণে ও দানে, প্রেমে ও জ্ঞানে—যখনই মর্তের মানুষের জন্য তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন দেখা দেবে।"

সেবাধর্মের জন্য হরিদ্বারের কাছে কন্‌খলকেই নির্বাচন করেছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দ। হিমালয় প্রবেশের প্রথম ধাপ এই হরিদ্বার। মাত্র ১৫ মাইল দূরে পুণ্যতীর্থ হৃষীকেশ। তিন মাইল উত্তরে লছমনঝোলা—অসংখ্য তীর্থযাত্রী ও সাধু এইখানে সারাবছর সমবেত হন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমগুলিব একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হবার সময়সরণী এইরকম : বারাণসী রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রম ১৯০০। কনখল ১৯০১। বৃন্দাবন ১৯০৭। এলাহাবাদ ১৯১০। সুজাগঞ্জ, মেদিনীপুর ও নারায়ণগঞ্জ ১৯১৫।

১৯০১ সালে জুন মাসে হরিদ্বারে নির্বাণী আখড়ার বারকুঠারি নামক বাড়ির দোতলায় মাসিক তিনটাকা ভাড়ায় দু'খানা ঘর জোগাড় করলেন কল্যাণানন্দ। এই দুইটি ঘরের মধ্যেই অসুস্থ সাধুদের জন্য শয্যা, চিকিৎসালয়, তাঁর নিজের বাসস্থান ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। হোমিওপ্যাথি ঔষধের একটি ছোট বাক্স, চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতিও ইতিমধ্যে সংগ্রহ হয়েছিল। প্রত্যহ সাধুদের কুঠিয়াতে কুঠিয়াতে ঘুরে তিনি পীড়িত বা বৃদ্ধসাধুদের খোঁজ নিতেন এবং ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করে আসতেন। আবার আবশ্যক হলে রুগ্ন সাধুদের নিজের আস্তানায় নিয়ে এসে স্বয়ং সেবা-শুশ্রূষা করতেন, অথচ নিজে সম্পূর্ণ মাধুকরীর ওপর নির্ভর করে শরীরযাত্রা নির্ভর করতেন।

আদিপর্বে কনখলের কাজকর্মের একটি চমৎকার ছবি পাওয়া যাচ্ছে সেবাশ্রমের প্রথম প্রতিবেদন থেকে। সেপ্টেম্বরে অন্তর্বিভাগের ছ'জন রুগীই সাধু, একজনের চিকিৎসা তখনও চলেছে, অন্যেরা বিপদ কাটিয়ে ক্রমশ সুস্থ হচ্ছেন। বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৪৮, এর মধ্যে ৩৬ জন রোগমুক্ত, দশ জনের চিকিৎসা চলেছে আর দু'জন রোগনিরাময়ের আগেই বহির্বিভাগে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। মোট মাসিক খরচা ২৭ টাকা ১৩ আনা ১½ পাই। অর্থাৎ পাই পয়সার হিসাবও সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। টাকা পয়সা ছাড়াও ভিক্ষা করে দান পাওয়া গিয়েছে আড়াই মণ গম, আধমণ ডাল এবং তিন সের লবণ। খরচটাও জেনে রাখা ভাল :

	টাকা	আনা	পাই
পথ্য	১২	১৫	১½
ওষুধ	৮	১৪	৪½
ঘরভাড়া	৩	০	৪
আশ্রম-ব্যয়	১	১	০
আলো	৩	৬	৬
বেতন মজুরী	১	০	৬
ডাকখরচ	০	৬	০
বিবিধ	১	১	৭½

বলা বাহুল্য এর মধ্যে কল্যাণানন্দের এক আধলা ব্যক্তিগত খরচ নেই, কারণ তিনি মাধুকরী অথবা কোনো ছত্রে গিয়ে খেয়ে আসতেন। ছত্রে গিয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি সে যুগেও যে খুব সুখের ছিল না তা আমরা স্বামীজির শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য কেদারনাথের (পরে স্বামী অচলানন্দের) অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। কনখলে মহানন্দ মিশনের সামনে একসময় কেদারনাথ থাকতেন, তাঁরও ভিক্ষান্নে ক্ষুধানিবৃত্তি। একদিন তিনি দুপুরে ছত্রে ভিক্ষা করতে গিয়েছেন। ছত্রের কুঠারী বললেন, 'বসে থাকো এখন। সাধুদের ভিক্ষা দিয়ে যদি কিছু বাঁচে তো, কাঙালিদের দেবার সময় পাবে।' "অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিয়াছিল,...সেদিন ছত্র হইতে ভিক্ষা না

লইয়াই তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—প্রায় পাঁচ ছয়দিন আর ছত্রে যান নাই।”

বিবেকানন্দশিষ্য কল্যাণানন্দ কিন্তু কিছুতেই হাসপাতালের খরচে খাবেন না, বহুদিন তিনি এই ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে গিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর দুই সহকারী স্বামী জপানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুরেনকেও এইভাবে জীবন চালাতে হতো। হাসপাতালের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ভিক্ষায় বেরুতে বেশ অসুবিধা হয় এই রিপোর্ট বহুবছর পরে স্বামী জপানন্দ বেলুড়ের হেড অফিসে পাঠিয়েছিলেন! স্বামী সারদানন্দ তখন জেনারেল সেক্রেটারি, তিনি একই সঙ্গে সেবা ও মাধুকরীর প্রয়োজন নেই এই নির্দেশ পাঠালেন কনখলে—এতে কল্যাণানন্দ এবং তাঁর সহযোগী স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না! তাঁরা মনে করলেন, ভিক্ষে করার চমৎকার সুযোগ থেকে সাধুরা কেন অকারণে বঞ্চিত হবেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, জীবনের শেষপ্রান্তে স্বামীজি সন্ন্যাসীর প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষাচর্যা সম্পর্কে মতের সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। একজন সাধুর পক্ষে এদুটি খুবই হিতকর, কিন্তু মাধুকরী বৃত্তি ইত্যাদি তখনই সহজবোধ্য ছিল যখন গৃহস্থগণ... ধর্মশাস্ত্রগণের নির্দেশ সুচারুরূপে অনুশীলন করে প্রতিদিন নিজ নিজ অন্নের একাংশ সাধু-অতিথিদের জন্য ভিন্ন করে রাখত। এখন সমাজে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে বঙ্গদেশে মাধুকরী প্রায় অপ্রচলিত।...অরূপ পরিস্থিতিতে ভিক্ষাবৃত্তি ও মুদ্রাস্পর্শত্যাগের ব্রত অবলম্বন করে তোমরা কোন সুফল পাবে না।

এদিকে হৃষীকেশের সাধুদের জন্যেও একটা শাখা সেবাশ্রম খুলে ফেলা হলো। ১৯০২ সালের মার্চ মাসের কিছু খবরাখবর পুরনো রেকর্ডে পাওয়া যাচ্ছে। ওই মাসে বহির্বিভাগে ৭০ জন সাধু এবং অন্তর্বিভাগে ৭ জনের চিকিৎসা হয়। একমাসে ৫ টাকা ১ আনা ৯ পাই খরচ হয় তার মধ্যে পথ্যের খরচ ২ টাকা ১৫ আনা। ভিক্ষা করে দান পাওয়া গিয়েছিল ৫ সের ২ ছটাক চাল, ৯ সের ২ ছটাক ডাল, ১৮ সের ১২ ছটাক গম, ১ সের ৮ ছটাক লবণ। ২ টাকা ৯ আনার দুধও পাওয়া গিয়েছিল। দুটি সেবাশ্রমের মধ্যে দূরত্ব বেশ ক'মাইল, কিন্তু গাড়ি ভাড়া করে সেবাশ্রমের অর্থব্যয় স্বপ্নেরও অতীত, তাই

নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসীরা সূর্য ওঠার আগেই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়তেন। ফিরতেনও পায়ে হেঁটে, তারপর বেরুতে হতো মাধুকরীতে।

প্রিয় শিষ্য কল্যাণানন্দের অবিশ্বাস্য কাজকর্মের খবর বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দর কাছে পৌঁছত। গুরুদর্শনের জন্যে কল্যাণানন্দ নিজেও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। প্রিয় শিষ্যকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করার পরে স্বামীজি বেলুড় থেকে বিদেশে যাবার আগে একবার সমবেত ব্রহ্মচারীদের কাছে বক্তৃতা করেছিলেন। সেই বক্তব্য আজও হৃদয় কাঁপায়। "বহু জনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগ-বিধুরার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পরমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

শেষ যেবার বেলুড়ে স্বামীজির সঙ্গে কল্যাণানন্দের দেখা হলো তখন তাঁর কয়েকটি কথা ভক্তমহলে মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। স্বামী অচলানন্দ একদিন দাঁড়িয়ে আছেন তখন তাঁর সামনেই প্রিয় শিষ্যকে স্বামীজি বললেন, "দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জান? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে, সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যান-ধারণা করবে, তারপর যা ধ্যান-ধারণা করলে তা ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগাবে।" স্বামী অচলানন্দ পরে বলতেন, "স্বামীজির আসল ভাব ছিল প্র্যাকটিকাল বেদান্ত। শুধু থিওরি নয়, বেদান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে। শুধু কথায় বা বিচারে চলবে না।"

স্বামীজি যে কল্যাণানন্দকে আরও কিছু পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তা শিষ্যের পরবর্তী জীবনযাত্রা এবং সর্বগতানন্দের স্মৃতি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে। মারাত্মক নির্দেশ: "বাংলাকে ভুলে যা। আর ফিরিস না। এখান থেকে চলে যা।" এই নির্দেশের হেরফের হয়নি, স্বামীজিকে শেষ দেখে শিষ্য সেই যে কনখলের কর্ম ও সাধনাক্ষেত্রে ফিরে গেলেন তারপর পুরো পঁয়ত্রিশ বছর তিনি একবারও বাংলায় ফেরেননি। বেলুড় থেকে বহুবার

আমন্ত্রণ এসেছে, কিন্তু তাঁর অনিচ্ছা থেকে যা স্পষ্ট—গুরুর নির্দেশ তিনি মাথা পেতে নিয়ে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাবেন না। বাংলায় না ফেরার এই প্রতিজ্ঞা তিনি মেনে চলেছেন ২০ অক্টোবর ১৯৩৭ ডেরাডুনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

কনখলে কল্যাণানন্দ কী করেছেন তার মনোগ্রাহী ছবি এঁকেছেন স্বামী সর্বগতানন্দ। হিসেবের খাতা ও রোগীর পরিসংখ্যান থেকে কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। আমরা অবশ্যই বিভিন্ন বর্ণনার সুযোগ নেব, কিন্তু তার আগে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সাধনা ও কর্মের সাথী স্বামী নিশ্চয়ানন্দের কথা একটু বলে নেওয়া যেতে পারে।

শিষ্য সুরজ রাওয়ের (১৮৬৫-১৯৩৪) সঙ্গে স্বামীজির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯০১ সালে বেলুড়ে। সেদিন মধ্যাহ্ন আহারের পর স্বামীজি বিশ্রাম করছেন এমন সময় খবর গেল একজন মারাঠি যুবক দেখা করতে চান। স্বামীজি বললেন, "এখন তাকে স্নানাহার সেরে নিতে বলো, আমি পরে দেখা করব।" যুবকটি বিনীতভাবে জানালেন, "আমি স্নানাহারের প্রত্যাশী নই। আমি বহুদূর থেকে স্বামীজিকে দর্শন করতে এসেছি। তাঁকে প্রণাম না করে আমি স্নানাহাব করব না।" অগত্যা স্বামীজি নেমে এলেন এবং যুবকটি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। "তুমি কী চাও?" স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন। "কিছুই চাই না : শুধু আপনার দাস হতে চাই।" দূরদর্শী স্বামীজি তখনই যুবকটিকে মঠে থাকার অনুমতি দিলেন।

বিবেকানন্দপ্রাণ নিশ্চয়ানন্দ সম্পর্কে কত মজার গল্প যে ছড়িয়ে আছে! গুরুর নির্দেশ মানবার জন্যে যদি প্রাণসংশয় হয় তো হোক।

নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন নদীর ওপারে বরাহনগরের একটা টিউবওয়েল থেকে স্বামীজির জন্যে বেলুড়ে জল আনতেন। একদিন জলভরা কলসি নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে মঠে প্রবেশ করতে দেখে এক বিদেশিনী ভক্তিমতী বলে উঠলেন, "সোয়ামী আপনি এই জল আনার দায়িত্বটা কোনো কাজের লোককে দিচ্ছেন না কেন?" ভক্ত নিশ্চয়ানন্দ চটে গিয়ে ইংরিজিতে বললেন, 'ইউ আর এ ফুলিশ লেডি!" নির্বোধ মহিলা বলায় বিদেশিনী

মহিলা অভিমানভরে স্বামীজির কাছে অভিযোগ জানালেন। আমি কি এমন অন্যায় করেছি যে আপনার শিষ্যটি আমাকে এইভাবে ভর্ৎসনা করল? স্বামীজি তাকে বোঝালেন, "এটা ভারতবর্ষ। গুরু সেবাকে এখানে প্রধান ধর্মসাধনা মনে করা হয়।" ভুল বুঝতে পেরে বিদেশিনী স্বামীজির পরামর্শে নিশ্চয়ানন্দের কাছে অনুতাপ প্রকাশ করতে যান। নিশ্চয়ানন্দ তখন স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে বেলুড়ের সব্জীবাগানে মাটি কোপাতে ব্যস্ত—তাঁর পরনে কৌপীন ছাড়া কিছু নেই। সরল সাধু পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে ক্ষমা করেছি। এখন দয়া করে এখান থেকে যাও।"

স্বামীজির অফুরন্ত ভালোবাসা পেয়েছিলেন এই শিষ্য। তিনি একদিন নিশ্চয়ানন্দকে ডেকে বলেছিলেন, "দেখ নিশ্চয়, সাধু হয়ে অপরের গলগ্রহ হওয়া উচিত নয়। কারুর কাছ থেকে অন্ন গ্রহণ করলেই প্রতিদান দিতে হয়। সাধুসমাজ অন্যের অন্ন খেয়ে খেয়ে জড় হয়ে গেছে। সমস্ত দেশটা অপরের উপর নির্ভর করে জড়বৎ হয়ে গিয়েছে। এতে দেশের উন্নতি না হয়ে, অবনতি হয়েছে। তুমি কখনও এমন কাজ করবে না। যদি বড় কিছু কাজ করতে নাও পার—অন্তত এক পয়সায় একটা মাটির কলসি কিনে রাস্তার ধারে বসে তৃষ্ণাতুর পথিকদের জলপান করাবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে অপরের অন্ন ধ্বংস করা দূষণীয়।"

গুরুর প্রতি স্বামী নিশ্চয়ানন্দের আনুগত্যের আরও কয়েকটি গল্প আজও লোকমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে বেলুড়ে গোরু নিয়ে আসার গল্প। এই গোরুটি আড়িয়াদহের এক গোয়ালার কাছ থেকে স্বামীজির জন্যে কেনা হয়। এবার শুনুন মহেন্দ্রনাথ দত্তের অনুধ্যান।

"রাওজীর গুরুভক্তি ও কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে একটি ঘটনা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহার উল্লেখ করিতেছি। একবার কলিকাতার নিকট 'আড়িয়াদহ' নিবাসী জনৈক গোয়ালার নিকট স্বামীজির জন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা হয়। পূজ্যপাদ স্বামাজি—স্বামী নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী নির্ভয়ানন্দ (কানাই মহারাজ) ও মঠের অপর জনৈক সাধুকে সেই গরুটি আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। গরুটি ক্রয় করিয়া আনিবার কালে তথা হইতে মঠে

আসিবার রাস্তায় গঙ্গা অতিক্রম করিতে হয়। তাঁহারা সকলে গরু ও বাছুরের সহিত নৌকায় উঠিলেন। তখন বর্ষাকাল, মা গঙ্গা ভীষণ বেগবতী। গঙ্গার ধারা একটানায় প্রবলবেগে বহিতেছে। নৌকাটি মাঝ-গঙ্গায় আসিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ উহা ভীষণভাবে দুলিতে আরম্ভ করিল। তখন সেই গরুটি ভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গঙ্গায ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইহাতে সকলে আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

"স্বামী নিশ্চয়ানন্দ জল ছিটাইয়া গরুর মুখটি কিনারার দিকে করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি গরুটির সহিত স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। অতঃপর গরুটি লইয়া বহু কষ্টে পূর্বকূল হইতে পশ্চিমকূলে আসিলেন; কিন্তু কিনারায় এত কাদা যে সেখানে গরুটি তোলা বড়ই দুঃসাধ্য। তিনি নিজে অতি কষ্টে উঠিলেন, কিন্তু গরু আর উঠে না। ইহাতে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে স্থানে কয়েকটি ভাঙা নৌকার কাঠ পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া গরুটির পায়ের নীচে দিয়া অতি কষ্টে উহাকে ডাঙায় উঠাইয়া মঠে লইয়া যাইলেন। মঠে পৌঁছাইতে সকলে তাঁহাকে নানারূপ তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

"স্বামী নিশ্চয়ানন্দ গরু লইয়া আসিয়াছেন ক্রমে এই কথা স্বামীজির কাছে পৌঁছাইল। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ তথায় উপস্থিত হইলে গরুটির জন্য তিনি মূর্খের মতো নিজের জীবনটা কেন দিতে গিয়াছিলেন, স্বামীজি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ বলিলেন, 'মহারাজ, আপনি আমাকে গরু আনতে পাঠিয়েছিলেন, গরুটি ছেড়ে কেমন করে আসি?' এ কথায় স্বামীজি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, ঠিক্ ঠিক! আমি গরু আনতে বলেছি, তুমি কেন তাকে ফেলে আসবে!"

স্বামীজির আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত দেহত্যাগে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ এমন শোকার্ত হলেন যে ৪ঠা জুলাই-এর কয়েকদিনের মধ্যে তিনি মঠ

ছেড়ে চলে যাবেন। একদিন বিকেলে স্বামী সারদানন্দ, মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামীজির ভাই) ও আরও কয়েকজন মাঠের দিকের রকটিতে বসে আছেন। সবাই শোকার্ত। "স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সেখানে আসিয়া বলিলেন, 'আমি যাঁর সম্পর্কে এখানে এসেছিলুম, তিনি যখন চলে গেছেন—তখন আমি আর এখানে থাকব না। আমি নিশ্চয় চলে যাব। যেখানে মন যায় সেখানে গিয়ে থাকব।' স্বামী সারদানন্দ অনেক অনুরোধ করিয়া বুঝাইলেন যে, তিনি সহসা চলিয়া যাইলে লোকে অন্যরকম ভাবিবে। তিনি অনুরোধ করিলেন যেন স্বামী নিশ্চয়ানন্দ অন্তত একমাসকাল মঠে থাকিয়া পরে অন্যত্র গমন করেন।"

আরও এক বিবরণ অনুযায়ী, শোকসন্তপ্ত নিশ্চয়ানন্দকে সারদানন্দ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোনদিকে যেতে ইচ্ছে কর?" নিশ্চয়ানন্দের উত্তর: "যেদিকে দুচোখ যায়।"

একমাস যেদিন পূর্ণ হলো নিশ্চয়ানন্দ ঠিক সেদিনই বেলুড় থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন, স্বামী কল্যাণানন্দের মতন তিনিও আর কখনও সেখানে ফিরে আসেননি, অথচ স্বামীজির নির্দেশিত কাজে জীবনের বাকি বছরগুলো নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ানন্দ নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তারপর ১৯০৩-এ কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বারে হাজির হলেন। 'রমতা' সাধুর মতন ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক যুবক সাধুর সঙ্গে পরিচয় হলো। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কথাবার্তায় বুঝিতে পারিলেন যে, তিনিও স্বামী বিবেকানন্দর শিষ্য—বৎসরাধিক পূর্বে বেলুড় মঠ হইতে আসিয়াছেন এবং কন্‌খলের বাজারের নিকট একটি ভাড়াটিয়া ঘরে ঔষধপথ্যাদি দ্বারা নিরাশ্রয় সাধুগণের সেবায় নিযুক্ত আছেন। উভয়ের উদ্দেশ্য এক হওয়ায় এখন হইতে তাঁহারা একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। যুবকটির নাম কল্যাণানন্দ।"

একজন সুযোগ্য গুরুভাইকে খুঁজে পেয়ে কল্যাণানন্দের মনোবল ও উৎসাহ খুব বেড়ে গেল। এই সময়কার কিছু ইতিহাস কনখল সেবাশ্রমের তখনকার বার্ষিক বিবরণী ও অ্যাকাউন্টসে থেকে গিয়েছে। কনখলের প্রথম

রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯০৪ সালে, এতে সই করেছেন মঠ মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অ্যাকাউন্টসে সই করেছেন মঠমিশনের জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী সারদানন্দ এবং অডিটর শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। এই বৈকুণ্ঠনাথ ১৮৯০ সালে তপস্যা করার জন্য স্বামীজির সঙ্গে হৃষীকেশে আসেন। সঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ। চণ্ডেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের কাছে এক কুঁড়েঘরে সাধনায় মগ্ন থাকতে থাকতে স্বামীজি স্বয়ং জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকের অভাব, স্বামীজি সংজ্ঞাহীন হলে সঙ্গীরা হায় হায় করতে লাগলেন, সেই সময় এক সাধু এসে মধুসহ পিপুল-চূর্ণ রোগীর জিভে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন। এরপর তাঁরা স্বামীজিকে নিয়ে হরিদ্বারে হাজির হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন কনখলে তপস্যা করছিলেন, খবর পেয়ে তিনি হরিদ্বারে হাজির হলেন। স্বামীজি যখন প্রিয় শিষ্য কল্যাণানন্দকে হরিদ্বারে সেবাশ্রম খুলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন চণ্ডেশ্বরের স্মৃতি অবশ্যই তাঁর মনে স্পষ্ট ছিল।

কনখলের প্রাচীন নাম মায়াপুর। মহাভারতে এই অঞ্চলের নাম 'কুরুজাঙ্গল'। হরিদ্বারের নাম ছিল গঙ্গাদ্বার।

সেবাশ্রমের প্রথম ছাপানো রিপোর্টের নিবেদন, ডিসেম্বর ১৯০২ পর্যন্ত ১৮ মাসে ১০৫৪ রোগী সেবা পেয়েছে। কনখলে ইনডোর রোগী ১২৮, আউটডোর ৫৩৬, হৃষীকেশে ইনডোর ৩৬ এবং আউটডোর ৩৫৪। হৃষীকেশ শাখা খোলা হয় ১৯০২-এর গোড়ার দিকে। ১৯০৩ সালে মোট রোগীর সংখ্যা ২৭০২। তার পরের বছর রোগীর সংখ্যা ২৫০০, এর মধ্যে প্লেগের রোগী ২২ জন। রিপোর্টে জানানো হচ্ছে, হাসপাতালের যাবতীয় দায়িত্ব পালনে রয়েছেন মাত্র দু'জন সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারী। আর আছে একজন পাচক, একজন সাফাইকর্মী ও একজন ভৃত্য।

এপ্রিল ১৯০৩ সালে সেবাশ্রমের জন্য যে জমি কেনা হলো তার পরিমাণ ১৫ বিঘা—মূল হরিদ্বারে জমির দাম অনেক, সুতরাং কনখলই ভরসা। এই জমি কেনার দাম দিয়েছিলেন কলকাতার এক ভদ্রলোক, কিন্তু সেই সময় তিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

তিন টাকা ভাড়ার তিনখানি ঘর ছেড়ে সেবাশ্রম উঠে এলো শেখপুরার

নিজের জমিতে, রোগীর সেবার জন্য তিনখানা চালাঘর তৈরি হয়েছে। সেবাশ্রমের প্রথম নকশা তৈরি করেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (পরে মঠ মিশনের সভাপতি), তৈরির খরচ ৬০১৭ টাকা দেন বাবু ভজনলাল লোহিয়া।

কনখল ও হৃষীকেশ সেবাশ্রমের মধ্যে দূরত্ব ১৫ মাইল। দুটি সেবাকেন্দ্র চালানো একা কল্যাণানন্দের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল, তাই হৃষীকেশ সেবাশ্রম কিছুদিন বন্ধ ছিল। নিশ্চয়ানন্দ আসায় বন্ধ-হওয়া কেন্দ্রটি আবার প্রাণবন্ত হলো। খুব ভোরবেলায় ১৫ মাইল পাহাড়ি পথ হেঁটে নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন হৃষীকেশে যেতেন, তাঁর সাথী অবশ্যই কল্যাণানন্দ। সঙ্গে থাকত ওষুধের বাক্স এবং রোগীদের খাবার। দুপুরবেলায় এঁরা দু'জনে বেরোতেন মাধুকরীতে, কারণ রোগীর বরাদ্দ খাবারে তাঁদের কোনো অধিকার নেই। প্রয়োজনে কোনো ছত্রে গিয়ে নিজেদের ক্ষুধানিবৃত্তি করে দুই সন্ন্যাসী আবার ফিরে আসতেন রোগীদের খবরাখবর নিতে এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীরে নিজেদের ডেরায় ফিরতেন। এই ব্যবস্থা চলত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, গ্রীষ্ম শীত বর্ষায় কোনো পরিবর্তন নেই। এছাড়াও বড় কাজ ছিল সেবাশ্রম চালানোর জন্য সকলের কাছ থেকে দান ও ভিক্ষা সংগ্রহ করা।

মর্তলোকের এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "উভয়ে রোগীদের মলমূত্র পরিষ্কার ও নানাপ্রকার সেবা করিতেন। রোগী গতায়ু হইলে একটি মাচার উপর স্থাপন করিয়া নগ্নপদে, প্রচণ্ড রৌদ্রে, উত্তপ্ত পাথরের উপর হোঁচট খাইতে-খাইতে নীলধারায় বা গঙ্গায় যেখানে স্রোত থাকিত সেইখানে শবটিকে ভাসাইয়া দিয়া আসিতেন। তাঁহারা কখনও নিজেদের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। অতি কঠোর সেবার ভার তাঁহাদের মনে প্রদীপ্ত হইয়াছিল এবং তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া অতিমানুষিক কঠোর তপস্যা তাঁহারা করিতে লাগিলেন। কনখলে অবস্থানকালে পরবর্তী সময়েও দেখিয়াছি—অভিমানশূন্য, প্রাধান্যস্পৃহাশূন্য, বিলাসিতার রেখামাত্র বর্জিত, জীর্ণ পরিধান ও ছিন্ন পাদুকাতেই তৃপ্ত হইয়া ইঁহারা দিনযাপন করিতেছেন। প্রথম অবস্থায় যেমন সর্বস্বত্যাগী, সেবাপরায়ণ সাধুভাব—শেষ অবস্থাতেও সেইরূপ। এই

সেবারূপ তপস্যায় তাঁহারা সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।"

পুরাতনপন্থী সাধুমহলে মিশনের নবীন কর্মধারা যে সবসময় মনঃপুত হয়নি তারও ইঙ্গিত রয়েছে মহেন্দ্রনাথের অনুধ্যানে। "আজও অনেক সাধু রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের 'মশিন সাধু' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন—অর্থাৎ 'মশিন সাধুরা' জাতবিচার না করিয়া সাধারণের সেবা করেন।"

শুধু বাইরের সাধু নন, ভিতরের অনেকেরও মনেও যে এই সেবাকাজ সম্পর্কে সন্দেহ ছিল তা স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কনখলে থাকার সময়ে বুঝেছিলেন। মহেন্দ্রনাথ এই ঘটনা লিখতে দ্বিধা করেননি বলে আমরা জানতে পারি, এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সেইসময় কনখল সেবাশ্রমে গিয়ে বাস করেন। "একদিন এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে ডিস্পেনসারি ঘরের দিকে লইয়া যাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'এইসব ডাক্তারখানা, হাসপাতাল করে কি ফল আছে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভগবানলাভ হলে তুমি কি বলবে যে এত ডাক্তারখানা করেছি—হাসপাতাল করেছি? সাধনভজন করে ভগবানলাভ করাই হলো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।' এইরূপ নানা কথায় তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন। স্বামী নিশ্চয়ানন্দ কর্মী; সারা জীবনপাত করিয়া অসুস্থদিগের সেবার জন্য কনখলের জঙ্গলের ভিতরে সেবাশ্রম স্থাপিত হয়েছে। এই সকল কথায় তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল।"

মহেন্দ্রনাথ নীরব থাকলেও অন্য সূত্র থেকে জানা যায় এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের স্রষ্টা শ্রীম। তাঁব কথায় নিশ্চয়ানন্দ আর অশ্রু-সংবরণ কবতে পারেননি, করজোড়ে মাস্টারমশায়কে বলেছিলেন, "দেখুন আমি স্বামীজির গোলাম। সাধন-ভজন কিছুই জানি না। তাঁর কাজ করাই আমার জীবনব্রত।"

নিস্ক্রিয় ত্যাগ ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ-বিশারদরা গত একশতকে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে অবশ্যই ভগবান বুদ্ধের সক্রিয় ত্যাগ ও বৈরাগ্যও উল্লেখ হয়, বিশেষ করে তাঁর বাণী—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়। মহেন্দ্রনাথের মতে, ভগবান বুদ্ধের পরে স্বামী বিবেকানন্দই

দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই উদারভাব প্রসারণ করেছেন। বুদ্ধ কমুণ্ডলু হস্তে মুণ্ডিত মস্তকে স্থির নেত্রে বলছেন, 'জাতির পুরাতনভাব আমি সম্মান করিব, নিস্তেজভাব, সঙ্কীর্ণভাব, রোরুদ্যমানভাব আমি সমূলে উৎখাত করিব...আজ হইতে আমি জগতের সমস্তভার গ্রহণ করিলাম।' মুণ্ডিত মস্তকে, দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে গৈরিকবসনধারী বিবেকানন্দও বলেছেন, "আমি প্রাচীন ভাবকে সম্মান করিব, কিন্তু মুমূর্ষু রোরুদ্যমানভাব, সঙ্কীর্ণভাব, হীনভাব সমূলে উৎখাত করিব—আমি ডালপালা শিকড় পর্যন্ত উপড়াইয়া ফেলিব— নূতন ভারত—নূতন জগৎ সৃষ্টি করিব—আজ হইতে আমি সমস্ত জগতের ভার গ্রহণ করিলাম।"

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের জীবনীকার হিসেব করে দেখিয়েছেন, একপর্যায়ে তাঁকে প্রতিদিন ছত্রিশ মাইল হাঁটতে হতো। আরও একটা ব্যাপার, নিশ্চয়ানন্দ কনখলেও মশারি ব্যবহার করতেন না। বেলুড় মঠে থাকার সময় থাকতেই এই সন্ন্যাসী মশারিবিহীন। বড় বড় মশার কামড়ে শরীর ক্ষতবিক্ষত। বিছানায় রক্তের চিহ্ন দেখে স্বামীজি একদিন বেলুড়ে বকাবকি করেছিলেন। নিশ্চয়ানন্দ বলেছিলেন, "স্বামীজি আমি তো ভোগ করতে আসিনি।" স্বামীজি তাঁর শিষ্যকে বুঝেছিলেন এবং বলেছিলেন, "বেশ এখন তবে এমনই চলুক, তবে যখন প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু মশারি ব্যবহার করবে।" কনখলেও একই অবস্থা, মশারি নেই। মহাপ্রয়াণের (১৯৩৪, ২২ অক্টোবর) মাত্র কয়েকদিন আগে কল্যাণানন্দ তাঁকে স্বামীজির নির্দেশ মনে করিয়ে দিয়ে মশারি ব্যবহারে রাজী করিয়েছিলেন।

স্বামী নিশ্চয়ানন্দের গুরুভক্তির যত গল্প ছড়িয়ে আছে তা ঠিকমতন সংগ্রহ করলে পুরো একটা বই হয়ে যায়। কনখলে সকালে শয্যাত্যাগ করে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ যখন বেরিয়ে আসতেন তখন তাঁর মুখটা গামছায় ঢাকা থাকত। ওই অবস্থায় চলে যেতেন গুরুজির ছবির কাছে, স্বামীজিকে প্রণাম করে তবে অবগুণ্ঠনমুক্ত হতেন এই ভক্ত।

আরও একটা মজার ব্যাপার। বয়সে নিশ্চয়ানন্দ তাঁর গুরুভাই কল্যাণানন্দের থেকে প্রায় ন'বছর বড় ছিলেন, কিন্তু ছোটকেই দাদার মতন সম্মান করতেন। হরিদ্বার কনখলের লোকদের কাছেও তিনি ছিলেন 'ছোট

স্বামী'। 'বড় স্বামীটি' অবশ্যই তাঁর কনিষ্ঠ গুরুভাই কল্যাণানন্দ।

নিশ্চয়ানন্দের কাজ ছিল খুব গুছনো। গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দ যে হিসেবের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিলেন তা তাঁর কোনো শিষ্যের অজানা ছিল না। কাশীর সেবাশ্রম প্রসঙ্গে স্বামীজি শুধু সেবাযত্নের খোঁজখবর নিতেন না, সবাইকে সেবাশ্রমের সঠিক হিসাবপত্তর রাখতে বলেছিলেন। তাঁর কঠোর নির্দেশ : "যিনি যে উদ্দেশ্যে অর্থ দেন, তাঁর সেই অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত।"

নিরন্তর পরিশ্রম এবং অত্যধিক কঠিন জীবনযাত্রা শেষপর্যন্ত নিশ্চয়ানন্দের শরীরের ওপরেও ছায়া ফেলেছিল। শুতেন একটা খাটিয়ায়, তার ওপরে একটি চাদর, খাওয়া দাওয়াও যৎসামান্য। একদিনও কাজ থেকে ছুটি নয়, সেই যেদিন সেবাশ্রমে উপস্থিত হয়েছেন সেদিন থেকে একদিনও ছুটি নেবার কথা ভাবেননি নিশ্চয়ানন্দ। ১৯৩২ সালের বর্ষাকালে গ্যাসট্রিক আলসারে তিনি মরণাপন্ন। সেই সময় কল্যাণানন্দর শরীরও ভালো নয়, স্বাস্থ্যসন্ধানে তাঁকে জোর করে পাঠানো হয়েছে মায়াবতী আশ্রমে। ফলে সেবাশ্রমের দায়িত্ব এসে পড়েছে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ানন্দের ওপরে।

খাওয়া দাওয়া তো ভিক্ষানির্ভর। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একসময় স্থানীয় কৈলাসমঠে তিনি নিত্যভিক্ষা নিতে যেতেন। মঠের অধ্যক্ষ গিরিজী মহারাজ তাঁর অনুরাগী। তিনি উপস্থিত থাকলে কোনো অসুবিধা হত না। একবার তিনি দলবলসহ ক'দিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছেন, যাবার সময় নিশ্চয়ানন্দের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ নতুন কুঠারীর কাছে রেখে গিয়েছেন। প্রথম দিনে কুঠারী তাঁকে চিনতে পারল না। তার ওপর তিনি নগ্নপদ, দীনহীন মলিন বসন, উপরন্তু কাঁধে ওষুধের একটা ভাঙা বাক্স। কুঠারী নির্দ্বিধায় কাঙালবেশি সাধুকে জানিয়ে দিলেন, এখানে বাইরের সাধুকে ভোজন করানোর ব্যবস্থা নেই। "অভিমানশূন্য নিশ্চয়ানন্দ অম্লানবদনে ফিরে গিয়ে কালীকমলী ছত্রে ভিক্ষা গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি আর কৈলাস মঠে যান নাই।"

অধ্যক্ষ ধনরাজগিরি ফিরে এসে নিশ্চয়ানন্দকে প্রত্যহ আসতে না দেখে

খোঁজখবর করলেন এবং কুঠারীকে তিরস্কার করে তাকে পাঠালেন, যে করেই হোক তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কুঠারী এরপর নিশ্চয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পায়ে ধরে অপরাধ মার্জনা প্রার্থনা করেন। "নিশ্চয়ানন্দ তখন মহা অপ্রস্তুত হইয়া, কুঠারীর অনুরোধে পুনরায় কৈলাসমঠে গেলেন এবং সেইদিন হইতে পূর্ব্ববৎ কৈলাসেই ভিক্ষা লইতে লাগিলেন।"

দেহত্যাগের দুসপ্তাহ আগেও কাজ-পাগল নিশ্চয়ানন্দের ছোট্ট বিবরণ আমাদের কাছে আছে। মোটা কম্বলে দুটো পা ঢেকে বসে তিনি সেবাশ্রমের হিসেবপত্তর দেখছেন। কেন বিশ্রাম নিচ্ছেন না এই প্রশ্ন করায় নিশ্চয়ানন্দ বললেন, "এ তো ঠাকুরের সেবা। স্বামীজির কাজ। আমাদের এখনও তো সব কর্ম ক্ষয় হয়নি। মাটি কাদা অবস্থায় থাকলে সবটুকু ওঠে না—কিন্তু শুকিয়ে গেলে সব আপনিই খসে যাবে।"

হিসেবপত্তরের ওপর নিশ্চয়ানন্দের সারাক্ষণ নজর। "আশ্রমের তহবিলে একদিন একটা আধলা উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। তহবিলরক্ষক সাধুটিকে নিশ্চয়ানন্দ এই আধলার হিসেবটিও প্রতিমাসে নিয়মিত জিজ্ঞাসা করতেন।"

কনখলে ১৫ বিঘা জমি দেড়হাজাব টাকায় খরিদ হলেও, গোড়ায় বাড়ি তৈরির অর্থ ছিল না। তাই তিনটি কুঁড়েঘর তৈরি করে কাজ চলত। সন্ন্যাসীরা শুধু অস্পৃশ্য চামারদের বস্তিতে ঘুরে বেড়াতেন তা নয়, অসুস্থ মানুষের মলমূত্র নিজের হাতে পরিষ্কার করতে দ্বিধা করতেন না। এর ফলে যেমন প্রশংসা মিলেছে তেমন দুর্নামও রটেছে। দু'জনের নাম হয়ে যায় 'ভাঙ্গী সাধু', কারণ মলমূত্র পরিষ্কার মেথরের কাজ। এর ফলে এমন সেবা করেও দুই সন্ন্যাসী প্রায় একঘরে হয়ে গিয়েছিলেন, সাধুদের কোনো অনুষ্ঠানে এঁরা আমন্ত্রিত হতেন না।

স্বামী সর্বগতানন্দ এই অস্পৃশ্য ভাঙ্গী সাধুজীবনের একটি স্মরণীয় বর্ণনা দিয়েছেন। এই কাহিনীর মূলে আর একজন উদারহৃদয় সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরি, শঙ্করাচার্যের হৃষীকেশস্থ কৈলাস মঠের মণ্ডলেশ্বর। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশে থাকার সময় শ্রীমৎ ধনরাজ

গিরিজীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং দু'জনের মধ্যে শাস্ত্রালোচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দও তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং কিছুকাল বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। ভজনলাল লোহিয়া ও হরসহায়মল শুকদেবদাস নামক দুই ধনপতি এঁর সঙ্গে কনখলে দেখা করে একটি মঠ বা ধর্মশালা তৈরি করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রসন্নহৃদয় ধনরাজ গিরি তাঁদের পরামর্শ দিলেন বিবেকানন্দর দুই শিষ্য এখানে কী কাজ করছেন একটু খোঁজখবর করুন। দুই বন্ধু সেবাশ্রমের কাজ দেখে অবাক হয়ে সেবাশ্রমের বাড়ি তৈরির খরচ বহন করেন। এই ভবনের উদ্বোধন হয় ১৯০৫ সালের প্রথম দিকে।

ভাঙ্গী সমস্যার কথা আবার উঠল ১৯১০ সালে—সেবারে ধনরাজ গিরির আগমন উপলক্ষে তাঁর মঠে বিশেষ ভাণ্ডারার ব্যবস্থা হয়েছে। কাছাকাছি যেখানে যত সন্ন্যাসী আছেন সবাই ভাণ্ডারার মহাভোজে নিমন্ত্রিত। ধনরাজ গিরি তাঁর সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞেস করলেন, শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দর দুই শিষ্য কাছাকাছি থাকেন, তাঁদের জানো? "হ্যাঁ, এঁরা কাছাকাছি থাকেন, কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের নয়, এঁরা ভাঙ্গী সাধু, এমন সব নিচু কাজকর্ম করেন।" ধনরাজ জানতে চাইলেন, "কী করেন এঁরা?" "এঁরা মেথরের কাজও করেন।" "নিচু কাজ! অসুখ করলে তোমরা কোথায় যাও? তোমরা হাসপাতালে যাও না?" "হ্যাঁ আমরা যাই।" ধনরাজ বললেন, "তার মানে প্রয়োজনে ওঁদের সেবাশ্রমে যাও, চিকিৎসা নাও, আর তোমরাই বলো এঁরা ভাঙ্গী সাধু! যাও ওঁদের ভাণ্ডারায় নেমন্তন্ন করে এসো," এই দু'জন অতিথিকে ধরে আনবার জন্যে ধনরাজ গিরি তাঁর এক সন্ন্যাসীকে পাঠালেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ যেতে রাজি হলেন, কিন্তু নিশ্চয়ানন্দ টলবার মানুষ নন। তিনি সোজা বললেন, "আমি যাচ্ছি না।" ফলে কল্যাণানন্দও ভাণ্ডারায় যেতে পারলেন না। দূত ফিরে গিয়ে ধনরাজ গিরিকে জানালেন, দুই সন্ন্যাসী এই ভোজে আসতে রাজি নন। ধনরাজ গিরি ছাড়বার পাত্র নন। দূতকে বললেন, "আবার যাও, বলো আমি চাই ওঁরা আসুন।" এই কথা শুনে কল্যাণানন্দ তাঁর গুরুভাইকে বললেন, "ধনরাজ গিরিকে আঘাত

করা ঠিক হবে না। চলো আমরা যাই।" নিশ্চয়ানন্দের সাফসুফ উত্তর, "কেন যাব? আমরা তো ওঁদের ওপর নির্ভর করি না। কেন আমরা যাব? একদিন ভূরিভোজ, কাল থেকে আবার শুকনো রুটি।"

তরুণ সন্ন্যাসী হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ায় ধনরাজ গিরি সব খবর পেলেন। তিনি এবার তাঁর সেক্রেটারিকে যেতে নির্দেশ দিলেন। "ওঁদের যে করে হোক নিয়ে এসো। ওঁদের বলো, ওঁরা না এলে এখানে উৎসব বন্ধ।" সাধুটি এসে দুই গুরুভাইকে বললেন, "দয়া করে চলুন। আপনারা না এলে মহারাজ অনুষ্ঠান আরম্ভই করবেন না।" ইতিমধ্যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, ঘড়িতে দুটো বাজে। নিশ্চয়ানন্দ তখনও যেতে রাজি নন, কিন্তু কল্যাণানন্দ বললেন, "ধনরাজগিরি মহারাজের মুখ চেয়ে আমাদের যাওয়াটাই ভালো—একজন ভালো সন্ন্যাসী আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, তাঁর সম্মান আমাদের রাখা উচিত।" এবার ফল হলো এবং দুই ভাই ভাণ্ডারায় যোগ দেবার জন্য সেবাশ্রম থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মঠের দ্বারপ্রান্তে স্বয়ং ধনরাজ গিরি এই দুই বিবেকানন্দশিষ্যকে স্বাগত জানালেন। সবাইকে বিস্মিত করে মণ্ডলেশ্বর প্রথমে দু'জনকে আলিঙ্গন করলেন এবং তারপর নতজানু হয়ে প্রণাম করলেন। এই দেখে উপস্থিত সাধুরা অবাক হয়ে গেলেন, তাঁরা তাঁদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এবার দুই বিবেকানন্দ শরণাগতকে নিয়ে তিনি মঠের মধ্যে ঢুকে গেলেন এবং ভাণ্ডারা প্রাঙ্গণে দু'জনকে তাঁর দুধারে বসালেন। সমবেত সাধুজনদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "আপনারা সবাই ভাবছেন আপনারা মস্ত সাধু। যদি প্রকৃত সাধুর খোঁজ করতে হয় তা হলে এঁরা দু'জন। এঁরা দরিদ্রনারায়ণের সেবায় এক আশ্চর্য জীবন যাপন করেন, এঁদের আদর্শ হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। নব যুগের নতুন আদর্শ এঁরা। আপনারা রোগাক্রান্ত হলে এঁরা আপনাদের সেবা করেন, আর তার বদলে আপনারা এঁদের ভাঙ্গী সাধু বলেন!" এইভাবে ভর্ৎসনা করে তিনি কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দকে উদ্দেশ করে বললেন, "যেসব অপমানের বোঝা আপনাদের বহন করতে হয়েছে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।" তিনি নিজে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন! এবার সন্ন্যাসী ভ্রাতৃদ্বয় বললেন, "মহারাজ এইভাবে

আমাদের লজ্জা দেবেন না। আমরা এখানকার অপমান অপবাদ গায়ে মাখিনি।”

সেবাশ্রমের আরও একটি গল্প স্বামী সর্বগতানন্দ আমাদের শুনিয়েছেন। নিশ্চয়ানন্দের দেহাবসানের ৬ মাস পরে (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫) তরুণ নারায়ণ ব্রহ্মচারী কনখলে সেবাশ্রমের কাজ শুরু করেছেন। হিসেব খাতা পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, নিশ্চয়ানন্দের সাধ ছিল তাঁর গুরু বিবেকানন্দের মর্মরমূর্তি এখানে স্থাপন করবেন। কল্যাণানন্দজিকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, নিশ্চয়ের খুব সাধ ছিল উঁচু একটা বেদীর ওপর চমৎকার মূর্তিটি শোভা পাবে, কিন্তু নিশ্চয় টাকা জোগাড় করতে পারেনি। কোনোক্রমে হাজার দুয়েক টাকা সংগ্রহ করেছিল।

“আমি কিছু কিছু টাকা ওই ফান্ডে সুযোগ পেলেই দিতে আরম্ভ করলাম। আস্তে আস্তে চারপাঁচ হাজার টাকা হলো। এই সময় আমি (১৯৪৩) কনখল থেকে করাচি সেন্টারে বদলি হলাম। সেখানে খবর পেলাম এই ফান্ডকে জেনারেল ফান্ডের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি প্রতিবাদ জানালাম। এটা করবার অধিকার আমাদের নেই। একজন মহান সন্ন্যাসী চেয়েছিলেন স্বামীজির মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। আমাদের উচিত তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানানো। ফান্ড আলাদা থাকুক, কিছু কিছু সুদ জমা পড়ুক। পরে কোনো সময়ে কেউ পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করতে পারবেন। এসব ১৯৪৪-৪৫ এর ঘটনা। ১৯৬০ সালে বিবেকানন্দ শতবর্ষ উদযাপন পর্বে এই তহবিলের কথা মনে পড়ে গেল। যাঁরা স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে জানতেন এবং খুব ভালোবাসতেন তাঁরা বললেন, আমরা এই মূর্তি তৈরির জন্য টাকা তুলে দেব। তাঁরা কথা রেখেছিলেন এবং স্বামীজির চমৎকার একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হলো শেষপর্যন্ত।”

নিশ্চয়ানন্দপর্বে তাঁর ছবি আঁকতে গিয়ে কল্যাণানন্দজির কথা আমরা একটু কম বলেছি। উপকরণের অভাব নেই, বিভিন্ন স্মৃতিকথা ছাড়াও, আমাদের হাতের গোড়ায় রয়েছে স্বামী সর্বগতানন্দের বিবরণ। তাঁর বিবরণ কল্যাণানন্দের শেষ জীবনের কথা, টাকা আনা পাই ও বিভিন্ন

পরিসংখ্যানের বাইরেও আশ্চর্য একটি মানুষকে দেখতে পাই এই রচনায়। কোথায় অতি অল্পবয়সে পিতৃহারা বরিশালের হানুয়া গ্রামের উমেশচন্দ্র গুহের একমাত্র সন্তান দক্ষিণারঞ্জন, কোথায় বেলুড় মঠ, আর কোথায় কনখল। ভাগ্যের খেয়ালে কি বিচিত্র জীবনলীলা, যা পড়তে গেলে অবিশ্বাস্য মনে হয়। দু'জন সংসারবিরাগী একইদিনে স্বামীজির কাছে থেকে সন্ন্যাস পেয়েছিলেন—অপরজন স্বামী আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ)। সেবাকার্যের হাতেখড়ি অন্তিমশয্যায় শায়িত স্বামীজির গুরুভাই স্বামী যোগানন্দর সেবা। একমাস এই কাজ করে তরুণ দক্ষিণারঞ্জনের চোখ খুলে গিয়েছিল।

স্বামীজির নির্দেশ খুব স্পষ্ট ছিল। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তরুণ সন্ন্যাসীশিষ্যকে তিনি মিরাটের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। সেখানে হাসপাতাল আছে, কিন্তু ক'জনই বা সেখানে ঢোকবার সুযোগ পায়? হরিদ্বারে হাসপাতাল স্থাপনের পরামর্শটা স্বামীজিরই। বলেছিলেন, রাস্তায় অসুস্থ লোক দেখলে তাকে নিজের কুঁড়েঘরে তুলে নিয়ে এসো, চিকিৎসা করো।

কনখলে জমি কেনার কারণ, হরিদ্বার তখনই ঘিঞ্জি, খোলা এবং খালি জায়গা পাওয়া কঠিন। কনখলে জমি কিনে যখন ওখানে কাঁচাঘর তৈরি আরম্ভ হল তখনও লোকে বুঝতে পারছে না ওখানে কী হবে। কল্যাণমহারাজ জানিয়ে দিলেন ওখানে ডাক্তারি ক্লিনিক হবে যাতে মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পায়। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিল। তিনি সুন্দর কুঁড়েঘর তৈরি করলেন, একটা বড় ঘর রোগীদের জন্যে, আর ছোটটা নিজের থাকবার জন্যে।

এই সময় ঠাকুরের সাক্ষাৎ-শিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ হরিদ্বারে এসেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে বলেন, দেখ না, নিরঞ্জন কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা নিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। তাঁরই লুকিয়ে রাখা ঠাকুরের ভস্মাস্থি পরে আত্মারামের কৌটায় স্থান পায়। আমেরিকা থেকে ফিরবার পথে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা জানাতে নিরঞ্জনানন্দ কলকাতা থেকে কলম্বোতে হাজির হয়েছিলেন। একসময় স্বাস্থ্যের জন্য

হরিদ্বারে থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

হরিদ্বারে কল্যাণানন্দের খবর পেলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। সুদেহী ও শক্ত শরীরের মালিক তিনি, বড় বড় কাঠের কড়ি বরগা তিনি অনায়াসে তুলে নিয়ে নিজের হাতে যথাস্থানে লাগিয়ে নিতে পারতেন। কনখলে কাজের জায়গায় একটা বিরাট কাঠের বিম পড়েছিল। তুলবার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন দু'জনে মিলে সহজেই ওটা তুলে ফেলে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন। হরিদ্বারেই আকস্মিক কলেরায় মারা গেলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। তার কয়েকমাস পরেই নিশ্চয়ানন্দ কনখলে হাজির। তিনিও প্রভূত বলশালী এবং কাজে ভয় পান না। তিনি সানন্দে কল্যাণানন্দের সহকারী হয়ে গেলেন। ভিক্ষায় বেরুলে তিনি কল্যাণানন্দের জন্যে খাবার সংগ্রহ করে আনতেন, কারণ কল্যাণানন্দ প্রায়ই কাজ সেরে ভিক্ষায় বেরোতে পারতেন না।

স্বামী সর্বগতানন্দ তাঁর প্রথম কয়েকদিনের কনখল-অভিজ্ঞতা সহজভাবে লিখে ফেলেছেন। "হাসপাতালের হিসেব রাখা ছাড়াও আমি প্রায় সারাক্ষণ কল্যাণানন্দকে ছায়ার মতন অনুসরণ করতাম। তিনি যেখানে যেতেন, যা কিছু করতেন সব কিছুর নীরব সাক্ষী আমি। আমাকে অন্য কোনো কাজ বা দায়িত্ব তখনও দেওয়া হয়নি। কয়েক সপ্তাহ এইভাবে কাটিয়ে আমি তাঁকে আবার বললাম, আমি হাসপাতালে কাজ করতে চাই।

"ঠিক আছে, তুমি ওখানে যাও, জিজ্ঞেস করো ওরা তোমাকে কী কাজ দিতে চায়।" স্বামী কল্যাণানন্দ বললেন।

"আমাকে ওখানে নির্দেশ দেওয়া হলো, ওয়ার্ডটা পরিষ্কার করো। আমি সুইপার মেয়েটির কাছ থেকে শিখে নিলাম কেমন করে পিকদানি পরিষ্কার করতে হয়, বেডপ্যান পরিষ্কারের জন্যে একধরনের বুরুশ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু মহারাজ যখনই চাইবেন তখনই আমাকে তাঁর সঙ্গী হতে হয়। যখন তিনি রোগী দেখার জন্যে রাউন্ডে বেরোবেন তখন আমাকে অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে।

"যখন তিনি বাগান দেখতে বেরোবেন তখনও সঙ্গে আমি। তিনি চাইছেন, সেবাশ্রমের সব কিছু যেন আমার জানা থাকে— রোগীরা কারা,

বাগানে কী হচ্ছে, সমস্ত কিছু।

"একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজকে আশা করি তুমি বাগানে গিয়েছিলে, ছোট্ট ম্যাগনোলিয়া গাছটায় কটা ফুল দেখলে? আমি বলতে পারলাম না, অতো খুঁটিয়ে লক্ষ্য করিনি।

"জানো, ওটা একটা স্পেশাল গাছ। এসবের দিকে নজর রাখার চেষ্টা করলে ভাল হয়। কল্যাণমহারাজের প্রশ্নের ধারা এমন যে আমি সব কিছু খুঁটিয়ে দেখি।

"আর একদিন তিনি একজন রোগী সম্বন্ধে খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমি উত্তর দিতে পারলাম না। তাঁর মন্তব্য : 'তুমি কি রাউন্ডে বেরিয়ে নজর রাখো না হাসপাতালের কোথায় কী হচ্ছে?'

"আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে হাসপাতালে গেলাম, খবর নিতে। এইভাবে আমি মহারাজ রাউন্ড দেবার আগেই নিজের একটা রাউন্ড দেওয়া শিখে নিলাম।

"অভিজ্ঞ আমি বুঝে গিয়েছি, আমাকে প্রত্যেক রোগীর খোঁজ নিতে হবে, সিরিয়াস রোগীদের সমস্ত খবরাখবর আমাকে আগাম দিতে হবে মহারাজকে।

"এই পর্বে মহারাজ নিজেই ডায়াবিটিস রোগের শিকার হয়েছেন, ফলে যদি কখনও রাউন্ড দিতে পারলেন না, আমাকে সমস্ত খবরের খুঁটিনাটি সরবরাহ করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে মহারাজ আমাকে শিখিয়ে দিলেন, কিভাবে তিনি হাসপাতালের সব কাজ সারেন।"

মহারাজের দৈনন্দিন রুটিন মনে রাখার মতন।

"সকালের জলখাবারের পর আমাকে মহারাজের ঘরে যেতে হবে। সেখানে থেকে আমি ওঁর সঙ্গী। বিভিন্ন হাসপাতাল ওয়ার্ড, বাগান, গোয়ালঘর, লাইব্রেরি, মন্দির।

"তারপর আমাদের লক্ষ্যস্থল রান্নাঘর, সেখানে রাঁধুনির সঙ্গে কিছু কথাবার্তা, এবার মহারাজের ঘরে ফিরে আসা। আবার হাসপাতালে যাবার আগে মহারাজ কিছু খেয়ে নেবেন। ডাক্তাররা তো রোগীদের ভিজিট করেন, কিন্তু মহারাজ প্রত্যেক রোগীর বেডের কাছে যাবেনই, জানতে

চাইবেন তার অবস্থা। কেমন আছে? কি কি ওষুধ এবং পথ্য সে পাচ্ছে? গতরাত্রে ভাল ঘুম হয়েছে তো? হাসপাতালের ৩৫-৪৫ জন ইনডোর রোগীর সঙ্গে তিনি বেশ কিছু সময় ব্যয় করবেন। কখনও তিনি রোগীর পাশে গিয়ে বসবেন, তাঁর কথাবার্তায় দয়া এবং ভালবাসা দুই-ই ঝরে পড়ে অঝোরে। রোগীর বিশেষ কিছু প্রয়োজন থাকলে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন, অথবা আমাকে নির্দেশ দিয়ে দেবেন। এই হচ্ছে কল্যাণ মহারাজের প্রাত্যহিক রুটিন।

"বেশি কথা বলবার মানুষ ছিলেন না কল্যাণ মহারাজ। কথায় নয় কাজে, বিশেষত নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার বিশ্বাসী ছিলেন এই মিতভাষী মানুষটি। আমরা তাই মানুষটিকে সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণ করতাম খুব কাছ থেকে খুব খুঁটিয়ে। একদিন সকালে কয়েকজন ব্রহ্মচারী হাঁটতে হাঁটতে ডিসপেন্সারির দিকে চলেছে, মহারাজ লক্ষ্য করলেন একজন ব্রহ্মচারীর মুখ গোমড়া।

"মহারাজের নজর এড়ানো শক্ত, তিনি তাকে ডাকলেন, জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? মুখ ভারী কেন? কী হয়েছে? রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পেরেছ তো? আজ সকালে জলখাবার খেয়েছ তো?"

"ব্রহ্মচারীটির মুখ তখনও মেঘলা। মহারাজ এবার বললেন, 'শোনো, তুমি হাসপাতালের সেবক, সেখানে মানুষরা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে। তোমার কাজ তাদের মুখে হাসি ফোটানো, রোগীকে চাঙ্গা করে তোলা। কিন্তু নিজের মুখটাই হাঁড়ি হয়ে থাকলে তুমি সে কাজটা করবে কী করে? নিজের এই গোমড়া মুখ নিয়ে রোগীদের কাছে যেও না। বরং মন্দিরে চলে যাও, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করো। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে আনন্দিত মনে ডিসপেন্সারিতে যাও।

কল্যাণ মহারাজ চাইতেন না কেউ খুশির ভাব না নিয়ে বেজার মুখে হাসপাতালের কাজে যায়। তিনি প্রায়ই বলতেন, "তোমরা সকলে এখানে মনের আনন্দে এসেছো। আনন্দে থাকো, অপরকে আনন্দ দাও। এইটাই এখানকার সবচেয়ে বড় কথা।"

মহারাজ এই প্রসঙ্গে যীশুর কথা টেনে আনতেন। যীশু বলেছেন, 'মুখে

দুঃখের ভাব প্রকাশ করে উপবাস কোরো না।' "তুমি হয়ত কঠোর আত্মসংযমী ক্লিষ্ট জীবন যাপন করছো, কিন্তু তার জন্যে তোমাকে বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত দেখাবে কেন?"

হাসপাতালে সন্ন্যাসীদের কাজে পাঠাবার আগে মহারাজ প্রায়ই নানা কথা বলতেন। চাইতেন তাঁরা চাঙ্গা হয়ে উঠে, অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের কাজে যান।

মহারাজের কথা বলার ভঙ্গিটাই ছিল অনন্য। তিনি বলতেন, "দেখো, আমাদের এখানে মন্দিরও আছে, হাসপাতালও আছে। তোমরা মন্দিরে যাও ফুল নিয়ে, ফল নিয়ে, সঙ্গে স্তবগান, নামগান, স্তোত্রপাঠ, মন্ত্রপাঠ। আর হাসপাতালে তোমার সঙ্গে রয়েছে খাবার ও ওষুধ। দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই— একেবারে এক ব্যাপার। মন্দিরে আমরা যা করি, আর হাসপাতালে আমরা যা করি দুটো আলাদা জিনিস নয়। এই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শ। তাই দু'জায়গাতেই একই রকম মানসিকতা নিয়ে যেতে হবে।"

মহারাজ আরও বলতেন, "সবকিছু অত্যন্ত সাবধানে সচেতনভাবে পরিষ্কার রাখবে। রোগীকে ভালবাসা, করুণা সহানুভূতি দেখাও। তোমাদের সাহায্য ওদের প্রয়োজন।"

আরও একদিনের কথা মনে আছে। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, কেন 'রোগীনিবাস' না বলে 'হাসপাতাল' বলে। আমাদের অবশ্যই অতিথিপরায়ণ অর্থাৎ 'হসপিটেব্‌ল' হতে হবে। মানুষ যখন আমাদের কাছে আসে আমাদের যেটা দেবার সেটা হলো হসপিটালিটি বা অতিথিসেবা। এই ব্যাপারটা কখনও ভুললে চলবে না।"

এরপরেই মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "ইংরিজি 'পেশেন্ট' (রোগী) শব্দটার অর্থ কী? ওদের সঙ্গে ব্যবহারে আচরণে আমাদের ধৈর্য অর্থাৎ 'পেশেন্স' দেখাতে হবে। রোগীদের 'পেশেন্ট' বলা হয় এই জন্যে যে ওরা আমাদের শেখায় কীভাবে ধৈর্যশীল হতে হয়।"

কনখলের সেবাশ্রমের রোগী প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীরা যা বলতেন তার কাছাকাছি ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল বারাণসীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেও।

সেখানকার অন্যতম প্রাণপুরুষ ছিলেন স্বামী অচলানন্দ, স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এই প্রিয় শিষ্যকে কেদারবাবা বলে ডাকতেন। বারাণসী সেবাশ্রমের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী কেদারবাবার কিছু স্মৃতি আমাদের উপহার দিয়েছেন :

"সহকর্মী আরও একজন নবাগত সাধু সঙ্গে রয়েছেন— কেদারবাবাকে প্রণাম করতে গিয়েছি।

আমরা সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই জিজ্ঞেস করলেন—'এসো, আজ কটি নারায়ণ এলেন? কী সেবা করেছ তাঁদের বলো।'

আমি হাতজোড় করে নিবেদন করলাম, 'মহারাজ, আজ চারজন নারায়ণ ভর্তি হয়েছেন।'

বললাম, তাঁদের কার কী অসুখ। আমার বন্ধু সাধুটি পরে জানান—'আমার ওয়ার্ডে দু'জন পেশেন্ট' (রোগী) এসেছে।'

লক্ষ্য করলাম, কেদারবাবা বন্ধুর এই কথা শুনেই গম্ভীর হয়ে রইলেন—আর একটিও কথা বললেন না। খানিকক্ষণ বাদে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন, 'তোমরা সেবা করবে খুব ভাব নিয়ে। তাতে তোমার নিজের কল্যাণ হবে, যার সেবা করছ তারও কল্যাণ হবে। তুমি ভাববে নারায়ণের সেবা করছ। আর যার সেবা করছ, সে দেখবে—ভগবান আমারও জন্য ব্যবস্থা রেখেছেন—আমাকেও দেখবার জন্য ভগবান কাউকে নিযুক্ত রেখেছেন। মনে মনে সে বলবে—হে ভগবান তুমি আমাকেও দেখছ!'

আর খুব খোঁজ নিতেন 'কখন তুমি বলতে পার? ভগবানের চিন্তা কতক্ষণ করতে পার?'

কেদারবাবা প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেন—"যখনই সময় পাবে, তখনই বসবে এবং ভগবানের নাম করবে। ভগবানের নাম জপ, তাঁর ধ্যান এবং তাঁরই নারায়ণ মূর্তির সেবা—এই দুই সাধনই সমান ভাবে রাখবে।"

কনখল সেবাশ্রমের নারায়ণ প্রসঙ্গে ফেরা যাক। কল্যাণানন্দের জীবন দর্শন বুঝতে এই অভিজ্ঞতাটি সকলকে সাহায্য করবে। "কয়েকজন লোক এক গুরুতর অসুস্থ মানুষকে কনখল সেবাশ্রমে নিয়ে এল। ভরদুপুর বেলা,

হাসপাতাল তখন বন্ধ। যারা মানুষটিকে বয়ে এনেছিল তারা হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় মানুষটিকে ফেলে রেখে অদৃশ্য হয়েছে। গঙ্গাস্নান করে ফেরবার পথে মানুষটিকে পড়ে থাকতে দেখে আমি ডাক্তার ডেকে আনলাম, ডাক্তার রোগী পরীক্ষা করে বললেন, ভিতরে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, রোগী এখনই মারা যাবে।

"এই বলে ডাক্তারবাবু তো চলে গেলেন, কিন্তু আমি রোগী ছেড়ে নড়তে পারছি না। আমি প্রায় অসহায়ভাবে মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছি, কি করব ভেবে উঠতে পারছি না। এমন সময় দেখি, ভিতর থেকে কল্যাণ মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, ইঙ্গিতে জানতে চাইছেন কি হয়েছে?

"আমি সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। সব শুনে মহারাজ বললেন, "না, একটা বেড রেডি কর, রোগীকে ভিতরে নিয়ে এস। যদি মৃত্যু অবধারিত হয়, তা হলে শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করুক মানুষটি। তুমি অন্তত কিছুক্ষণ সেবা করবার সুযোগ পাবে।"

"আমি সঙ্গে সঙ্গে লেগে পড়লাম। দুটি বালকের সাহায্য নিয়ে রোগীকে ভিতরে নিয়ে এলাম। এবার মহারাজ স্বয়ং চলে এলেন, রোগী দেখলেন এবং দু'একটা ওষুধ লিখে দিলেন। বললেন, গ্লুকোজের জল ও লেবুর রস দাও। চার ঘণ্টা পরে মানুষটি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। ইতিমধ্যে যারা এই রোগীকে হাসপাতালের সামনে ফেলে চলে গিয়েছিল তাদের দু'জন ফিরে এসেছে।"

রোগীর সঙ্গী মানুষ দুটি সন্ন্যাসীদের আচরণ দেখে মুগ্ধ। দাহের সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে মহারাজ যে বিষয়টার গুরুত্ব আমাদের বোঝালেন তা ভুলবার নয়—সেবা কতক্ষণ ধরে করা হলো সেটাই বড় কথা নয়, যা যতক্ষণ দরকার তা করতেই হবে, খুব সামান্যক্ষণের জন্যে হলেও সেই সেবার গুরুত্ব অসীম।

আরও একবার প্রায় একই পরিস্থিতি। খুব সঙ্কটাপন্ন রোগী এসেছে। কল্যাণ মহারাজ পিছপাও হতে চান না, কাউকে ফেরাতে চান না। তিনি বললেন, "ধর তোমার নিজের ভাই এই অবস্থায় রয়েছে। তার জন্যে তুমি

কি না করবে! অপরের সম্বন্ধে একই রকম ভাবতে হবে আমাদের।"

এবার মহারাজ ডাক্তারকে বললেন, "নারায়ণকে না জানিয়ে কোনো রোগীকে ফিরিয়ে দেবেন না।" পরের নির্দেশ : "ওকে না জানিয়ে কোনো রোগীকে ছুটি দিয়ে দেবেন না।"

এই ছুটি দিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কল্যাণ মহারাজের নিজস্ব কিছু ভাবনাচিন্তা ছিল। রোগ সেরে যাওয়ায় ডাক্তার হয়ত ছেড়ে দিতে আগ্রহী, কিন্তু মহারাজ জানেন গরীব রোগীর বাড়ির লোক প্রয়োজনীয় পথ্য দিতে পারবে না যাতে সুস্থ হয়ে সে আবার রুজিরোজগার শুরু করতে পারে।

হাসপাতালে যেসব রোগী আসত তাদের বেশিরভাগই অত্যন্ত দরিদ্র। পেট চালানোর জন্যে তাদের প্রচণ্ড দৈহিক শ্রম করতে হয়। তাই মহারাজ চাইতেন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আগে তাদের শারীরিক ক্ষমতা কিছুটা ফিরে আসুক। এক একজন রোগী দেখে মহারাজ বলতেন, "একে আরও ক'দিন রেখে দাও এবং খুব ভাল করে খাওয়াও। একটু শক্তি ফিরে পাক, তারপর ওকে বাড়ি পাঠিও।"

"হাসপাতাল থেকে ছাড়বার সময় মহারাজ শুধু এদের কয়েকদিনের ওষুধ দিয়ে দিতেন তা নয়, রান্নাঘর থেকে বেশ কিছু খাবার গুছিয়ে দিতেন। এর জন্যে 'রামকৃষ্ণ মিশন' মার্কা বিভিন্ন সাইজের বেশ কিছু শিশিবোতল আমাদের স্টকে থাকত।

"ওখানে ডাক্তার বোস বলে একজন নামকরা প্রাইভেট চিকিৎসক ছিলেন, তাঁর সাহায্যে আমরা চাইলেই পেতাম। অর্থাৎ প্রত্যেক রোগীর জন্য আমাদের পক্ষে যা যা সম্ভব তা না কবা পর্যন্ত কল্যাণ মহারাজ ক্ষান্ত হতেন না। এর পরে অনেকের কাছে কল্যাণ মহারাজ যে দেবতার মতন হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য কি?

"স্থানীয় লোকদের মুখে নিশ্চয়ানন্দ মহারাজ সম্পর্কেও একই ধরনের কথা শুনতাম। একেবারে নিজের মতন করে নিয়ে তিনি যেভাবে মানুষের সেবা করতেন তা স্থানীয় মানুষদের মনে ছিল। যখনই মানুষের মুখে নিশ্চয়ানন্দের প্রশস্তি শুনতাম তখনই ভাবতাম, আমরা কখনই কি ওঁদের স্তরে উঠে আসতে পারব?"

আরও একটা কথা কল্যাণ মহারাজ সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দিতেন। "তোমরা, এখানে সেবা দিতে এসেছ, সেবা নিতে নয়। সুতরাং নিজেরা অসুখে পড়ে যেও না।" ফলে আমাদের অসুখ-বিসুখ করলে, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া হলে, মহারাজ প্রায়ই তা জানতে পারতেন না। শরীর খারাপ হলে ওঁকে না জানিয়ে, চুপি চুপি ওষুধপত্তর খেয়ে আমরা কাজে লেগে থাকতাম।"

গুরুর মন্ত্রে তখন কল্যাণীনন্দ কথা নয় কাজে বিশ্বাস করতেন। কাজের মূর্ত বিগ্রহ এই মানুষটি গভীর রাতে হাসপাতালে সামান্য আওয়াজ হলেও ঘুম থেকে উঠে পড়ে, দ্রুত জুতো পরে হাসপাতালের দিকে এগোতেন। সঙ্গের সাথী বিশ্বস্ত কুকুরটি। "আমার ঘরটা ছিল মহারাজের ঘরের ঠিক পাশেই। আমিও ততক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে মহারাজের পিছন পিছন হাসপাতালে হাজির হয়েছি। মহারাজ বুঝতে পারতেন আমি এসে গিয়েছি। যদি তিনি কোনো ওষুধের কথা বলতেন আমি তা সঙ্গে-সঙ্গে হাজির করতাম।

"কল্যাণানন্দ মহারাজের শান্তস্বভাব উল্লেখ করার মতন, তাঁকে চটানো বা উত্তেজিত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। একবার এক টাইফয়েডের রোগী প্রচণ্ড জ্বরে বিকারগ্রস্ত হয়ে মহারাজকে এমনভাবে আঘাত করল যে তিনি পড়ে গিয়ে চশমা ভেঙে ফেললেন। আমরা লোকটাকে সামাল দেবার জন্যে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে মহারাজ বললেন, "ওকে কিছু করো না। ওকে বসে থাকতে দাও।" মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজ এবার রোগীকে একহাতে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন ভাল বোধ করছ তো?" এরপর ডাক্তারকে খবর পাঠালেন। আমরা মহারাজের ওই অবস্থা দেখে উত্তেজিত, কিন্তু মহারাজ একেবারে শান্ত, তাঁর মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই।"

স্বামী সর্বগতানন্দ লিখেছেন, "সেবা ও আত্মদানের নিবেদনের মূর্ত পরিগ্রহ এই স্বামী কল্যাণানন্দ। এক আধ বছর নয়, দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর তাঁর এই সেবার নিঃশব্দ পরিচয় তিনি রেখে গিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে একবারও তিনি কলকাতায় যাবার কথা মনের মধ্যে আনেননি। থেকে

গিয়ে সেবা করবার জন্যেই তো তিনি এসেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন 'বাংলাকে ভুলে যাও' এবং সেই নির্দেশ সারাক্ষণ মহারাজের মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। অন্তত তিনজন সঙ্ঘসভাপতি (স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ) চেষ্টা করেও তাঁকে বেলুড়ে নিয়ে যেতে পারেননি। চতুর্থ সভাপতি স্বামী বিরজানন্দ যখন বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির তৈরি হলো তখন কল্যাণানন্দকে মস্ত চিঠি লিখলেন, একবার বেলুড় ঘুরে যাবার জন্যে। তিনি রাজি হলেন না। ১৯৩৭ সালে মহারাজ আমাকে বেলুড় ঘুরে আসতে বললেন, কিন্তু আমি বললাম, "আপনি না গেলে আমি যাব না, আমি এখানে থেকে যাব।"

বিবেকানন্দ নির্দেশিত সেবা সত্যিই বড় কঠিন ব্রত। অবিচলিত নিষ্ঠাই এই পথে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়।

মঠ ও মিশনের কিংবদন্তি সন্ন্যাসীদের অনেকেই হরিদ্বার ও কনখলে গিয়েছেন। এঁদের জন্যে স্বামী কল্যাণানন্দের দ্বার ছিল অবারিত। প্রেসিডেন্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৯০৪ সালে কনখলে এসেছিলেন। সেই সময়ে যে চেয়ারে তিনি বসতেন তা সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন কল্যাণানন্দ। সকলের সামনেই থাকত এই চেয়ার, কিন্তু কেউ বসতেন না। প্রতিদিন সকালে মন্দির থেকে বেরিয়ে কল্যাণানন্দ একবার এই চেয়ারটি স্পর্শ করতেন শ্রদ্ধাভরে। সর্বগতানন্দ একবার জানতে চাইলেন, চেয়ারটা রঙ করতে পারি কি?

"রঙ করতে পারো, কিন্তু চেয়ারটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে রেখো না।" ফলে সর্বগতানন্দ চেয়ারটা পরিষ্কার করলেন, রঙ লাগালেন এবং একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিলেন, "দয়া করে এই চেয়ারটা ব্যবহার করবেন না।"

১৯১৬ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ আবার কনখলে এসেছিলেন। তখন সেবাশ্রমে যক্ষ্মা রোগীদের জন্যে একটা আলাদা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সুন্দর বাড়ি, বেশ জায়গা রয়েছে, একটা বড় হলঘরও রয়েছে। তখনও গৃহপ্রবেশ হয়নি, রাজা মহারাজ বললেন, "চমৎকার বাড়ি, এখানে দুর্গাপুজো করা যাক।" সেই মতো ওখানেই দুর্গাপুজো হলো, সবাই উৎসবে অংশগ্রহণ

করল।

এরপরে প্রেসিডেন্ট মহারাজ বললেন, "কল্যাণ, মন্দিরের পক্ষে এটা উপযুক্ত স্থান। অনেক লোক আসতে পারবে।"

মহারাজ কনখল থেকে চলে যাবার পরে বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী কল্যাণানন্দকে মনে করিয়ে দিলেন, স্বামী ব্রহ্মানন্দ চেয়েছেন এটিকে পূজালয়ে রূপান্তরিত করতে। কল্যাণানন্দ সোজা উত্তর দিলেন, "শোনো, যক্ষ্মা রোগীদের ওয়ার্ড করবার জন্যে আমি লোকের কাছ থেকে ডোনেশন নিয়েছি। অন্য কোনো কাজে আমি কখনোই এটা ব্যবহার করতে পারব না। প্রেসিডেন্ট মহারাজ ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা টাকা তুলেছি সেটা পালন করা আরও গুরুত্বপূর্ণ।"

অনেকদিন পরে, শ্রীরামকৃষ্ণশতবর্ষ উদযাপনের বছরে, সরকারি নির্দেশ জারি হলো, যক্ষ্মারুগি ও অন্য রুগিদের একসঙ্গে রাখা যাবে না। গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যে আলাদা একটা যক্ষ্মা হাসপাতাল তৈরি করে ফেলেছেন। এর ফলে সেবাশ্রমে যক্ষ্মা চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেল।

আরও অজস্র অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃতদেহ সম্বন্ধে তরুণ এক সন্ন্যাসীর ভীষণ ভয় ছিল। কল্যাণানন্দ তা জানতেন।

"একদিন আমার সারারাত ডিউটি পড়েছে। কল্যাণ মহারাজ শান্তভাবে নিঃশব্দে হাসপাতালের চলে এলেন সেই রাত্রে। একের পর এক ওয়ার্ড ঘুরছেন তিনি, আমি সঙ্গে রয়েছি। এরপর আমরা মড়িঘরের কাছে চলে এলাম। শবদেহ সম্বন্ধে আমার ভীষণ ভয় ছিল। যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের মৃতদেহর কাছে যেতে দেওয়া হতো না। যখন বড় হয়েছি তখনও মৃতদেহের কাছাকাছি যাবার সুযোগ ঘটেনি। সেবাশ্রম থেকে যখন মৃতদেহ সরানোর প্রয়োজন হত তখন অন্যরা এই কাজ করতেন। আমাকে কখনও শবানুগমন করতেও বলা হয়নি। ফলে হাসপাতালের মড়িঘরে আমি কখনও ঢুকিনি।

কিন্তু সেই রাত্রে হাসপাতালের মড়িঘরের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে কল্যাণ মহারাজ এক জন রোগী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

আমাকে বলতে হলো সে আর বেঁচে নেই, দেহটা মড়িঘরে চলে গিয়েছে। মহারাজ তখন আমার সামনে, আমি পিছনে। তিনি মড়িঘরের দরজা খুললেন, আলো জ্বাললেন এবং ভিতরে ঢুকে গেলেন। আমাকেও পিছন পিছন যেতে হলো। উনি সঙ্গে থাকলে আমার ভয় পাবার অবকাশ নেই। আমারও সাহস বেড়ে যাচ্ছে। মহারাজ মৃতদেহের খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে, মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিলেন এবং দেহটিকে দেখতে লাগলেন। এবার আমার দিকে মুখ ফেরালেন মহারাজ, বললেন, "কিছু লোক শব দেখলে ভয় পায়। পৃথিবীতে নিতান্ত নিরাপদ বলতে যদি কিছু থাকে তা হলো মৃতদেহ। একটা আঙুল পর্যন্ত তোলে না, একটা কথা পর্যন্ত বলে না, তবু মানুষ ভয় পায়। যেখানে ভয় পাবার কিছুই নেই সেখানে মানুষ ভয় পায়।"

"আপনি ঠিক বলেছেন," আমার উত্তর। আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে, মহারাজ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন, হাত ধুলেন, এবার চলে যেতে প্রস্তুত তিনি। কিন্তু আমাকে মৃতের মুখের কাপড়টা টেনে দিতে হলো। আমি করলামও। তারপর আমি হাত ধুলাম। এবার আমরা দুজনে ওখান থেকে চলে গেলাম।

"সেই শেষ, এরপর মৃতদেহ থেকে আমি জীবনে কখনও ভয় পাইনি।

"কল্যাণানন্দ জানতেন কি করে ভুল ভাঙিয়ে শিক্ষা দিতে হয়। সেবার মড়িঘরে ঢুকে তিনি সোজাসুজি আমার সমালোচনা করেননি, সাবধানে শুধু বলেছেন, "মানুষ ভয় পায়।"

কনখলকে বিবেকানন্দ ভাবনার আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন কল্যাণানন্দ। কনখলের নটি বছরের মধ্যে আড়াই বছর স্বামী সর্বগতানন্দ কাটাতে পেরেছিলেন স্বামী কল্যাণানন্দের সান্নিধ্যে।

সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, সন্ন্যাসীর দৈনন্দিন জীবনে থাকে কাজ, পূজা, পাঠ ও উপাসনা। মঠের দৈনন্দিন জীবনে অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ নেই, মঠ থেকে বেরিয়েই হাসপাতালের কাজ অথবা সন্ধ্যায় ছোটদের পড়াশোনা করানো। এখানে তীর্থযাত্রী এবং রোগীরা আছেন, কিন্তু ভক্তরা অনুপস্থিত। ফলে ভক্তদের জন্য সময় ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কল্যাণানন্দের দেহাবসানের কিছুদিন আগে কনখলের গ্রন্থাগারে বসে কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাসী গল্প করছেন। একজন বললেন, "আমরা সবকিছু ত্যাগ করেছি, এখন কল্যাণানন্দ মহারাজের স্নেহময় সান্নিধ্যে এবং শিক্ষায় বেশ ভালো আছি।"

মহারাজ সেইসময় ওই পথ ধরে হাঁটছিলেন, তরুণদের কথা শুনে ভিতরে ঢুকে পড়ে একটা চেয়ারে বসলেন। উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়ালেন।

মহারাজের প্রশ্ন, "কে বলেছে তোমরা সবকিছু ত্যাগ করেছ? কী তোমরা ত্যাগ করেছ? বাবা, মা, ভাই, বোন, বাড়ি? প্রথমেই বল এসবের মালিকানা কী তোমার? তুমি যার মালিক তার কিছু ত্যাগ করেছ কি? তুমি কীসের মালিক? তোমার অহং, তোমার স্বার্থবোধ। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, 'ত্যাগ এবং সেবা।' নিজের অহং ও স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে প্রেমময় সেবা কর। এর নাম ত্যাগ।"

এরপর মহারাজ একজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এইটা লিখে নাও—স্বামীজির নিঃস্বার্থ প্রেমময় সেবাই আমাদের মন্ত্র।" এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন, তরুণ সংসারত্যাগীরা স্তম্ভিত হয়ে বিবেকানন্দশিষ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একবার কল্যাণানন্দ রোগী দেখতে বেরিয়েছেন, তখন তরুণ সন্ন্যাসীদের কেউ কাছাকাছি ছিল না। পরিস্থিতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। মহারাজ নিজের হাতে সমস্ত জায়গাটা পরিষ্কার করলেন, কিন্তু কাউকে ডাকতে পাঠালেন না। বিছানায় কাচা চাদর নতুন করে বিছিয়ে দিলেন। কাছেই একটা টব ছিল, সেখানকার জলে রোগীর জামাকাপড় ভিজিয়ে দিলেন। তারপর নিজের হাতে সেগুলো কেচে বাইরে এনে রোদে শুকোতে দিলেন। "সহযোগীরা যখন ওয়ার্ডে এলেন, তখন এইসব দেখে তাঁরা রোগীদের জিজ্ঞেস করলেন, কে এসব কাজ করেছে? কেউ ঠিকমতন বলতে পারল না। সবাই তাঁকে চিনতো না।

সেবাকার্যের জন্যে কনখলে অনেকে এসেছেন, কিন্তু কাজের প্রবল চাপ সহ্য না করতে পেরে কিছুদিন পরে চলে গিয়েছেন। কল্যাণানন্দ কিন্তু

কারও ওপর জোরজার করতেন না। অনেক সময় তাঁকে না বলেই সেবকরা আশ্রম ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

কর্মীরা সন্ধেবেলা প্রত্যেকে বেড়াতে বেরোতে চাইতেন। অথচ এই সময়েই হাসপাতালে কাজের চাপ তুঙ্গে। সর্বগতানন্দকে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতে হতো না। কল্যাণানন্দ বলতেন, "শুধু শুধু বেড়াতে বেরোবে কেন? এসব যারা কুঁড়ে অথবা বৃদ্ধ তাদের জন্যে, যারা কমবয়েসি তাদের হাতে তো হাজার রকম কাজ।"

বেড়াতে যাবার মতন সময় কল্যাণ মহারাজেরও হাতে থাকত না। স্বামী নিশ্চয়ানন্দের কাছেও এই বেড়ানো ছিল বিলাস। সন্ধ্যায় লোকে হাঁটতে-হাঁটতে গঙ্গা আরতি বা ব্রহ্মকুণ্ড দেখতে যেতে চাইতেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল স্বয়ং ঠাকুর আমাদের মন্দিরে রয়েছেন, যা কিছু আমাদের দরকার সব এখানেই পাওয়া যাবে। এসব ছেড়ে গঙ্গায় গিয়ে আরতি দেখার কী প্রয়োজন?

কল্যাণানন্দ যা সরলভাষায় সোজাভাবে বলতেন, তা হলো, "পূজা, প্রার্থনা ও জপের জন্যে এখানে মন্দির রয়েছে, আর সেবার জন্যে হাসপাতাল রয়েছে। সবই তো এক। এসব ছেড়ে সান্ধ্যভ্রমণের বিলাসিতা কেন?"

আশ্রমের কর্মীরা যে কী কঠিন অবস্থায় দিন কাটাতেন তার বিবরণ এখন পড়লে অবিশ্বাস্য মনে হয়। প্রত্যক্ষদর্শী জানাচ্ছেন, দু'বছর আমাদের কোনো সকালের জলখাবার বা প্রাতরাশ ছিল না। কারণ আমাদের সেই আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। দুপুরে বারোটার সময় আমাদের জুটতো দুটি ভাত এবং ঝোল বা ডাল, রাত্রে দুটি রুটি এবং সামান্য সবজি, ওইটাই আমাদের ডিনার।

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে হাসপাতালের অর্থ স্পর্শ করা হত না। যদি কেউ সাধুদের জন্যে কিছু অর্থ দান করতেন, কেবল সেই টাকাই খরচ করা যেত। অবস্থা দেখে একজন ভক্ত বেশ কিছু অর্থ সাধুদের সেবার জন্য দান করেন। এর পরেই বাইরে থেকে কোনো সাধু কনখলে এলে তাঁকে সঙ্গে থাকতে আমন্ত্রণ জানাতে সাহস হত।

তবু সুদূর হেড অফিসের খবরদারি থেকে সেবাশ্রমের মুক্তি ছিল না। একবার হিসেব পরীক্ষার জন্যই বেলুড় মঠ থেকে এলেন স্বামী শুদ্ধানন্দ। সবে তিনি জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব থেকে ছুটি পেয়েছেন (পরে সঙ্ঘ সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন)। তারও আগের আর এক বিশিষ্ট অতিথি—স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দ।

হরিমহারাজের প্রতি কল্যাণানন্দের ছিল প্রবল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। হরিমহারাজ এ অঞ্চলে এসে যখন শুনলেন কল্যাণ এখানে রয়েছে তখন তিনি সেবাশ্রমে থাকবার জন্যে চলে এলেন। কোনোরকম কষ্টকে ভয় পেতেন না ঠাকুরের এই ত্যাগী সন্তান।

সেই সময় কনখলের চারদিকে জঙ্গল। একটা পাগলা ষাঁড় সমস্ত রাত ছোটাছুটি করে সবকিছু তছনছ করত। পাগলা ষাঁড়টা খুব কাছে এসে পড়লে কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ দু'জনে মিলে তাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতেন। আশ্চর্য ব্যাপার, তুরীয়ানন্দজী আগে থেকে বুঝতে পারতেন এবং বলতেন, " কল্যাণ, ষাঁড়টা আসছে এদিকে।" ওখানে মস্ত একটা ঢাক ছিল, সেটা খুব জোরে বাজিয়ে ষাঁড়কে ভয় পাইয়ে দেওয়া হতো।

ক'দিন পরপর এই ঘটনা ঘটলো। তখন কল্যাণানন্দ জিজ্ঞেস করলেন তুরীয়ানন্দকে, "মহারাজ, আপনি কী রাত্রে ঘুমোন না? সামান্য একটু শব্দে আপনি জেগে ওঠেন।"

তুরীয়ানন্দ মুখ টিপে হেসে বলনে, "ঘুমোই, তবে তোমাদের মতন নয়।" হরিমহারাজের এই কথাটি কল্যাণমহারাজ তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

কল্যাণমহারাজের দেহত্যাগের পর ওঁর জিনিসপত্তর গুছোতে গুছোতে এই ডায়েরিটা তরুণ সন্ন্যাসীর হাতে আসে। তখন ১৯৩৭ সালের শেষ দিক। স্বামী জগদানন্দকে স্বামী সর্বগতানন্দ বললেন, "কল্যাণমহারাজ তাঁর ডায়েরিতে এই মধ্যরাতের মত্ত ষণ্ডের কথা লিখে রেখেছেন। সেই সঙ্গে 'তুরীয়ানন্দ বললেন, আমি তোমাদের মতন ঘুমোই না।'

এর অর্থ কী, জানতে চেয়েছিলেন সর্বগতানন্দ। স্বামী জগদানন্দের ব্যাখ্যা—উনি অন্য সকলের থেকে আলাদা। উনি অবশ্যই ঘুমোতেন, কিন্তু

সবসময় চেতনা থাকত—পূর্ণ চেতনা। রামকৃষ্ণদেব একবার বলেছিলেন, "ঘুমকে আমি ঘুম পাড়িয়েছি!"

আরও একজন অতিথির আগমন ও ট্র্যাজেডির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কনখলের স্মৃতি। তিনিও কম লোক নন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম সেবাশ্রম বারাণসীতে প্রতিষ্ঠার ও লালনপালনের দুর্লভ কৃতিত্ব তাঁর। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম চারুচন্দ্র দাস, বহুবছর সংসারে সন্ন্যাসীর মতন বসবাস করে জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি স্বামী শুভানন্দ হয়েছিলেন।

টাকাকড়ি বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে বিবেকানন্দশিষ্য কল্যাণানন্দের কী আচরণ তা-ও একালের ম্যানেজমেন্ট বিশারদদের চিন্তার খোরাক হতে পারে। এটি জানা না থাকলে পুরো মানুষটিকে বোঝা অসম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে বেলুড় হেড অফিস হিসেবপত্তর সম্বন্ধে সর্বদা সাবধান। স্বামী শুদ্ধানন্দ শুধু বিশ্রাম নিতে এবং তপস্যা করতে কনখলে আসেননি। ইনি বিবেকানন্দের সাক্ষাৎশিষ্য, তাই গুরুভাইয়ের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় খুবই আনন্দিত।

যথাসময়ে স্বামী শুদ্ধানন্দ গুরুভাইকে তাঁর কনখলে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য জানালেন, কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেবাশ্রমের আর্থিক দিকটা দেখে আসতে বলেছেন। খরচপত্তর কীভাবে হচ্ছে, যেসব টাকা এককালীন দান হিসেবে এসেছে তা কোথায় কীভাবে বিনিয়োগ হচ্ছে, ইত্যাদি হিসেবপত্তরের প্রশ্ন। এর একটা কারণ হতে পারে, নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে খরচাপত্তরের বাইরে রাখলেও, বেলুড় হেডকোয়ার্টার কখনও তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত আর্থিক বিবরণ পাননি। একজন তরুণ সন্ন্যাসী কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন যখন শুদ্ধানন্দজী বললেন, "কল্যাণ, ওঁদের ইচ্ছা আমি তোমার আর্থিক ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে আসি। তুমি কোথায় কীভাবে টাকা বিনিয়োগ করেছ?"

কল্যাণানন্দ অ্যাকাউন্টস নিয়ে অযথা মাথাব্যথা করতেন না, যদিও একটা আধলা বাজে খরচের উপায় নেই। বারাণসীর সেবাশ্রমে বিবেকানন্দশিষ্য চারুচন্দ্র দাসও (স্বামী শুভানন্দ) ছিলেন এই ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী। তাঁর জীবনীকার স্বামী নরোত্তমানন্দ লিখে গিয়েছেন,

একবার রাতের খাবারের পর একটি লবঙ্গ হাতে পেলেন। তিনি আর একটা লবঙ্গ চাইতে, চারুচন্দ্র মুখের ওপর যদিও সবিনয়ে বললেন, এখানকার নিয়মাবলীতে খাবার পরে একটি করে লবঙ্গ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া আছে! শুনলে অবাক হতে হয়, কিন্তু এমনি করেই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা পরের কাছ থেকে ভিক্ষে করা অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

স্বামী শুদ্ধানন্দের হিসেবঘটিত প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণানন্দ বললেন, "মহারাজ আপনি এই সব ব্যাপারে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন কেন? আপনার শরীর খারাপ, আপনি এখানে এসেছেন বিশ্রাম নিতে, এখন তো আপনি অবসর জীবন যাপন করছেন। আপনি এখানে আসছেন তাই আপনাকে ওরা একটু কাজে লাগাতে চায়। এসব ব্যাপারে ব্যস্ত হবেন না, আপনি ভালো করে বিশ্রাম নিন, তারপরে আমরা মুসৌরি যাব, সেখানে খুব হৈ হৈ হবে।"

টাকাকড়ির ব্যাপারে প্রচণ্ড সাবধানী এবং প্রচণ্ড উদাসী, এই হচ্ছে বিবেকানন্দশিষ্যদের স্বভাব। অনেকে ভাবত কল্যাণমহারাজ ভীষণ কৃপণ, না হলে তিনি কেন রোগীদের বিছানার চাদর এবং বালিশের খোল নিজের হাতে সেলাই করতেন? কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিনি এই সেলাই করতেন, কোথাও সামান্য একটু খুঁত খুঁজে পাওয়া যেত না তাঁর সেলাইকর্মে।

মহারাজ প্রচণ্ডভাবে নীতিনির্ভর ছিলেন, যা করবেন ঠিক করেছেন তা তিনি করবেনই। শোনা যায় বরিশালের মানুষরা এমন একটু গোঁয়ার হয়। অন্ধ্রের ছেলে সর্বগতানন্দ একদিন কথাবার্তার মধ্যে জিজ্ঞেস করে বসলেন, মহারাজ আপনি কি 'বাই এনি চান্স' বরিশালের লোক? তিনি উত্তর দেননি, কিন্তু তরুণ সহকারী পরে অন্য সূত্রে খবরটির সমর্থন পেয়েছেন। মহারাজ কিন্তু ভোলেননি যে সর্বগতানন্দ তাঁকে এই প্রশ্নটা করেছিলেন।

অর্থ সম্পর্কে স্বামী কল্যাণানন্দের মানসিকতা অনেকটা গল্পের মতন। সর্বগতানন্দ যখন হিসেবপত্তর রাখা শুরু করেছেন তখন এক ভদ্রলোক সেবাশ্রমকে প্রতি মাসে এক টাকা ডোনেশন দেবেন বলে কথা দেন। কয়েকমাস তিনি টাকাটা পাঠাচ্ছেন না।

টাকা আদায়ের কথা ভেবে তরুণ হিসেব রক্ষক একদিন কল্যাণানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, লোকটিকে প্রায়ই বাজারে দেখতে পাই, ওঁকে কি টাকার কথাটা মনে করিয়ে দেব?"

"তাই নাকি! যখন তুমি এখানে এলে তখন অখণ্ডানন্দজী কি তোমাকে টাকা তুলতে বলেছিলেন?"

সর্বগতানন্দ বললেন, "না।"

"আমি কি তোমাকে কিছু বলেছিলাম?"

"না, মহারাজ।"

"তা হলে তুমি কেন ব্যস্ত হয়ে উঠছ? যা আসছে ঠাকুরের আশীর্বাদে তাতেই চালিয়ে দেওয়া যাবে। আজকে তুমি টাকা তুলতে চাও, তহবিল বাড়াতে চাও, নতুন নতুন ঘরবাড়ি করতে চাও। এর ফল কি হবে? মনটা ওসবেই পড়ে থাকবে, অধ্যাত্মজীবনটা উবে যাবে। ওই জীবনের পিছনে লেগে থাক, যোগ্যজীবন যাপন কর; ওটারই বেশি প্রয়োজন। টাকাকড়ি বাড়িঘর দোর এসব নিয়ে চিন্তা কম কর। লোকের যদি ইচ্ছে হয় দান করুক, যদি না করে তা হলেও কিছু এসে যাবে না।"

কল্যাণানন্দ বলতেন, "কাজটা ভালো করে করাটাই জরুরি। শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায় যতটুকু আসছে সেইটাই আমরা যেন ভালো করে ব্যবহার করি। কত বেশি কাজ হলো তার থেকে কত ভালো কাজ হলোটাই গুরুত্বপূর্ণ। যা হাতের গোড়ায় রয়েছে, তা যত ছোটই হোক তা করে ফেলা যাক। না হলে মনের মধ্যে সব পরিকল্পনা গজাবে, তোমার সারাজীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ওসব জিনিস যেমন চলছে তেমন থাকতে দাও।"

আধ্যাত্মিক জীবনে এ এক বিচিত্র আদর্শ। আমরা এখানে টাকা তুলতে এবং একের পর এক বাড়ি তৈরি করতে আসিনি। আমরা এসেছি আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে। "মাঝে মাঝে এই ধরনের পথ নির্দেশ দরকার, না হলে আমাদের পথ হারিয়ে যাবে," লিখেছেন স্বামী সর্বগতানন্দ।

আর অর্থ! একবার একজন পাঁচশ টাকা চুরি করল। স্বামী কল্যাণানন্দ শান্তভাবে, কোনোরকম দুশ্চিন্তা না করে বললেন, আমার মনে হয়, টাকাটা

ওর দরকার ছিল।

একবার একটা লোক বাগানে কাজের খোঁজে এল। যে-সন্ন্যাসী বাগানের দায়িত্বে ছিলেন, তিনি তাকে দেখেই বললেন, "হতভাগা, তুই অমুক জায়গা থেকে অমুক জিনিস চুরি করে পালিয়েছিলি, আর এখন এসেছিস কাজের খোঁজে! দূর হয়ে যা এখান থেকে।"

এমন সময় স্বামী কল্যাণানন্দ সেখানে হাজির হলেন। তিনি লোকটিকে বললেন, "যাও, তুমি বাগানে ফিরে গিয়ে কাজ করগে যাও।"

"কিন্তু, স্বামীজি আমাকে চলে যেতে বলেছেন।"

কল্যাণানন্দ মহারাজ এবার হেসে ফেললেন। "স্বামীজি জানেন না যে তুমি অন্যায় করলেও, আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছ।"

মহারাজ লোকটিকে নিয়ে বাগানে গেলেন এবং ওখানকার স্বামীকে বললেন, "শোনো, এ অন্যায় করেছে বটে, কিন্তু তার জন্যে অনুতাপ হয়েছে।"

কল্যাণ মহারাজ ক্ষমা করলেন বটে, কিন্তু বাগানের স্বামী এই ক্ষমা করাটা তেমন পছন্দ করলেন না। পরে খাবার ঘরে এই স্বামী বললেন, "লোকটা আবার কী করবে কে জানে।"

"হয় দুশ্চিন্তা করে যেতে হয়, না হয় লোকটাকে একটা সুযোগ দিতে হয়।'

"আমি জানি না।"

বাগান স্বামীর এই মন্তব্য শুনে নারায়ণ মহারাজ বললেন, "আমিও জানি না, তবে কল্যাণ মহারাজের আদর্শটা আমাদের থেকে ভাল। মহারাজ যখন চাইছেন, তখন চোরকেও আর একটা সুযোগ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।"

অদ্ভুত ঘটনা আরও আছে। একটা লোক প্রায়ই কল্যাণ মহারাজের কাছে এসে পয়সা চাইত। কিছু পেলেই সে চলে যেত। অনেকবার ব্যাপারটা ঘটেছে। একদিন মহারাজকে জিজ্ঞেস করা হলো, "লোকটা কে? আপনার কাছে আসে, টাকা নেয়, আর চলে যায়। কোনো কাজও করে না।" মহারাজ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না।"

লোকটি আর একদিন এল। মহারাজ যে দেহরক্ষা করেছেন সে খবর লোকটা পায়নি, সে সোজা মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

"কত টাকা তোমার প্রয়োজন?" জিজ্ঞেস করলেন তরুণ সন্ন্যাসী।

"আমি টাকা চাই না, আমি জানতে চাই মহারাজ কোথায়?"

মহারাজ পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছেন শুনে লোকটি ভেঙে পড়ল এবং শিশুর মতন কাঁদতে লাগল। তারপর বলল, "আপনারা জানেন না, উনি আমার জন্যে কি করেছেন।"

"কী করেছেন তিনি?"

"সে অনেক ঘটনা। একদিন বাজারে গিয়েছি, আমার কাছে একটা পয়সা ছিল না, আমি একটা দোকান থেকে কিছু জিনিস চুরি করেছিলাম। ওরা ধরে ফেলল, পুলিশ এসে গেল এবং আমাকে বেদম মারতে শুরু করল। মহারাজ এই পথ দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে যাচ্ছিলেন। উনি গাড়ি থামিয়ে পুলিশকে বললেন, মারা বন্ধ করুন। তারপর জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছে?' সবাই বলল, লোকটা এইসব জিনিস চুরি করে পালাচ্ছিল। 'জিনিসগুলোর কত দাম?' জিজ্ঞেস করলেন মহারাজ। তারপর তিনি দাম মিটিয়ে দিয়ে আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'ভবিষ্যতে টাকার দরকার হলে আমার কাছে আসবে। চুরি করবে না। তোমাকে দেখে তো ভালো লোক বলে মনে হচ্ছে, তুমি কেন চুরি করবে?' এরপর থেকে আমি যথাসম্ভব খাটাখাটনি করতাম, যখন খুব আটকে যেতাম তখন মহারাজের কাছে আসতাম, তিনি কিছু দিতেন। বাজারের ওই ঘটনার পরে আমি আর চুরি করিনি। আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন মহারাজ। আমাকে কখনও প্রশ্ন করতেন না, শুধু দিতেন।"

সর্বগতানন্দ লিখেছেন, "লোকটিকে বললাম, আমি আপনাকে কিছু অর্থসাহায্য করব। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটি না বলল, কিছুতেই আমার অর্থ নিল না।"

অদ্ভুত সব আগন্তুকদের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কল্যাণানন্দের কাছে একজন বোবা আসত, চুপচাপ বসে থাকত, কিছু খাবার খেত। তারপর চলে যেত। আর একজন উন্মাদ আসত, মাঝে মাঝে ক্ষেপেও যেত। কিন্তু

সবাইকে খাওয়াতেন মহারাজ। তবে এই উন্মাদটিকে খাবার দেওয়ার সময়ে সবাইকে সাবধান থাকতে হতো।

একজন সাধুর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। এঁর বুকে একটা গুলি ঢুকেছিল, বার করা যায়নি। এঁর প্রবল মাথার যন্ত্রণা হতো, মহারাজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিদিন তাঁর মাথায় চন্দন তেল মালিশ করতে হতো। কল্যাণ মহারাজ নিজে এঁদের সবার দেখভাল করতেন।

গুলিবিদ্ধ এই মহারাজের বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে। হৃষীকেশের কাছে ঘন অরণ্যে ঢাকা স্বর্গাশ্রমে যোগীরা আসতেন তপস্যার জন্য। রামকৃষ্ণ মিশনের বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরা, যেমন স্বামী প্রেমেশানন্দ এখানে তপস্যা করেছেন। একবার এলেন তারকেশ্বরানন্দজী। স্বর্গাশ্রমের ঘন অরণ্যের মধ্যে তিনি একাকী পরিভ্রমণ করছেন, এমনসময় এক শিকারী হরিণ মনে করে তাঁর দিকে গুলি ছুড়লেন। যে লোকটি গুলি ছুড়েছিল তাকে তারকেশ্বরানন্দজী চিনতেন, কিন্তু পুলিশের শত অনুরোধও তার নাম বললেন না। অথচ মিথ্যাও বললেন না, তাঁর সোজা সরল উত্তর: "নাম আমি জানি, কিন্তু বলব না।" বুক থেকে গুলি বার করা যায়নি, ওই অবস্থাতেই তাঁকে কনখল সেবাশ্রমে আনা হলো, তাঁর শরীরে প্রবল যন্ত্রণা, মুখ বুজে সহ্য করতেন সব, কিন্তু কে গুলি করেছিল তা কখনও মুখে আনলেন না।

অর্থের ব্যাপারে বিবেকানন্দ-শিষ্য কল্যাণানন্দের চিন্তাধারার আর একটি কাহিনি আজও বেঁচে আছে। সেবাশ্রমে গভীর যত্নের সঙ্গে তিনি একশ পঁচিশটি আমগাছ লাগিয়েছিলেন। যখন এইসব গাছে ফল ধরতে আরম্ভ করল তখন একজন সন্ন্যাসী বললেন, "কয়েক হাজার আম ফলেছে। এগুলো বিক্রি করে টাকা পাওয়া যেতে পারে।"

কল্যাণানন্দের উত্তর খুবই সোজা। শান্তভাবে তিনি বললেন, "টাকা রোজগারের জন্যে আমি এই গাছগুলি পুঁতিনি। যে যত পার খাও, আর দুটি করে আম প্রত্যেক সাধু যখন ভিক্ষা করতে আসবেন তাদের দাও।" তিনি চাইতেন মানুষ এই ফল খেয়ে আনন্দ পাক।

কল্যাণানন্দ প্রত্যেক বছর স্থানীয় সাধুদের নিমন্ত্রণ করতেন আমের

উৎসবে, সেই সঙ্গে পায়েস। শেষপর্যন্ত এমন হয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেক বছর আমের সময় সাধুরা খোঁজ নিতেন কবে মহারাজের নেমন্তন্ন আসবে।

মানুষকে আনন্দ দাও, যারা ভুল করেছে দোষত্রুটি মুক্ত করে তাদের নতুনভাবে গড়ে নাও, গুরুর অনুপ্রেরণায় এই ছিল কল্যাণানন্দের সাধ। সেবার সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারি স্বামী মাধবানন্দ কনখলে এসেছেন, (পরে তিনি সঙ্ঘসভাপতি হয়েছিলেন) মাধবানন্দ সেবাশ্রমে এক ব্রহ্মচারীকে দেখে কল্যাণানন্দকে বললেন, "এই ছেলেটিকে চেনেন?"

"হ্যাঁ, জানি," মহারাজের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মাধবানন্দজি খবরাখবর রাখতেন। মঠ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে তিনি বললেন, "তিনটে সেন্টার থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কোনো কম্মের নয়। ওকে এখানে রাখবেন না।"

কল্যাণানন্দ মোটেই বিচলিত না হয়ে বললেন, "ছেলেটি আমাকে সব কথা বলেছে। সব অন্যায় স্বীকার করতে করতে সে কেঁদে ফেলেছে এবং আমাকে কথা দিয়েছে, এখানে আমি ভালো হবার চেষ্টা করব, আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব। আমি খুব সাবধানে থাকব।"

এরপর গলাটা একটু উঁচু করে মঠের ভাবী সভাপতিকে বিবেকানন্দশিষ্য বললেন, "সোনা থেকে সোনা করবার জন্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তধামে আসেননি। তিনি নিম্নস্তরের ধাতুকে সোনা করে দিতে পারতেন। আমরা যদি এই ধরনের ছেলেকে পাল্টে দিতে পারি তা হলে সেটাই আমাদের সেরা কাজ হবে। তুমি কি শুধু ভাল ছেলে চাইছ? তারা তো ভালো হয়ে আছে!"

পরবর্তী সময়ে এই ছেলেটির মধ্যে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছিল। এখানে আসবার আগে ভীষণ মেজাজ ছিল, রাগে অন্ধ হয়ে জিনিসপত্তর একবার নয় তিনবার ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কনখলে সে সত্যিই নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করল।

•

স্বামী কল্যাণানন্দের মর্মস্পর্শী মহাসমাধির বর্ণনা তাঁর অনুগতের চোখ দিয়ে (২০শে অক্টোবর ১৯৩৭) আমরা এই নিবন্ধের শেষ অংশে দেখব।

কিন্তু তার আগে আজব স্বামীজির আরও একজন আজব অনুরাগী চারুচন্দ্র দাস (পরে স্বামী শুভানন্দ) এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় বারাণসী সেবাশ্রমের কিছু কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

অন্য অনেক তথ্যসূত্রের সঙ্গে এই পর্বের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় স্বামী নরোত্তমানন্দের 'সেবা' বইতে। বইটির বাংলা অনুবাদ হাতের গোড়ায় ছিল না, ফলে নির্ভর করেছি ইংরিজিতে প্রকাশিত একই নামের বইয়ের ওপরে।

প্রাক সন্ন্যাসজীবনে বিবেকানন্দশিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ একবার কলকাতায় চারুচন্দ্রের পাঁচু খানসামা লেনের বাড়িতে এসেছিলেন, সঙ্গী ছিলেন জনৈক ক্ষিরোদবাবু। বারাণসীতে আবার দেখা হয়ে গেল শুদ্ধানন্দর সঙ্গে —এইখানে শুদ্ধানন্দ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিছুদিন সেবাযত্নের সুযোগ পেয়ে যান চারুচন্দ্র। শুদ্ধানন্দ তাঁকে সদ্যপ্রকাশিত উদ্বোধন পত্রিকার কথা বলেন এবং এই পত্রিকার প্রচারের অনুরোধ জানান। এই প্রচারে বেরিয়েই হরিনাথ ও কেদারনাথ মৌলিক (পরে স্বামী অচলানন্দের) সঙ্গে চারুচন্দ্রের জানাশোনা হয়। একসময়ে স্বামী কল্যাণানন্দ বারাণসীতে এসে কেদারনাথের অতিথি হন। এঁদের আলোচনার প্রধান বিষয় স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ের যে সাধনা রামকৃষ্ণ সঙেঘ শুরু হয়েছে তা এঁদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল।

কেদারনাথ মৌলিক এই সময় সংসার ত্যাগ করতে ব্যাকুল। চারুচন্দ্র দাস পরামর্শ দিলেন ঠাকুরের শিষ্য নিরঞ্জনানন্দ এখন হরিদ্বারে রয়েছেন, ওখানে যাও। কেদারনাথ বললেন দাদু এবং বাবা বুঝতে পারলে আমাকে ছাড়বেন না। তখন মতলব হলো, কেদারনাথ কতকগুলো পোস্টকার্ড লিখে দিয়ে যাবেন, সেগুলো মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে ডাকে দেওয়া হবে, যাতে মনে হয় কাজকর্মের সন্ধানে কেদারনাথ কলকাতায় রয়েছেন।

বিবেকানন্দ-অনুরাগী যে কয়েকজন বন্ধু মিলে বারাণসীতে সেবা কার্য আরম্ভ করেছিলেন তাঁদের একজনের নাম যামিনীরঞ্জন মজুমদার। উদ্বোধন পত্রিকায় স্বামীজির কবিতা 'সখার প্রতি' পড়েই তাঁরা উদ্বুদ্ধ।

যামিনীরঞ্জন প্রত্যুষে বাঙালীটোলার মধ্য দিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন,

হঠাৎ চমকে শুনলেন—কার যেন অস্ফুট কাতরধ্বনি! অন্য সময় হলে হয়ত পুণ্যার্থীদের ধর্মধ্বনি ঐ কাতর শব্দটুকুকে আচ্ছন্ন রাখত—কিন্তু গত রাত্রে যে যামিনীরঞ্জন নবধর্ম-মন্ত্র লাভ করেছেন! সুতরাং তিনি চোখ চেয়ে দেখলেন—পথের পাশে আবর্জনার মধ্যে পড়ে রয়েছে মুমূর্ষু এক বৃদ্ধা, মলমূত্রে সর্বাঙ্গ পূর্ণ।

স্বামীজির কবিতা পাঠ করে উদ্বুদ্ধ যামিনীরঞ্জন বৃদ্ধার গা পরিষ্কার করে, নিজের উত্তরীয় দিয়ে তাঁকে ঢেকে, পথের ধারে কোলে তুলে নিয়ে বসলেন, এবং তাঁর মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে ভাবতে লাগলেন—এখনি যদি এঁকে আশ্রয়, ঔষধ ও পথ্য দেওয়া না যায় তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু যামিনীরঞ্জন নিজে ভিক্ষান্নজীবী, এখন কপর্দকশূন্য, কী করবেন?

অগত্যা বৃদ্ধাকে এক বাড়ির রকে শুইয়ে ভিক্ষার সন্ধানে বেরুলেন। এক সহৃদয় ব্যক্তির অনুগ্রহে চার আনা পয়সা পেলেন তা দিয়ে দুধ কিনে এনে বৃদ্ধাকে খাওয়ালেন, তারপর বৃদ্ধা কিছু সুস্থবোধ করলে পুঁটিয়ারাণীর ছত্রে গেলেন বৃদ্ধার জন্য অন্নভিক্ষা করতে। এই ছত্রের অন্নেই যামিনীরঞ্জনের উদরপূর্তি হত—সেই বরাদ্দ অন্নই তিনি চাইলেন, নিয়ে যাবেন বলে। ছত্রের নিয়ম— সেখানে বসে খেতে হবে। বহু বাক্যব্যয়ের পরে যামিনীরঞ্জন বরাদ্দ অন্ন আদায় করে এনে বৃদ্ধাকে খাওয়ালেন, তাতে কিছু সুস্থ হয়ে বৃদ্ধা যে-কাহিনি বললেন তা অতি ভয়াবহ, মানবিক নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

বৃদ্ধা মাসাধিকাল আগে যশোহরের পল্লী-অঞ্চল থেকে কাশীবাস করতে এসেছেন ১০৮ টাকা সম্বল করে। এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর কঠিন রক্ত-আমাশয়ে পড়েন! বিনা চিকিৎসা ও বিনা পথ্যে যখন তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা তখন ব্রাহ্মণ তাঁকে গঙ্গাতীরে ফেলে আসে। বৃদ্ধার জ্ঞান ছিল কিন্তু কথা বলার শক্তি ছিল না। ব্রাহ্মণটি প্রথমত, বৃদ্ধার অবশিষ্ট টাকাগুলি আত্মসাতের মতলবে ছিল। দ্বিতীয়ত, বুড়ি মরলে হয়ত পুলিশী হাঙ্গামা হতে পারে—তার হাঙ্গামাতে সে পড়তে চায়নি। বৃদ্ধা চারদিন গঙ্গাতীরে পড়েছিলেন, কেউ তাঁকে সাহায্য করেনি, বা

ক্ষতিও করেনি। তারপরে নিরুপায়ে তিনি নিজেই কোনোক্রমে পথের মাটি-পাথর খাম্‌চে-খাম্‌চে হামাগুড়ি দিয়ে পূর্বোক্ত স্থানে এসে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান ফিরলে যেটুকু গোঙাতে পেরেছিলেন, তারই শব্দ যামিনীরঞ্জনকে আকৃষ্ট করেছিল।

পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরকম : যামিনীরঞ্জন ছুটলেন চারুচন্দ্রের কাছে; দু'বন্ধু গেলেন হরিদ্বার থেকে সদ্য-প্রত্যাগত কেদারনাথের কাছে। এঁরা ও অন্য বন্ধুরা মিলে বৃদ্ধার শুশ্রূষার ও আশ্রয়ের সাময়িক ব্যবস্থা করলেন। পরে চাঁদা তুলে বৃদ্ধাকে ভেলুপুর হাসপাতালে রাখলেন। এই বৃদ্ধার নামই নৃত্যকালী দাসী।

আর থামা সম্ভব ছিল না। এই বন্ধুগোষ্ঠী "বারাণসী-দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতি" গঠন করে ফেললেন। সমিতির জুলাই ১৯০১ থেকে জুন ১৯০২ সময়ের রিপোর্ট সমাজতাত্ত্বিকদের জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আছে। এই রিপোর্ট স্পষ্ট দেখিয়ে দেয়, কোন্ সামাজিক ভেদবুদ্ধির মধ্যে বিবেকানন্দের ভাবানুপ্রাণিত যুবকেরা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে সেবা করে গিয়েছিলেন।

রিপোর্টে সমিতির 'সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' এইরকম : "পরম পবিত্র অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র হিন্দুমাত্রেরই সর্বপ্রধান তীর্থ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এ-কারণে সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সমাগত মুমুক্ষু সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ প্রভৃতি নানাবিধ নরনারী, যাঁহাদের অন্নবস্ত্রের কোনোরূপ সংস্থান নাই তাঁহারাও অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের উপর নির্ভর করতঃ কাশীবাস করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জন করিতেছেন।

"এই অসহায়, ভরণপোষণ সংস্থানহীন ব্যক্তিগণের এবং গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ধর্মনিরত সাধু-সন্ন্যাসিগণের সাহায্যার্থে অনেক মহোদয় অন্নসত্রাদি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেইসকল অন্নসত্রাদির অন্নদান কেবল ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়—এবং ব্রাহ্মণবর্ণেরও যাঁহারা স্বয়ং দানস্থলে উপস্থিত হইয়া দানগ্রহণে সমর্থ হইবেন তাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন, উপস্থিত হইতে অসমর্থ ব্যক্তিবর্গ পাইবেন না, ইত্যাদি অনুদার নিয়ম থাকায়—প্রকৃত অভাবগ্রস্ত দুর্বল অসমর্থ ব্যক্তিগণের অতিশয় কষ্ট

হয়। বিশেষতঃ এইসকল ব্যক্তি পীড়িত হইলে ঔষধ-পত্রাদি ও সেবাশুশ্রূষাভাবে কেহ-বা অসময়ে কালকবলে পতিত হন, আর অনেকেই সম্পূর্ণ আশ্রয়শূন্য অবস্থায় রাস্তায় ও গঙ্গাতীরে পতিত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

"এই অবিমুক্ত বারাণসী বৈদিক ধর্মের কেন্দ্রস্থল। এই স্থানেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য জীব ব্রহ্মের অভেদত্ব সর্বপ্রথমে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আর আজ এই স্থলে লক্ষ-লক্ষ নরনারী প্রত্যহ অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের অর্চনা করিয়াও বিশ্বনাথের সাক্ষাৎ মূর্তিস্বরূপ জীবগণ যে অনাথা-অন্যরা, অন্ধ, পঙ্গু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা রূপ ধারণপূর্বক রাস্তায় পতিত আছে, ইহা বুঝিতেছেন না। কেহই তাঁহাদের সেবা করিতেছেন না।

"এই সকল অবস্থা দেখিয়া, রাস্তায় নিপতিত ব্যক্তিগণের ক্লেশ দূরীকরণপূর্বক তাঁহাদের সেবাদ্বারা মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ বিবেকানন্দ-স্বামীর কয়েকজন ব্রহ্মচারী-শিষ্য সেবাকার্য আরম্ভ করিয়া এই 'দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার সমিতি' গঠন করেন। পরে ১৯০০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় বাঙালীটোলা স্কুলভবনে এক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সমিতির কার্যাদি উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যরূপে নির্বাচিত হন।"

'আশ্রমের উদ্দেশ্য' সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয় :

"যাঁহারা অসহায় পীড়িত অবস্থায় রাস্তায় পতিত থাকেন, সমিতি তাঁহাদিগকে রাস্তা হইতে উঠাইয়া আশ্রমবাটীতে আনিয়া সেবাশুশ্রূষা করেন ও ঔষধপথ্যাদি দান করেন।

"ঐ রাস্তায় পতিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা হাসপাতালে যাইতে ইচ্ছুক এবং হাসপাতালের কর্তৃপক্ষগণ যাঁহাদিগকে রাখেন, সমিতি তাঁহাদিগকে হাসপাতালে রাখিয়া আশ্রমবাটী হইতে পথ্যাদি পৌঁছিয়া দেন ও সেবা করেন এবং আবশ্যক হইলে হাসপাতালেও খোরাকী জমা দিয়া থাকেন।

"যাঁহারা অন্ধ বা অথর্ব বা বৃদ্ধ বলিয়া ভিক্ষাদি করিতে অসমর্থ, সমিতি

তাঁহাদের বাসস্থলে যাইয়া আবশ্যকীয় অন্ন-বস্ত্র, বাসাভাড়া ইত্যাদি দিয়া থাকেন।

"যাঁহারা কায়িক পরিশ্রমে বা আত্মীয়স্বজনের সামান্য সাহায্যে কোনোরূপে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করেন, তাঁহারা পীড়িত হইলে চিকিৎসিত হইবার উপায় থাকে না বা সেবাশুশ্রূষা করিবারও কেহ থাকে না। সমিতি এইসকল ব্যক্তিগণের বাটীতে ডাক্তার কবিরাজ লইয়া গিয়া ঔষধ-পত্রাদির ব্যবস্থা করেন এবং সমিতির সেবকগণ বাটীতে যাইয়া সেবা করেন।

"যে-সকল ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি অদৃষ্টবশে অতি নিঃস্ব হইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত কিন্তু সাধারণ দান-স্থলে উপস্থিত হইবেন না বা ভিক্ষাপ্রার্থনা করেন না, সমিতি বিশেষরূপে তাঁহাদের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া থাকেন।

"অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যে-কোনো জাতি হউন বা যে-কোনো ধর্মাবলম্বী হউন, তিনি স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন, সমিতি তাঁহাদের সেবা করেন।"

রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায়, ৮ জন সেবক বা কর্মী কাজ চালাচ্ছেন। "সেবকগণ সমিতি-বাটীস্থ রোগীদের সেবাশুশ্রূষা, এমন-কি মলমূত্রাদি পর্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া থাকেন। সমিতির প্রথম অবস্থায় সাত মাস কাল পর্যন্ত সেবকগণ মেথরের সাহায্য না লইয়া কার্যনির্বাহ করেন। পরে আর্থার রিচার্ডসন সাহেব-মহোদয় দয়াপ্রকাশ করিয়া জনৈক মেথর নিযুক্ত করিয়া দিয়া সমিতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

ঐকালে সেবাপ্রাপ্ত কয়েকজন রোগীর বিবরণ আমরা উপস্থিত করছি, কাশীর দুঃস্থ মানুষদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য :

"পঞ্চানন হাজরা নামক ৩৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান গলিতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হইয়া রোগযন্ত্রণা ও দরিদ্রতা-নিবন্ধন স্বদেশ বাঁকুড়া জেলা হইতে বারাণসীতে আসিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সংক্রামক রোগগ্রস্ত বলিয়া ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে জলবিন্দু পর্যন্ত দান করেন নাই। তিনি চারদিন অনশনে নারদঘাটে

পড়িয়া থাকেন। তাঁহার আর্তনাদে জনৈক ভদ্রলোক করুণার্দ্র হইয়া সমিতির সেবকদিগকে সংবাদ দেন। সেবক-সভ্যরা ভেলুপুরের অ্যাসিট্যান্ট সার্জন ডাক্তার মন্মথনাথ বসু মহোদয়কে লইয়া নারদঘাটে উপস্থিত হইয়া রোগীর ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং দুইবেলা সমিতি হইতে অন্নপথ্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সেবা করাইয়া আসিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত রোগীর কলেরা হয়। তখন যে কী শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই অবস্থায়ও জনৈক সেবক তাঁহার সেবা ত্যাগ করেন নাই। উক্ত কলেরা হইতে আরোগ্যলাভ হইবার পরও তাঁহাকে অন্নাদি দেওয়া হইত।"

সরযূ তেওয়ারী নামে ১৪ বছরের একটি বালকের বাবা-মা থাকা সত্ত্বেও তাদের এমন দারিদ্র্য যে সরযূ দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অন্ধকূপের মতো একটা জায়গায় পড়েছিল—চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। রাজলক্ষ্মী দেবী নিঃস্ব মহিলা, ডবল নিউমোনিয়া হলেও বিনা চিকিৎসায় পড়েছিলেন। গিরিবালা দেবী 'আমরক্ত, প্রদর প্রভৃতি জটিল রোগগ্রস্ত' হওয়ায় বাড়িওয়ালা তাঁকে রাস্তায় বের করে দেন। আশি বছরের বৃদ্ধা মুন্না বাঈ 'অতি সম্ভ্রান্ত ধনী মহারাষ্ট্র-পরিবারের' মানুষ, 'অদৃষ্টচক্রে পথের ভিখারিণী।' বাঁকুড়ার গোপীনাথ দত্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কাশীতে নিরুপায়ে কোনোক্রমে এসেছেন ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করবেন এই ইচ্ছায়, কিন্তু শূদ্র বলে সত্রে ভিক্ষা মেলেনি, আত্মহত্যা করতে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে উদ্ধার করেন।

১৯০২ ফেব্রুয়ারিতে স্বামীজি যখন কাশী আসেন, তখন স্বভাবতই তাঁর কাছে ভিড় করে এসেছিলেন তাঁরই আদর্শে জাগ্রত যুবকের দল। চারুচন্দ্রসহ তাঁদের অনেককে স্বামীজি দীক্ষা দেন, পূর্ণ মনুষ্যত্বের যথার্থ রূপ সম্বন্ধে তাঁদের মনে সচেতনতা এনে দেন, এবং—'দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতির' কাজে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেও কর্মীদের আদর্শের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নামের যে-ভাববিরোধ ঘটছে, তাও দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন :

"দরিদ্রের দুঃখ প্রতিকার করবার তুমি কে? সেবাতেই শুধু তোমাদের

অধিকার।...যখনই কর্মীর মনে কর্তৃত্বাভিমান আসে, অধঃপতনের কারণ সেই মুহূর্তে ঘটে। কর্তৃত্ব ও ভোগস্পৃহা কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করে, সত্যানুরাগে, শিবোঽহম্ বোধে জীবসেবারূপ কর্মের অনুষ্ঠান করো। এইরূপ কৌশলে কর্ম করলে শুধু যে ব্যক্তিগত জীবন ধন্য হয় তাই নয়, সমাজ ও দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে, এবং জীবজগতের সঙ্গে ভগবানের একত্ব অনুভব করে তোমরা কৃতার্থ হয়ে যাবে। তোমরা কর্মের মধ্যে দয়াকে স্থান দিয়েছে—কিন্তু কখনো বাক্যে, কার্যে বা মনে মানুষ যেন দয়া করবার স্পর্ধা না রাখে।"

স্বামীজীর নির্দেশে 'দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতির' নূতন নাম হল সেবাশ্রম।

সমিতি গঠনের কিছুদিন পরেই একটি ষোলো বছরের টাইফয়েড রোগীর দায়িত্ব ঘাড়ে চাপল, তাকে কোথায় রাখা যায়? প্রথমে একটা ভাড়াকরা ঘরের সন্ধান পাওয়া গেল, কিন্তু সেটায় নানা অসুবিধা থাকায় শেষপর্যন্ত কেদারনাথের বাড়িতে তাকে আনা হলো। বন্ধুদের দিবারাত্র সেবায় এবং স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দয়ায় গিরীন্দ্রনাথ সুস্থ হয়ে নিজের দেশ ফরিদপুরে ফিরে গেলেন। ইনিই কাশী সেবাশ্রমের প্রথম ইনডোর রোগী!

পরে মাসিক পাঁচটাকা ভাড়ায় জঙ্গমবাড়ীতে একটা ছোট্ট বাড়ি পাওয়া গেল। এইসময়কার তিনজন সারাসময়ের কর্মী কেদারনাথ, যামিনীরঞ্জন ও চারুচন্দ্র।

সেবাকার্যের নাম ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে। সেবাব্রতী যুবকগণ কেমন করে তাঁর ভাব গ্রহণ করে আশ্চর্য সব কাজ করছেন, নানা সূত্র থেকে এ সংবাদ স্বামী বিবেকানন্দের কানে পৌঁছয়! এবিষয়ে 'স্বামীজির পদপ্রান্তে' গ্রন্থ (স্বামী অব্জজানন্দ) থেকে কিছু উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"স্বামীজী তখন বেলুড় মঠে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর সেবাব্রতী যুবকগণ তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া কেমন আশ্চর্য সব কার্য সেখানে করিতেছেন, এ-সংবাদ নানা সূত্রে তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। কাশী হইতে কেহ মঠে গেলে, তিনি খুব আগ্রহ সহকারে এই নবীন অনুরাগীদের

খোঁজখবর লইতেন, তাঁহাদের কার্যেরও প্রশংসা করিতেন। এই তরুণদলের অন্যতম যামিনী মজুমদার একদা স্বামীজীকে দর্শন করিতে মঠে গিয়াছিলেন। যামিনীর সহিত কথা বলিয়া, তাঁহার আদর্শানুরাগ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্র দীক্ষাপ্রদানও করিয়াছিলেন। যামিনীর মুখে স্বামীজী কাশীর অনাথাশ্রম ও কর্মী ছেলেদের সম্পর্কে সবিশেষ সব শুনিয়া খুব আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এমন আশ্রম ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিত।"

স্বামীজীর কৃপাদৃষ্টি এই যুবকদের উপর এতখানি বর্ষিত হয়েছিল যে, মঠ থেকে একবার নির্মলানন্দকে প্রেরণ করে কাশীর অনাথাশ্রম সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত সব সংবাদ নিয়েছিলেন। আর একবার তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "ছোঁড়ারা কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর ছেলেরা আমার spirit-এ কিছু কাজ করছে।" কাশীতে যুবকগণ এতদিন "যাঁকে শুধু কল্পনার বিগ্রহ করে রেখেছিলেন, এখন যেন তাঁর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তাঁহাদের সকলের হৃদয়কে আলোড়িত করে তুলল। "যাঁরে না দেখে নাম শুনেই কানে, মন গিয়ে তাঁর লিপ্ত হল।" না-দেখা সেই আশ্চর্য বৈদ্যুতিক আকর্ষণ কেদারনাথকেও এবার বেলুড়ের দিকে নিশ্চিত টানল—তিনি অনাথাশ্রম থেকে দু' সপ্তাহের অবকাশ নিয়ে বেলুড়ে চলে এলেন। তখন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ। শারদীয়া মহাপূজার ষষ্ঠীর দিন কেদারনাথ মঠে এসে পৌঁছলেন।

কেদারনাথ মঠে এলে, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মঠবাড়ীর দোতলায় স্বামীজি নিজের ঘরেই তখন ছিলেন— কেদারনাথ তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। মুণ্ডিতশির, কেবলমাত্র কৌপীনধারী, অনন্যভূষণ, জ্যোতির্ময় সদাশিবের মতো স্বামীজির সেদিনের দিব্যমূর্তি কেদারনাথের মানসপটে নিত্যকালের জন্য অঙ্কিত হয়েছিল।

কেদারনাথ পরম আনন্দে স্বামীজির পবিত্র সান্নিধ্যে মঠবাস করতে লাগলেন। স্বামীজিও তাঁর ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সাধননিষ্ঠা দেখে তাঁকে একটু বিশেষ স্নেহই দেখিয়েছিলেন। আদর করে তাঁকে তিনি 'কেদার বাবা' বলে

ডাকতেন। কাশী থেকে মাত্র দুই সপ্তাহের কথা বলে কেদারবাবা মঠে এসেছিলেন, কিন্তু স্বামীজির ভালবাসার টানে দুই সপ্তাহ কবে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কিছুই ঠিকঠিকানা ছিল না—স্বামীজিও অনুরক্ত ভাবী শিষ্যকে নিজের কাছে আরও কিছুদিন থেকে যেতে আদেশ করেছিলেন। কেদারবাবার এই যাত্রায় প্রায় নয় মাস মঠবাসী হয়েছিলেন। স্বামীজির ব্যক্তিগত সেবাধিকারলাভও তাঁর এই কালের স্মরণীয় ঘটনা। পরবর্তী জীবনে অতীতের এই দিনগুলি স্মরণ করে কেদারবাবা রোমাঞ্চিত হতেন। স্বামীজির কথা বলতে বলতে তাঁকে আত্মহারা হতে দেখা যেত। তাঁর স্বামীজির স্মৃতি-প্রসঙ্গ থেকে কিছু উদ্ধৃতি :

"পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজের আমাদের প্রতি যে কী গভীর ভালবাসা ছিল—তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নয়।"

মঠে থাকাকালে কেদারবাবা একবার সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজির কাছে তাই দুই চার দিন আসতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর প্রতি স্বামীজির কী অহেতুক স্নেহ ছিল! অন্য সেবকের হাত দিয়ে কেদারবাবার জন্য বেদানা বা কোন ফল পথ্য নিজেই পাঠিয়ে দিতেন। হয়তো আহার করছিলেন, এমন সময়ে মনে পড়ে গিয়েছে, অমনিই সেই খাবার কোন সেবকের হাতে পাঠিয়ে, কেদারবাবাকে দিয়ে আসতে বললেন। স্বামীজির এই শিষ্যবৎসলতার কথা স্মরণ করে কেদারবাবা পরে একদা বলেছিলেন, "একবার কানাই মহারাজ (নির্ভয়ানন্দ) তাঁর সেবা করতে করতে তাঁর বুকে মাথা রাখে ঘুমিয়ে পড়েন। পাছে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে স্বামীজি অনেকক্ষণ পর্যন্ত একভাবে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকেন। পরে কানাই মহারাজ আপনা থেকে নিদ্রোত্থিত হলে, তবে তিনি উঠলেন।"

স্বামীজি একদিন কেদারবাবাকে বলেছিলেন, "বাবা তুই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারিস? তুই যা চাস্, তোকে আমি তাই দেব।"

স্বামীজি ছিলেন অহেতুক কৃপাসিন্ধু। একদিন মঠবাড়ির একতলার বারান্দায় তিনি বেঞ্চের উপর বসে আছেন—কাছেই স্বামী শিবানন্দজিও ছিলেন। কেদারবাবা সামনে যেতেই, স্বামীজি সহসা বলে উঠলেন, "যা তোর কিছুই করতে হবে না। তোর সব আপনি আপনি হয়ে যাবে।"

কেদারবাবা তাঁর মঠবাসের স্মৃতিকথা-প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—"আমি স্বামীজির খুব কাছাকাছি থাকতুম—কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতুম না। কতলোক সব আসছেন—নিবেদিতা, ওলি বুল, ওকাকুরা প্রভৃতি—কত সব কথা হচ্ছে। আমি মুখ্যু লোক, অত বুঝতুম না। স্বামীজি যখন তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি বা কখনও বকাবকি করছেন, আমি তখন হাতের কাজ সেরে রাখতুম। হয়তো বা তিনি দুই-একবার নিজেই বলতেন, 'কেদার বাবা, তামাক নিয়ে আয়', নয়তো সবই তাঁর ইঙ্গিতে বুঝে নিতুম। আহা, মাকে দেখলুম, আবার স্বামীজিকেও দেখলুম! সবাই যাকে পোঁছে না, তাঁরা তাকেই বেশি ভালবাসেন। তার খবরই বেশি নিতেন, যত্ন নিতেন। দেখ, আমার কি গুণ আছে? আমার দ্বারা তাঁদের কোন কাজই হবার নয়। অথচ তাঁদের এত অহৈতুকী স্নেহ-ভালবাসা কেন জানি না! আমাদের মধ্যে কী যে দেখেছেন তাঁরা তাও বুঝি না।...স্বামীজির প্রতি এমনই একটি আকর্ষণ অনুভব করি যে সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাঁর এতটুকু সেবা করবার জন্য মন তখন উদ্গ্রীব হয়ে থাকত। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা লাফিয়ে লাফিয়ে করতুম।...একদিন—বাবু আমাকে খুব উৎসাহিত করছেন তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর-তীর্থে যাবার জন্য। আমি তো মহারাজকে না বলে কিছুই করি না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বললেন, 'আরে বলছ কি! স্বামীজি রয়েছেন মঠে। তাঁকে ছেড়ে কোথায় যাবে? দক্ষিণেশ্বর চিরকালই থাকবে—ওসব পরে ঢের হবে, এখন থাক।' সত্যিই মহারাজ আমার চঞ্চল মতিকে স্থির রেখে আজ আমায় স্বামীজির কৃপালাভে ধন্য করেছেন। তা না হলে সন্ন্যাসও হত না, আর কোথায় গিয়ে কোন ভাগাড়ে পচে মরতুম কে জানে! তখন সকাল থেকে রাত দশটা অবধি স্বামীজির কাছেই থাকতুম। দিনে বিশ্রাম করতুম না—স্নান করতে, খেতে যা একটু সময় নষ্ট হত।"

কেদারবাবা বলতেন, "ধ্যানধারণা সম্বন্ধে স্বামীজি খুব স্ট্রিক্ট ছিলেন।...প্রত্যেককেই ভোর চার ঘটিকায় উঠে ঠাকুরঘরে এসে ধ্যান করতে হত। তিনি নিজেও এসে বসতেন।...কেউ না আসলে তিনি প্রথম প্রথম বিদ্রূপচ্ছলে বলতেন,—'ওহে সন্ন্যাসিবাবুরা, আর কতক্ষণ নিদ্রা যাবে?'

স্বামীজির অগ্নিময় সংস্পর্শে বাস করতে করতে বৈরাগ্যের উত্তপ্ত প্রেরণা কেদারবাবাকে বেশিদিন আর নীরব থাকতে দেয় নাই। স্বামীজিকে একদিন একান্তে পেয়ে, তাঁরই পদপ্রান্তে আশ্রয়ভিক্ষা করে সন্ন্যাসের জন্য তিনি মুখ ফুটে প্রার্থনা জানালেন। স্বামীজি বললেন, "দশবাড়ি ভিক্ষা করে খেতে পারবি?" কোদারবাবা যুক্ত করে উত্তর দিলেন, "আপনার আশীর্বাদ হলেই পারব।" উত্তর শুনে প্রসন্ন হয়ে স্বামীজি বলেছিলেন, "আচ্ছা এখানেই পড়ে থাক্—সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অবশেষে পরবর্তী বৈশাখ মাসের বুদ্ধপূর্ণিমাতে (মে, ১৯০২) স্বামীজি কেদারবাবার মনস্কাম পূর্ণ করেন। স্বামী বোধানন্দকে স্বামীজি আদেশ করেছিলেন, সন্ন্যাসানুষ্ঠানের আবশ্যকীয় সব ব্যবস্থাদি করতে। নির্দিষ্ট সেই রাত্রে আনন্দে ও উদ্বেগে কেদারবাবার চোখে ঘুম নেই—রাত্রি ২-২০ মিনিটেই ভোর হয়ে গেছে মনে করে, নিশ্চয়ানন্দ স্বামীকে ঘণ্টা বাজাতে বলেছিলেন। নিশ্চয়ানন্দও তাঁর কথায় ঘণ্টা দিলে, বোধানন্দ উঠে ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় স্বামীজি খোঁজ নিলেন, "এত রাত্রে ঠাকুরঘরে কে যায় রে?" বোধানন্দ যখন ঘণ্টার কথা বললেন, তখন স্বামীজি সস্নেহে বলেছিলেন, "ছোঁড়াটা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে।"

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি স্বয়ং ঠাকুরঘরে গিয়ে যথানির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করে কেদারবাবাকে সন্ন্যাসদীক্ষা প্রদান করলেন। শিষ্য বিরজা-হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দেবার পরে, ব্রহ্মবিদ্ আচার্য তাঁকে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অপণ করলেন। অচলা ভক্তি বিশ্বাসের আশীর্বাদ প্রদান করে শ্রীগুরু তাঁর নাম দিলেন অচলানন্দ। অচলানন্দ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠতেই, স্বামীজি বললেন, "আজ হতে তোর সমস্ত সাংসারিক কর্ম নাশ হয়ে গেল।" স্বামী অচলানন্দই স্বামীজির শেষ সন্ন্যাসি-শিষ্য— অতঃপর তিনি আর কাকেও সন্ন্যাস-দীক্ষা দেননি।

এরপরেই ১৯০২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামীজি সদলবলে বারাণসীতে হাজির হলেন। পরবর্তী বর্ণনার জন্য আমরা স্বামী অজ্জজানন্দর কাছে নির্ভরশীল।

বারাণসীতে স্বামীজি একদিন চারুচন্দ্রকে বলেছিলেন, "সেবাধর্ম

সহায়ে সর্বভূতের সহিত ঈশ্বরের ঐক্য সহজে অনুভবগম্য। তোমরা কি তোমাদের কর্মজীবনে দয়াকে উচ্চ স্থান নির্দেশ করেছ। মনে রেখো, দয়া প্রদর্শনের অধিকার তোমাদের নেই। যিনি সর্বভূতের ঈশ্বর তিনিই দয়া প্রদর্শনের অধিকারী।

"যে দয়া করতে চায়, সে নিশ্চয়ই গর্বিত ও অহঙ্কৃত। কারণ সে অপরকে নিজের চেয়ে নীচ ও হীন মনে করে। দয়া নয়—সেবা-ই তোমাদের জীবনের নীতি হোক। দেবমূর্তিজ্ঞানে জীবসেবা দ্বারা কর্মকে ধর্মে পরিণত কর। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ জীবের দুঃখ দূর করতে পারে না।

স্বামী শিবানন্দ একদিন চারুচন্দ্রের ও তাঁর দু'একটি বন্ধুর জন্য স্বামীজির কাছে প্রার্থনা জানালেন যাতে তিনি কৃপা করে যুবকগণকে দীক্ষা প্রদান করেন। স্বামীজিও প্রসন্ন হয়ে চারুচন্দ্রকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেছিলেন।

সেই সময়ে আরও একটি ঘটনা, চারুচন্দ্রের অনুরোধে সেবাশ্রমের প্রচারের জন্য স্বামীজি স্বয়ং একটি বিজ্ঞাপনপত্র লিখে দিলেন। এই আবেদনপত্রটির মূলভাষা ইংরিজি এবং এখনও সেবাশ্রমের বার্ষিক বিবরণীর শুরুতে স্বামী বিবেকানন্দর স্বাক্ষরসহ ছাপা হয়।

এবার ভক্ত চারুচন্দ্রের শেষ পর্বের কথা। ১৯২৬ এপ্রিল মাসে স্বামী সারদানন্দ নিমন্ত্রণ পাঠালেন শুভানন্দাকে বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কনভেনশনে যোগ দিতে এবং তারপর স্বাস্থ্যোদ্ধারে পুরী যেতে। শেষ মুহূর্তে শুভানন্দ বারাণসী ছেড়ে বেলুড় রওনা হতে রাজি হলেন না। ছোটছেলের মতো বললেন, "আমার এই দেহ আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না, আমি বাকি ক'টা দিন মায়ের বুকের কাছে থেকে যেতে চাই।"

স্বামী সারদানন্দ সব খবর পেয়ে বুঝলেন শুভানন্দর শরীর সত্যিই ভেঙে পড়েছে, তাঁকে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠানো প্রয়োজন। তখন এক চিঠিতে সারদানন্দ তাঁকে কনখলে স্বাস্থ্যোদ্ধারে যাবার পরামর্শ দিলেন। একই সঙ্গে তিনি কল্যাণানন্দকে লিখলেন, শুভানন্দের যথাযোগ্য

অভ্যর্থনার জন্য।

চিঠিটি পেয়ে শুভানন্দ মাথায় ঠেকালেন। বললেন, "ভেবেছিলাম এই নশ্বর দেহটা গঙ্গাতেই বিসর্জন দেওয়া হবে। কিন্তু বিশ্বনাথ অন্যরকম ভেবে বসে আছেন। তাই হোক, দেহটা কনখলেই চলুক।'

গাড়িতে উঠে শুভানন্দ ডাকলেন প্রিয় স্বামী অমরানন্দকে। বললেন, "আমি যাচ্ছি, বোধ হয় আর ফিরবো না। পোস্টাপিস সেভিংস ব্যাংকে আমার কিছু টাকা আছে, তার ব্যবস্থা কোরো। যখন শুনবে এই দেহটা আর নেই তখন এটাকার একটা অংশ মা সারদাদেবীর পূজায় খরচ করবে এবং সাধুদের জন্য ভাণ্ডারায়। বাকি সবটা যাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবায়।"

কনখলে সেদিন ছিল বাংলা বছরের প্রথম দিন। খুব ভোরবেলায় সহকারী চৈতন্যানন্দকে নিয়ে তিনি অজানা উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন।

শুভানন্দ হেঁটে চলেছেন হরিদ্বারের পথ ধরে। হঠাৎ তিনি গতিপরিবর্তন করে গঙ্গার স্নানের ঘাটের দিকে চলতে লাগলেন। ঘাটের সিঁড়িতে তিনি কিছুক্ষণ বসলেন। তারপর গায়ের চাদর ও পায়ের চটি খুলে ফেলে স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়লেন হাত জোড় করে। একবার তিনি কোমর পর্যন্ত জলে চলে গেলেন, আবার একটু উপরে উঠলেন। এইরকম কয়েকবার করলেন তিনি।

চৈতন্যানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এখানে স্নান করবেন?"

স্বামী শুভানন্দ উত্তর দিলেন, "না।"

চৈতন্যানন্দ জানেন প্রতিদিন স্নানের আগে তিনি শরীরে তেল মাখেন। আজ তো তা সম্ভব নয়, তিনি ইতিমধ্যেই জলে নেমে পড়েছেন। তাঁর ধারণা হলো শুভানন্দ অবশ্যই স্নান করবেন। তারপর একটা শুকনো কাপড়ের দরকার হবে। সুতরাং উনি যতক্ষণ স্নান করছেন ততক্ষণে আশ্রম থেকে একটা কাপড় নিয়ে আসাই ভাল। দ্রুতপায়ে তিনি সেবাশ্রম মুখো হলেন।

একটু পরেই চৈতন্যানন্দ ফিরে এসে আঁতকে উঠলেন। স্বামী শুভানন্দ সেখানে নেই। তাঁর স্যান্ডাল রয়েছে, চাদর রয়েছে, কিন্তু তিনি নেই। কয়েকবার হাঁক দিয়ে ডাকলেন তিনি কিন্তু কোথাও থেকে কোনো উত্তর

এলো না। হঠাৎ মনে পড়ল শুভানন্দ সাঁতার কাটতে জানেন না।

স্রোতের নিশানা ধরে পাগলের মত ছুটছেন চৈতন্যানন্দ। কোথায় তিনি। একসময় গঙ্গা ও খাল যেখানে মিশেছে সেখানে যাঁরা স্নান করেছিলেন তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, কোনো সাধুকে স্রোতে ভেসে যেতে দেখেছেন?

তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ একজন বাঙালি সাধু ভেসে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে উদ্ধার করে দেখলাম, এখনও বেঁচে আছেন। তাঁকে বাঙালি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। চারজন সাধু তাঁকে বয়ে নিয়ে গিয়েছে। সেবাশ্রমে ফিরে গিয়ে চৈতন্যানন্দ দেখলেন, একজন ডাক্তার ও কয়েকজন সেবক তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। চৈতন্যানন্দের একটি চিঠিতে বিবরণ দিয়েছেন : "জল সমস্ত বাহির হইল। কিন্তু ধমনীতে আর প্রাণের স্পন্দন হইল না।"

কাশী সেবাশ্রমের কর্তা শুভানন্দ নিজের সম্পর্কে বলতেন, "আমি সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধান করি মাত্র, কর্তা আমি নই।"

তাঁর একটি আশ্চর্য অভ্যাস ছিল। যখনই কাশীর পথে বার হতেন তখনই কিছু চাল, ডাল বা কোনো খাবার জিনিস সঙ্গে নিতেন। কাউকে অভুক্ত দেখলে তাকে নিজে হাতে কিছু দিতেন।

যে আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বারাণসী সেবাশ্রমের কয়েকজন বিবেকানন্দ-শরণাগত বিশ শতকের শুরুতে নতুন ইতিহাস তৈরি করলেন সেই একই আলোয় নিজেদের প্রদীপ্ত করে আর এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন দুই বিবেকানন্দ শিষ্য কল্যাণানন্দ ও নিশ্চয়ানন্দ। গুরু তাঁদের উৎসমুখে ফিরতে বারণ করেছিলেন, তাঁরা গুরুর আদেশ অমান্য করেন নি। চিন-জাপান যুদ্ধের সময় আহতদের সেবার জন্য মেডিক্যাল মিশনের সভ্য হয়ে ভারতীয় ডাক্তার কোটনিস চিনে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। তাঁর জীবনগাথা যে বইতে ধরে রাখা হয়েছে, তার নাম 'ফেরে নাই শুধু একজন।' কনখলের অবিশ্বাস্য কাহিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় স্বামীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, তাঁর ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে একজন

নয়, ফেরে নাই কয়েকজন।

নিজেদের সম্পূর্ণ মুছে ফেলে গুরু বিবেকানন্দের ভাবধারাকে প্রাণবন্ত রাখাটাই ছিল দুই সন্ন্যাসীর ব্রত। এতই অহংকে অবহেলা যে ১৯৪০ সালে দেখা গেল যে-মানুষটি প্রায় চারদশক ধরে কনখল সেবাশ্রমের আকাশবাতাস প্রাণবন্ত রেখেছিলেন সেই নিশ্চয়ানন্দ মহারাজের কোনো ছবিই নেই সেবাশ্রমে। সেই সময় সেবাশ্রমে এসেছেন আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দ। শুনে তিনি বললেন, মার্কিনী ফক্স ভগ্নীরা সেবার যখন কনখলে এসেছিলেন তখন নিশ্চয় তাঁরা নিশ্চয়ানন্দকে কোনো না কোনো ছবির ফ্রেমে বন্দি করে রেখেছিলেন। তিনি মার্কিন দেশে চিঠি লিখে দিলেন। ফক্স ভগ্নীদের একজন তখনও বেঁচে ছিলেন, তিনি একটা ছবি পাঠালেন, সেই অস্পষ্ট ছবিটাই এখন আমাদের একমাত্র স্মৃতি।

একই বিবেকানন্দ-শিলা থেকে কুঁদে বার করা কল্যাণানন্দ। বরাবর দশ আনা দামের জুতো ব্যবহার করতেন। দারুণ ঠাণ্ডাতেও পশম নয়, তুলোর জামাই ছিল তাঁর ভরসা।

শেষ পর্বে কল্যাণানন্দের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। শত সহস্র মানুষকে ব্যাধিমুক্তিতে সাহায্য করাই যাঁর জীবনব্রত তিনি নিজেই এবার ভগ্নস্বাস্থ্য হলেন। কিন্তু শয্যাশায়ী হয়ে অপরের বোঝা বাড়ানোর মানসিকতা নিয়ে তিনি এই দূরদেশে গুরু বিবেকানন্দের নির্দেশ পালন করতে আসেননি। অতএব রোগ যতই হোক, কাজের বিরাম নেই। এই শরীরই যে ব্যাধিমন্দির তা তাঁর থেকে ভাল কি আর বুঝতো? সেই সঙ্গে প্রবল মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

মৃত্যুকে ভয় পাবার জন্য মানুষ সন্ন্যাসী হয় না, মরণের সঙ্গে আগাম মোকাবিলার জন্যই তো জীবিতকালে আদ্যশ্রাদ্ধ, তবু ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শেষ হতে চায় না। মৃত্যুও বোধ হয় তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট নয় যাঁরা ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে দেবজ্ঞানে দিবারাত্র সেবা করে মৃত্যুকে এবং দেহযন্ত্রণাকে বাধা দেয়। এক বছর দু'বছর নয়, সহায়হীন সম্পর্কহীন অচেনা অজানা দেশে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ভিক্ষাবৃত্তিতে ক্ষুধানিবৃত্তি করে নরনারায়ণের সেবা করে গুরুনির্দেশ পালন করেছেন মুখ বুজে।

জগতের ইতিহাসে এমন জিনিস যে আজও ঘটে তা কল্যাণানন্দের জীবনী না জানলে বিশ্বাস হয় না।

জীবনের শেষ পনেরো বছর কল্যাণানন্দ বিভিন্ন ব্যাধির শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাই বলে থেমে যাওয়া নয়, প্রতিকূল পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ অবশ্যই নয়। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস-লক্ষণকে চিহ্নিত করে গিয়েছেন। তাঁর অনুগত শিষ্যরা জানেন, সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। "সংসারী জীবনকে ভালবাসবে, সন্ন্যাসী মৃত্যুকে ভালবাসবে, আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুশয্যা।"

তবু গুরুর নির্দেশে মৃত্যুকে জয় করবার কি বিরামহীন ব্রত। সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে মৃত্যুর কাঠিন্যকে যথাসাধ্য কোমল কর মানুষের জন্য। কল্যাণানন্দ তাই নিজের শরীরের জন্য মাথাব্যথা করতে রাজি নন। প্রতি মুহূর্তের রণক্ষেত্রে তিনি সেনানায়কের যে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন সেখানে ছুটি নেই, অবসর নেই, পদত্যাগও নেই।

১৯৩৭। চিকিৎসকদের পরামর্শে কল্যাণানন্দকে মুসৌরি যেতে হলো, শেষবার যাত্রার সময় মহারাজ তাঁর আয়রন সেফের চাবি এক তরুণ সন্ন্যাসীর হাতে দিয়ে বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে সব যেন ঠিক ভাবে চলে। ২৫শে অক্টোবর মুসৌরি থেকে তিনি সেবক সর্বগতানন্দকে লিখলেন, একটা হট্‌ওয়াটার বট্‌ল ও কিছু ওষুধ নিয়ে এখানে এসো।

ইতিমধ্যে একদিন বিকেলে তাঁর শরীরে অসহ্য জ্বালা দেখা গেল। স্মিতহাস্যে সন্ন্যাসী বললেন, "ডাক্তার কী আর হবে? আই অ্যাম ডায়িং, আই অ্যাম ডায়িং।" গভীর রাতে অতিশয় স্পষ্টভাবে তিনবার 'মা' নাম উচ্চারণ করতে করতে বিবেকানন্দের প্রিয় শিষ্য, চির-অনুগত স্বামী কল্যাণানন্দ মহাসমাধিতে মগ্ন হলেন।

কনখলে যথোচিত মর্যাদা সহকারে তাঁকে জাহ্নবীগর্ভে সমাহিত করা হয়।

মৃত্যু তার ছোবল না দিলেও সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে থাকে না। কপর্দকশূন্য অবস্থায় অজানা দেশের দুর্গম পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে গুরুর নির্দেশে প্রবাসে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে বিবেকানন্দ মন্ত্রে মুগ্ধ

শিষ্য যে প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিলেন তা আজও বেঁচে রয়েছে। যথাসময়ে কনখল সেবাশ্রমের বিপুল বিস্তৃতি ঘটেছে, বহু রোগী আজও সেখানে সেবিত হচ্ছেন। সেবাশ্রমের পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে কোনো পাঠকের যদি কখনও বহুযুগ আগের এক বরিশাল যুবকের অবিশ্বাস্য সাধনার কথা মনে পড়ে যায় তা হলে আশ্চর্য হওয়ায় কিছু থাকে না। যদি প্রশ্ন জাগে, গুরুর কোন্ লোকাতীত শক্তিতে এই আমৃত্যু সাধনা সম্ভব হলো, তা হলে স্মরণ করা যেতে পারে ক্ষণজন্মা সেই সন্ন্যাসীটির কথা যিনি অকালপ্রয়াণের আগে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে দূরদেশে গিয়ে রোগীর সেবা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে অগস্তযাত্রার বিধিনিষেধ এঁটে দিয়ে বলেছিলেন—যা, কিন্তু আর ফিরবি না। অনুগত শিষ্য সেই কথা রেখেছে, গুরুর নির্দেশ মান্য করে সে আর জন্মভূমিতে ফেরেনি।

যারা ফেরে না তাদের কথাও মাঝে মাঝে স্মৃতির পটে ফিরে আসে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, স্বামীজির কোন্ অলৌকিক শক্তিতে যেমন-গুরু তেমন-শিষ্য কথাটি আজও এই পৃথিবীতে এমনভাবে ধ্রুবসত্য হয়ে রইল?

চিকিৎসকের চেম্বারে চল্লিশ টাকা

বিদেশে বসবাসকালে স্বামীজি যে কয়েকশো চিঠি লিখেছিলেন তার কোথাও-কোথাও আমরা কয়েকজন সহৃদয় ডাক্তারের খবর পাচ্ছি যাঁরা শুধু বিনামূল্যে সহায়সম্বলহীন সন্ন্যাসীর চিকিৎসা করেছিলেন তা নয়, প্রয়োজনে তাঁরা স্বামীজিকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই সুযোগে আমরা তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই এবং লজ্জা প্রকাশ করি এই কারণে যে পাশ্চাত্যবাসীর কাঞ্চনপ্রীতি প্রাচ্যদেশ অপেক্ষা অনেক বেশি—এই গুজবটি আজও যথেষ্ট পরিমাণে ছড়ানো হয়ে থাকে।

অপরিচিত দেশে অপরিচিত চিকিৎসক বিনা পারিশ্রমিকে বিদেশির চিকিৎসা করতে উৎসাহী নাও হতে পারেন, কিন্তু নিজের জন্মনগরী খোদ কলকাতায় বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দ খ্যাতনামাদের কাছে কী আচরণ পেয়েছিলেন তার এক অস্বস্তিকর ইঙ্গিত এতদিন লুকিয়েছিল স্বামীজির গুরুভাই, রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের প্রথম সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দের নোটবুকে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠ মিশনের খরচাপাতির নানা বিবরণ তাঁর এই বইতে নিয়মিত টুকে রাখতেন। বহুযুগ পরে সেই দিনলিপির ছোট্ট একটি উদ্ধৃতি টীকাকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হয়তো তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

সময় অক্টোবর ১৮৯৮। ইংরিজি ভাষায় দিনলিপিতে উল্লেখ : "October 28, 1898. (1) Gone to Calcutta to settle Dr. R. L. Dutt to see Swamiji. October 29, 1898 : Paid to Dr. R. L Dutt Rs. 40/-. Paid for medicines and other expenses Rs. 10/-."

উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে নগর কলকাতার উকিল, ব্যারিস্টার ও ডাক্তারদের অনেকের ভারতজোড়া খ্যাতি। দেশের সমস্ত প্রান্ত থেকে মক্কেল ও রোগীরা তাঁদের কাছে ছুটে আসতেন। কিন্তু তাঁদের পারিশ্রমিকের পরিমাণ যে হিমালয় সদৃশ হতে পারে তা যেন বিশ্বাস

হতে চায় না।

অসুস্থ স্বামীজির জন্য ডাক্তারের এই ফি কি মঠে গিয়ে রোগী দেখার জন্য? না চেম্বারেই এই ৪০ টাকা দেয়? আজকের হিসেবে এই চল্লিশ টাকাটা কত? একশো না, দুশো নয়, তিনশ দিয়ে গুণ করলে কি কাছাকাছি একটা অঙ্কে পৌঁছনো যাবে?

স্বামীজির জীবনকালের শেষপর্বে চিকিৎসাখরচ যে কোথায় উঠতে পারে এবং আমাদের এই বাংলার একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কেউ কেউ কেমন আর্থিক ব্যবহার করেছিলেন তার খোঁজখবর করাটা বোধহয় তেমন অন্যায় হবে না।

ডাক্তার আর এল দত্ত সম্পর্কেও কিছু বৃত্তান্ত হাতে পাওয়া গেল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্য কিছুটা ভালো, তাঁর এক সায়েব চিকিৎসক রোগী দেখার পরে হাতে নগদ টাকা পাওয়া সত্ত্বেও তা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পথ্য কেনবার জন্য। আর একজন ডাক্তার অর্থ তো নেনইনি, বরং তাঁর দেহাবসানের পরে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে, পকেট থেকে দশ টাকা বার করে দিয়ে ভক্তদের পরামর্শ দিয়েছিলেন বেঙ্গল ফটোগ্রাফারসকে ডেকে গ্রুপ ফটো তোলাতে। আরেকজন বিখ্যাত ডাক্তার খালি হাতে রোগীর কাছে যেতেন না, এক সময়ে নরেনের চিকিৎসা করতে এসেও রোগীকে তিনি একটি বেল উপহার দিয়েছিলেন। এই ডাক্তারের কাছ থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে একজোড়া চটি উপহার নিয়েছিলেন। যদিও উকিল ও ডাক্তারদের সম্বন্ধে তাঁর মতামত তেমন ভালো ছিল না।

পরবর্তী পর্যায়ে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একজন প্রিয় চিকিৎসক ছিলেন শশী ডাক্তার। পুরো নাম ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ। রোগী বিবেকানন্দ এঁকে কয়েকটি অন্তরঙ্গ চিঠি লিখেছিলেন। তার একটিতে বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যাকুল! কারণ ডাক্তারের কাছে এক গুরুভাই তাঁর সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়েছেন—ডায়াবিটিক বিবেকানন্দ মিষ্টি খাচ্ছেন নিষেধ সত্ত্বেও।

২৯ মে ১৮৯৭ আলমোড়া থেকে শশী ডাক্তারকে স্বামী বিবেকানন্দের

করুণ চিঠি : "যোগেন কি লিখছে তা ভ্রূক্ষেপ করবে না। সে নিজেও যেমন ভয়-তরাসে, অন্যকেও তাই করতে চায়। আমি লখ্‌নৌ-এ একটি বরফির ষোলভাগের একভাগ খেয়েছিলাম, আর যোগেনের মতে ওই হচ্ছে আমার আলমোড়ার অসুখের কারণ।"

ডায়াবিটিস যে দত্তদের পারিবারিক ব্যাধি তাঁর ইঙ্গিত রয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন ডেথ রেজিস্টারে পিতৃদেব বিশ্বনাথ দত্তের অকালমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটি মন্তব্যে। রোগটি বহুমূত্র।

মার্কিন মুলুকে বড় বড় ডাক্তারদের সান্নিধ্যে এলেও সেখানে স্বামীজির ডায়াবিটিস ধরা পড়েনি। প্রথম প্রবাস সম্পন্ন করে প্রিন্স রিজেন্ট লিওপোল্ড জাহাজে নেপল্‌স থেকে স্বামীজি কলম্বোতে এলেন ১৫ জানুয়ারি ১৮৯৭। এই সময় (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) তিনি লিখছেন, "আমি এখন মৃতপ্রায়...আমি ক্লান্ত—এতই ক্লান্ত যে যদি বিশ্রাম না পাই, তবে আর ছ'মাসও বাঁচব কিনা সন্দেহ।"

স্বামীজির সন্ন্যাসী শিষ্য কৃষ্ণলাল মহারাজের স্মৃতিচিত্র থেকে জানা যাচ্ছে, কলম্বোর ডাক্তাররাই স্বামীজির ডায়াবিটিস ধরেন এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসার পরামর্শ দেন। বলাবাহুল্য সেই সময়ে ডায়াবিটিস চিকিৎসা পদ্ধতির তেমন উন্নতি হয়নি এবং প্রাণদায়িনী ইনসুলিন তখনও অধরা।

ভগ্নস্বাস্থ্য স্বামীজির শরীর সম্পর্কে নানা বর্ণনা রয়েছে তাঁর নিজের চিঠিতেই। তাঁর মধ্যে মৃত্যুচিন্তাও এসে গিয়েছে। কলকাতার আলমবাজার মঠ থেকে আমেরিকায় মাতৃসমা মিসেস সারা বুলকে তিনি লিখছেন (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭), "যদি টাকা তোলবার আগেই আমার মৃত্যু হয়, তবে আপনি ওই টাকার সবটা তুলে আমার অভিপ্রায় অনুসারে খরচ করতে পারবেন। তা হলে আমার মৃত্যুর পর আমার বন্ধুবান্ধবদের কেউ আর ওই টাকা নিয়ে গোলমাল করতে পারবে না।"

এরপরে স্বাস্থ্যসন্ধানে স্বামীজির দার্জিলিং যাত্রা—২৬শে মার্চ ১৮৯৭। সেখান থেকে আর এক পত্রে মিসেস বুলকে তিনি তাঁর শরীর সম্পর্কে কিছু পারিবারিক খবরাখবর দিয়েছেন : "পশ্চিমে একটানা খাটুনি ও

ভারতে একমাস প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরিণাম বাঙালির ধাতে—বহুমূত্র রোগ। এ একটি বংশগত শত্রু এবং বড়জোর কয়েক বছরের মধ্যে এই রোগে আমার দেহাবসান পূর্বনির্দিষ্ট। শুধু মাংস খাওয়া, জল একেবারে না খাওয়া এবং সর্বোপরি, মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ বিশ্রামই বোধ হয়, জীবনের মেয়াদ বাড়াবার একমাত্র উপায়।"

আর এক চিঠির তারিখ ২৬ মার্চ ১৮৯৭। অর্থ-প্রসঙ্গে কলকাতাবাসীদের বিচিত্র ব্যবহার এই সময়ে স্বামীজির মানসিক দুঃখের কারণ হয়েছিল। তার ইঙ্গিত রয়েছে, ভারতী সম্পাদিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয়া সরলা ঘোষালকে দার্জিলিং থেকে লেখা আর একটা চিঠিতে—তারিখ ৬ এপ্রিল ১৮৯৭। ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু স্বয়ং বিবেকানন্দ মনের দুঃখে নিজের কথা লিখে গিয়েছেন। কলকাতায় তাঁকে যে বিশেষ অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল, যথাসময়ে তার খরচের একটি বিল সংগঠকরা তাঁকেই ধরিয়ে দিয়েছিলেন। "আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্বাহের জন্য কলকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!!" উদারহৃদয় সন্ন্যাসী অবশ্যই বিস্মিত, কিন্তু লিখছেন, "ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না ; কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহাই পোষণ করিতেছি।"

দার্জিলিং থেকে লেখা আরও কয়েকটি চিঠি থেকে স্বামীজির স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও ডায়াবিটিসের উল্লেখ, কোথাও ডাক্তারদের পরামর্শে খেতড়ির রাজা অজিত সিং-এর সঙ্গে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার খবর, আবার কোথাও দেহ বর্ণনা যা দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। মিস মেরী হেলকে (২৮ এপ্রিল ১৮৯৭) দার্জিলিং থেকে স্বামীজি লিখছেন, "আমার চুল গোছাগোছা পাকতে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে—দেহের এই মাংস কমে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ

আমাকে শুধু মাংস খেয়ে থাকতে হচ্ছে—রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমনকী আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! ...আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি ; আর তা পেকে সাদা হতে আরম্ভ করেছে...হে সাদা দাড়ি, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পারো! তোমারই জয় জয়কার।”

এই চিঠি লেখার তিন সপ্তাহ পরে স্বামীজির ঠিকানা আলমোড়া। ২০ মে ১৮৯৭ অভিন্নহৃদয় স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি স্বাস্থ্যের রিপোর্ট দিচ্ছেন : “আরও ঠান্ডা দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই দেখছি লিভারের গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এত শুষ্ক যে দিনরাত নাক জ্বালা করছে এবং জিব যেন কাঠের চোকলা।...তুমিও-সব মুখ্যু-ফুখ্যুদের কথা কি শোন? যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না—স্টার্চ বলে!! আবার কি খবর—না, ভাত আর রুটি ভেজে খেলে আর স্টার্চ থাকে না!!! অদ্ভুত বিদ্যে বাবা!! আসল কথা আমার পুরোনো ধাত আসছেন। ...রাত্রির খাওয়াটা মনে করেছি খুব ‘লাইট’ করব ; সকালে আর দুপুরবেলা খুব খাব, রাত্রে দুধ, ফল ইত্যাদি। তাই তো ওৎ ক’রে ফলের বাগানে পড়ে আছি, হে কর্তা!!”

দু সপ্তাহ পরে (৩ জুন ১৮৯৭) যা স্বাস্থ্যের খবর পাওয়া যাচ্ছে তা তেমন ভালো নয়। “আমার দেহ নানাপ্রকার রোগে বারবার আক্রান্ত হচ্ছে এবং ‘ফিনিক্স’ পাখির মতন আমি আবার বারবার আরোগ্য লাভও করছি। ...সব বিষয়েই আমি চরমপন্থী—এমনকী আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাই ; হয় আমি লৌহদৃঢ় বৃষের মতো অদম্য বলশালী, নতুবা একেবারে ভগ্নদেহ... যদি শেষ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙেই পড়ে, তা হলে এখানে কাজ একদম বন্ধ করে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তখন আমাকে আহার ও আশ্রয় দিতে হবে—কেমন পারবে তো?”

আরও সতেরো দিন পরে স্বামীজির অদম্য উৎসাহ। প্রিয় ব্রহ্মানন্দকে আলমোড়া থেকে লিখছেন (২০ জুন ১৮৯৭) : “আমি সেরেসুরে গেছি। শরীরে জোরও খুব ; তৃষ্ণা নাই, আর রাত্রে উঠিয়া প্রস্রাব বন্ধ, ...কোমরে বেদনা-ফেদনা নাই, লিভারও ভালো।”

পরবর্তী রিপোর্টের তারিখ ১৩ জুলাই ১৮৯৭। দেউলধার আলমোড়া

থেকে প্রেমাস্পদ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে চিঠি : "পেটটা বিষম ফুলিতেছে : উঠতে বসতে হাঁপ ধরে,...পূর্বে আমার দুইবার 'সান-স্ট্রোক' হয়। সেই অবধি রৌদ্র লাগিলেই চোখ লাল হয়, দুই-তিন-দিন শরীর খারাপ যায়।" এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য খবর : " 'স্যাকারিন' ও 'লাইম' এসেছে।"

আশা-নিরাশার দোলায় নিরন্তর দুলে চলেছেন আমাদের অনন্তবিস্ময় স্বামী বিবেকানন্দ। বেলুড় মঠ থেকে ১৯ আগস্ট ১৮৯৭ মিসেস ওলি বুলকে তিনি নিজের হাতে লিখছেন, "আমার শরীর বিশেষ ভালো যাচ্ছে না...আগামী শীতের আগে পূর্বশক্তি ফিরে পাবো বলে বোধ হয় না।"

পরের মাসে (৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭) শ্রীনগর কাশ্মীর থেকে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বিস্ময়কর সংবাদ : "সাধারণ স্বাস্থ্য খুব ভালো ও ডায়াবেটিস অনেকদিন ভাগলওয়া হয়েছেন—আর কোনও ভয় করব না।" ডায়াবিটিস যে দুরারোগ্য, একবার হলে সারাজীবন যে কেবলমাত্র তাকে আয়ত্তে রাখবার চেষ্টা চলতে পারে সেখবর তখনও বোধহয় সাধারণের কাছে অজ্ঞাত।

এই রোগ সম্বন্ধে আরও আলোকপাত করছেন স্বামীজি নিজেই বেলুড়মঠ হাওড়া থেকে ২ মার্চ ১৮৯৮। লিখছেন মার্কিন মুলুকে স্নেহের মিস মেরী হেলকে : "লন্ডন থেকে ফিরে এসে যখন আমি দক্ষিণ ভারতে এবং যখন লোকেরা আমাকে উৎসবে ভোজে আপ্যায়িত করছে এবং আমার কাছ থেকে ষোল আনা কাজ আদায় করে নিচ্ছে, এমন সময় একটি বংশগত পুরোনো রোগ এসে দেখা দিল। রোগের প্রবণতা (সম্ভাবনা) সব সময়ই ছিল, এখন অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তা আত্মপ্রকাশ ক'রল। সঙ্গে সঙ্গে শরীরে এল সম্পূর্ণ ভাঙন ও চূড়ান্ত অবসাদ।"

কিন্তু নিরাশ হতে প্রস্তুত নন আমাদের রোগজর্জরিত নায়ক। "তুমি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ রোগটা আরও দুই তিন বছর আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। বড়জোর নির্দোষ সঙ্গীর মতো থেকে যেতে

পারে। আমার কোন খেদ নেই।...বহুদিন আগে যেদিন জীবনকে বিসর্জন দিয়েছি, সেইদিনই আমি মৃত্যুকে জয় করেছি।"

ডায়াবিটিস ছাড়াও অন্য কয়েকটি রোগের নিগ্রহ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। ২৮ আগস্ট ১৮৯৮ শ্রীনগর, কাশ্মীর থেকে আমেরিকায় স্নেহের মেরী হেলকে স্বামীজি খবর দিচ্ছেন, "আমি খুশি যে, দিন-দিন আমার চুল পাকছে। তোমার সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের পূর্বেই আমার মাথাটি পূর্ণ-বিকশিত একটি শ্বেতপদ্মের মতো হবে।"

রসিকতা করে স্বামীজি পরিস্থিতি যতই হালকা করুন, কাশ্মীরে তিনি যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তা কারও অজানা নয়। যা তেমন জানা নয়, চিকিৎসার খরচে বিব্রত কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসীর মনোবেদনা। বিব্রত সন্ন্যাসী এই অবস্থায় দুখানি চিঠি লিখেছিলেন দুঃখদিনের দুই বন্ধুকে। দুটি চিঠিরই তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮।

স্নেহের হরিপদ মিত্রকে লিখছেন : "মধ্যে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ দেরি হইয়া পড়িল, নতুবা এই সপ্তাহের মধ্যেই পাঞ্জাবে যাইবার কল্পনা ছিল। ...আমার সঙ্গে এবার কেহ নাই। দু'জন আমেরিকান লেডি ফ্রেন্ড মাত্র আছেন। ...আমার এখানকার সমস্ত খরচপত্র উক্ত আমেরিকান বন্ধুরা দেন এবং করাচি পর্যন্ত ভাড়া প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট হইতেই লইব। তবে যদি তোমার সুবিধা হয়, ৫০ টাকা টেলিগ্রাম করিয়া C/O ঋষিবর মুখোপাধ্যায়, চিফ জজ, কাশ্মীর স্টেট, শ্রীনগর—এঁর নামে পাঠাইলে অনেক উপকার হইবে। কারণ সম্প্রতি ব্যারামে পড়িয়া বাজে খরচ কিছু হইয়াছে এবং সর্বদা বিদেশী শিষ্যদের নিকট টাকা ভিক্ষা করিতে লজ্জা করে।"

অবস্থা কতটা সঙ্গীন হলে সামান্য কয়েকটা টাকার জন্যে স্বামীজির মতন মানুষ এমন চিঠি লিখতে পারেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অর্থের এমনই প্রয়োজন যে একই দিনে (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮) তাঁর আর্থিক পরিত্রাতা খেতড়ির মহারাজা অজিৎ সিংকে আর একটি চিঠি লেখেন। "এখানে আমি দু-সপ্তাহ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার কিছু টাকার টান পড়েছে। যদিও

আমেরিকান বন্ধুরা আমাকে সাহায্যের জন্য তাঁদের সাধ্যমতো সবকিছুই করছেন, কিন্তু সবসময়ই তাঁদের কাছে হাত পাততে সঙ্কোচ হয়, বিশেষত অসুখ করলে খরচের বহর অনেক বেড়ে যায়। এই জগতে শুধু একজনের কাছেই আমার কিছু চাইতে লজ্জা হয় না, এবং তিনি হলেন আপনি। আপনি দিলেন কি না দিলেন—আমার কাছে দুই সমান। যদি সম্ভব হয়, অনুগ্রহ করে কিছু টাকা পাঠাবেন।"

বোঝা যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে মহারাজের সঙ্গে টেলিগ্রামে কিছু সংবাদ চালাচালি হয়েছিল, মনে হয় 'তারে' (টেলিগ্রাফিক মানি অর্ডার) কিছু অর্থ খেতড়ি থেকে শ্রীনগর পাঠানো হয়েছিল। ১৬ অক্টোবর ১৮৯৮ স্বামীজির চিঠি : "মহামান্য মহারাজ, আমার 'তারে'র পরে যে চিঠিখানা গিয়েছে, তাতে আপনার অভিপ্রেত সংবাদ ছিল ; সেজন্য আপনার তারের উত্তরে আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ দিয়ে আর কোনও 'তার' করিনি।"

একই দিনে লাহোর থেকে হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠিতে আবার অর্থের উল্লেখ। "কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে এবং ৯ বৎসর যাবৎ দুর্গাপূজা দেখি নাই—এ বিধায় কলিকাতা চলিলাম। ...৫০ টাকা আমার গুরুভ্রাতা সারদানন্দ লাহোর হইতে করাচি পাঠাইবেন।"

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দের মন্তব্য : "স্বামীজি তখন কপর্দকশূন্য ছিলেন—আমেরিকান মহিলাদের অর্থে তাঁহার ব্যয় নির্বাহ হইত, ভারত হইতে তিনি কিছুই পাইতেন না।"

লাহোর থেকে ১৬ অক্টোবর (১৮৯৮) স্বামী সদানন্দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতায় চললেন, বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে পৌঁছলেন ১৮ অক্টোবর। তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে মঠের মানুষদের চিন্তার অবধি নেই।

এবার শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর বিখ্যাত বই 'স্বামী শিষ্য সংবাদে' আসা যাক। স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী। "কাল—নভেম্বর ১৮৯৮", মনে হয় সময়টি ভুল, অক্টোবর হবে, কারণ পরিচ্ছেদের শুরু : "আজ দুই-তিনদিন হইল স্বামীজি কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।"

স্বামীজির শরীর তেমন ভালো নেই। "শিষ্য মঠে আসিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজি কারও সঙ্গে কোনও কথাবার্তা কন না, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন। তুই স্বামীজির কাছে গল্পসল্প করে স্বামীজির মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস।'...শিষ্য স্বামীজির ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামীজি মুক্ত-পদ্মাসনে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন...মুখে হাসি নাই। ...স্বামীজির বামনেত্রের ভিতরটা রক্তবর্ণ দেখিয়া শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার চোখের ভিতরটা লাল হয়েছে কেন?' 'ও কিছু না' বলিয়া স্বামীজি পুনরায় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।"

শিষ্য তামাক সাজিয়ে দিল। আস্তে আস্তে ধূমপান করতে করতে স্বামীজি বললেন, অমরনাথ যাবার কালে পাহাড়ের একটা খাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম। যে রাস্তায় যাত্রীরা কেউ যায় না...আমার কেমন রোক হ'ল, ওই পথেই যাব। যাব তো যাবই। সেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে।

শিষ্য। শুনেছি, উলঙ্গ হয়ে অমরনাথকে দর্শন করতে হয়। কথাটা কি সত্য?

স্বামীজি। হাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভস্ম মেখে গুহায় প্রবেশ করেছিলাম।"

বেলুড়ে ফেরার পরে স্বামীজির চিকিৎসার জন্য কলকাতার সেরা ডাক্তারের খোঁজখবর পড়ে যায়। সবারই ধারণা বিশ্ববন্দিত বিবেকানন্দকে কোন্ ডাক্তারই না, বিশেষ করে বাঙালি ডাক্তার চিকিৎসা করতে আগ্রহী হবেন?

ডাক্তার-সন্ধানে প্রধান ভূমিকায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ। তাঁর দিনলিপিতে ছোট্ট একটি নোটিং : ২৮ অক্টোবর ১৮৯৮ তিনি কলকাতায় যান ডাক্তার আর এল দত্তর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করতে।

এই ডাক্তার দত্ত সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে অনেকের কৌতূহল। এঁর সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তার প্রধান সূত্র মহানগরীর সুবর্ণবণিক সমাজ। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে ডাঃ দত্তর খ্যাতি

ভারতজোড়া। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিকথায় তাঁর কাছে চিকিৎসা করানোর বিবরণও নজরে এসেছে। আরও যা আকর্ষণীয়, তাঁর পারিবারিক বাড়ি পঞ্চাননতলা হাওড়ায় যেখানকার চৌধুরীবাগানে এই প্রতিবেদকের বহুবছর কেটেছে।

ইদানীং এই খ্যাতনামা চিকিৎসক সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি তার কিছুটা অংশ কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। আমাদের এই খবরের প্রধান উৎস 'সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি'।

রসিকলাল দত্ত কলকাতায় লেফটেনান্ট কর্নেল আর এল দত্ত নামে পরিচিত ছিলেন। গুরুচরণ দত্ত ও দিগম্বরী দত্তর তিনি চতুর্থ পুত্র, জন্ম ২০ আগস্ট ১৮৪৫। তাঁর যখন একবছর বয়স তখন পিতৃদেব হাওড়ায় চলে আসেন। দত্তদের আদিবাড়ি স্বামী প্রেমানন্দের পৈতৃক বাড়ি আটপুরে, যেখানে স্বামীজির অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে আছে।

রসিকলাল দত্তের ব্যক্তিজীবন এমনই নাটকীয় যে তার সামান্য ইতিবৃত্ত এখানে লিপিবদ্ধ করার অপরাধ মার্জনীয়। প্রথমে পাঠশালা, পরে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত রেভারেন্ড গোপাল মিত্রর অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলে অধ্যয়ন। তারপর হাওড়া জেলা ইস্কুল।

প্রতিবছর ডবল প্রমোশন পেয়ে ১৪ বছর বয়সে রসিকলাল সেকেন্ড ক্লাসে উঠলেন। "সেই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র তিন মাস বাকি। প্রবেশিকা-ক্লাসে পরীক্ষা পাশ করার উপযুক্ত কোনও কোনও ছাত্র ছিল না। সেইজন্য হেডমাস্টার রসিকলালকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই তিন মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হবার মতো পড়া তৈরি করতে পারবে কিনা।" রসিকলাল রাজী হলেন এবং ১৮৫৯ সালে ১৪ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

তখনকার দিনকাল অন্যরকম। একইসঙ্গে ভুবনবিদিত প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব ছিল। তখনও গঙ্গার ওপর ভাসমান সেতু তৈরি হয়নি, রসিকলাল প্রত্যেকদিন নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে কলেজ করতেন। কিছুদিন পরে ডাক্তারির দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে দেন।

১৮৬২-৬৩ সালে রসিকলাল মেডিক্যাল কলেজের ডিপ্লোমা পাশ করেন এবং একই বছরে খিদিরপুরের গোলাপমোহিনী দেবীর সঙ্গে বিবাহিত হন।

মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তেই রসিকলাল ডাক্তারি প্র্যাকটিশ শুরু করেন। শোনা যায় ফিফথ্ ইয়ারে পড়বার সময়েই তাঁর বিশাল পসার, মাসিক উপার্জন ৬০০ টাকা! "রোগী দেখিবার জন্য তিনি ১৬ জন পাল্কি-বেয়ারা নিযুক্ত করেন।" প্রাইভেট প্র্যাকটিশে তিনি এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে ডাক্তারির ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি উপস্থিত হতে পারলেন না, "এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।"

১৮৭০ সালে রসিকলালের জীবনে প্রবল আঘাত এল। হাওড়া শালকিয়ায় এক মহিলার জটিল চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতালের বড় বড় ডাক্তাররা এসে ব্যর্থ হন। তখন রসিকলালকে ডাকা হয়। তাঁকে আসতে দেখে হাসপাতালের সার্জন বিরক্ত হন এবং 'মাতাল ও হাতুড়ে' ডাক্তার বলে বিদ্রুপ করেন।

রোগিণীকে নিরাপদে প্রসব করিয়ে বাড়ি ফিরে অপমানিত রসিকলাল দত্ত শয্যাগ্রহণ করলেন। সার্জেনের বিদ্রূপের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন, তিনি বিলেত গিয়ে ডাক্তার হতে চান। দাদা বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত যতক্ষণ না অনুমতি দিচ্ছেন ততক্ষণ তিনি বিছানা ছেড়ে উঠবেন না। চতুর্থদিনে মায়ের অনুরোধে দাদা অনুমতি দিলেন, তবে জানিয়ে দিলেন বিলেতে যাবার এবং পড়াশোনার খরচপত্র তিনি বহন করতে পারবেন না।

ফ্লাইং ফোম নামে পালবাহী জাহাজে ডাক্তারের কাজ নিয়ে ১৮৭০ সালের মার্চ মাসে রসিকলাল এদেশ থেকে ত্রিনিদাদ যাত্রা করলেন। এই জাহাজে ভারতবর্ষ থেকে পাঁচশো কুলি পাঠানো হয়েছিল।

সিংহল, বিষুবরেখা, মাদাগাস্কার অতিক্রম করে পালতোলা জাহাজ যখন আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে চলল, তখন প্রবল ঝড় জাহাজকে ঠেলে ৪০০ মাইল দক্ষিণে নিয়ে গেল এবং ভীষণ বেগে একটা ভাসমান বরফ স্তূপের উপর নিক্ষেপ করল। ফ্লাইং ফোম সেই স্তূপে আটকে গেল।

"ওজন কমিয়ে জাহাজ রক্ষার জন্য কাপ্তেন ২০০ মণ চাল ও ডাল সমুদ্রে ফেলে দেবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অনাহারের আশঙ্কায় কুলিরা গোলযোগ আরম্ভ করলো।"

জাহাজের ডাক্তার রসিকলাল অনেক চেষ্টায় অবস্থা সামাল দিয়ে বিদ্রোহীদের "প্রিজন সেলে নিয়ে যান এবং তথায় আবদ্ধ করেন।"

দশদিন এই অবস্থায় থাকার পরে, একাদশ দিনে দূরে একটা বাষ্পীয় পোত দেখা গেল এবং এই জাহাজটি বিপন্ন পালতোলা জাহাজকে বরফ-স্তূপ থেকে মুক্ত করে, টানতে টানতে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে পৌঁছে দিল। দুস্তর পারাবার পেরিয়ে যাত্রার চার মাস পরে ফ্লাইং ফোম জাহাজ ত্রিনিদাদ পৌঁছলো।

ফ্লাইং ফোম জাহাজের চাকরি ইস্তফা দিয়ে রসিকলাল যে ডাক জাহাজে এবার ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করলেন সেটিও পাল ও দাঁড়বাহী। লন্ডনে এসেও নবাগত রসিকলাল নানা বিপদে পড়েন। নিরুপায় হয়ে শহরের ডিরেক্টরি দেখে লন্ডনের এক বাঙালি ডাক্তারকে (ক্ষেত্রমোহন দত্ত) তিনি তার করেন এবং ক্ষেত্রমোহন দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে নিজের বাসায় নিয়ে যান। পরবর্তী পর্যায়ে লন্ডনে যাঁদের সঙ্গে রসিকলাল একটা বাসা ভাড়া করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত তারকনাথ পালিত, কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গিরিশচন্দ্র মিত্র।

লন্ডন থেকে যথাসময়ে রসিকলাল যেসব ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেন তাদের মধ্যে রয়েছে এম বি, এম আর সি এস ও এম ডি। এই সময়ে আই এম এস পরীক্ষায় বসবার জন্যে চেষ্টা করেন। সঙ্গে গোপাল রায় ও ডাক্তার কে ডি ঘোষ। শেষের মানুষটি ঋষি রাজনারায়ণ বসুর জামাই এবং শ্রীঅরবিন্দের বাবা খ্যাতনামা সিভিল সার্জেন কৃষ্ণধন ঘোষ। এঁদের আবেদন, যতদিন না আই এম এস পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে তত্দিন নেট্‌লে মিলিটারি ট্রেনিং স্কুলে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু ইন্ডিয়া অফিস এই দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন। হতাশ হয়ে রসিকলাল দেশে ফিরে আসেন ১৮৭১ সালে এবং ডিব্রুগড়ে মেডিকেল

অফিসার নিযুক্ত হন। কাজে যোগ দেবার জন্যে রসিকলাল যখন প্রস্তুত হচ্ছেন সেই সময় লন্ডন থেকে নতুন খবর এল ফেব্রুয়ারি ১৮৭২ সালে। ৪০ জন বিদেশিকে আই এম এস পরীক্ষায় বসবার অনুমতি দেওয়া হবে।

পরীক্ষার মাত্র আটদিন আগে রসিকলাল আবার লন্ডনে হাজির হতে পারলেন। আই এম এস-এ সফল হয়ে, নেট্‌লে মিলিটারি ট্রেনিং স্কুলে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং নিয়ে রসিকলাল লেফটেনান্ট পদ লাভ করলেন এবং ৫১ আইরিশ রেজিমেন্টে কাজ নিয়ে ১৮৭২ নভেম্বর মাসে বম্বেতে হাজির হলেন।

১৮৯৩ সালে রসিকলাল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অফিসিয়েটিং প্রফেসর। পরবর্তী পদ বর্ধমান এবং যথাসময়ে হুগলির সিভিল সার্জন।

কোনও এক সময়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হল। "উক্ত পদে তাঁর দাবি সমধিক ছিল। কিন্তু তিনি বাঙালি বলে তাঁকে নিযুক্ত করা হল না ; একজন জুনিয়র ইংরেজ কর্মচারীকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করায় তেজস্বী রসিকলাল দু'বছরের ফার্লো আবেদন করে চাকরি থেকে অকাল অবসর গ্রহণ করেন।"

স্বামীজি যে-বছর নানা অসুখে জর্জরিত (১৮৯৮) সেই বছরই রসিকলাল কলকাতায় স্বাধীনভাবে চেম্বার খুলে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করে বিপুল সাফল্য অর্জন করেন।

এখন প্রশ্ন, স্বামীজিকে ডাক্তারের কোন চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন পরম বিশ্বস্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ? এই ব্যবস্থা পাকা করতেই তো স্বামী ব্রহ্মানন্দ ২৮ অক্টোবর ১৮৯৮ বেলুড় মঠ থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এর উত্তর কঠিন নয়—২ নম্বর সদর স্ট্রিট, ইন্ডিয়ান মিউজিয়মের উত্তরদিকের পথ। এই রাস্তায় একসময় ভাড়াটে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব, সেই বাড়িতে বসেই একদিন ভোরে কবি রবীন্দ্রনাথ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখেছিলেন। সদর স্ট্রিটের ২ নম্বর বাড়িতে রসিকলাল যে বিশাল পসার

জমিয়ে বসেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে স্বামীজির চেম্বারে আসার তারিখটা নিয়ে একটু গোলমাল রয়েছে। যুগনায়ক বিবেকানন্দ বইটির তৃতীয় খণ্ডের ১৫০ পাতায় স্বামী গম্ভীরানন্দ ২৭ অক্টোবর ১৮৯৮ উল্লেখ করছেন, অথচ একই পাতার ফুটনোটে স্বামী ব্রহ্মানন্দের নোট বইতে উল্লেখ, ২৮ অক্টোবর তিনি সব ব্যবস্থা পাকা করতে কলকাতায় ডাক্তার আর এল দত্তের কাছে গিয়েছিলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ নোট বইকেই নির্ভর করা আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে, এবং সেক্ষেত্রে রোগী দেখার তারিখ ২৯ অক্টোবর ১৮৯৮।

এখন বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের কৌতূহল, সদর স্ট্রিটে স্বামীজির কী চিকিৎসা হয়েছিল? স্বামীজির চিকিৎসার কোনও প্রেসক্রিপশন কারও সংগ্রহে আছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রেসক্রিপশন তো দূরের কথা তাঁর ডেথ সার্টিফিকেটও আমাদের আয়ত্তের বাইরে।

ডাক্তার আর এল দত্তের সদর স্ট্রিটের চেম্বার সম্বন্ধে আমাদের খবরাখবর সীমাবদ্ধ। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি থেকে আমরা জানি স্বামীজির ওষুধের খরচ লেগেছিল দশ টাকা। এবং স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, "তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর এল দত্তের নিকট তাঁহার বুক পরীক্ষা করানো হয়, কবিরাজদেরও সাহায্য লওয়া হয়। উক্ত ডাক্তারবাবু ও কবিরাজগণ সকলেই বলিয়া দেন, সাবধানে থাকা উচিত, নতুবা রোগ প্রবলাকার ধারণ করিতে পারে।"

ডাক্তার রসিকলাল দত্তর চিকিৎসা-বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পেরেছি তা এইরকম: "প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-কৌশলের সমন্বয়ই তাঁকে চিকিৎসক-শিরোমণিরূপে পরিণত করেছিল এবং ওইটাই ছিল তাঁর চিকিৎসার বিশেষত্ব। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রথমবার বিলাত যাওয়ার পূর্ব থেকে কিছু কিছু অধ্যয়ন করতেন।...ভারতবর্ষে ফিরে আসবার পর তিনি চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থ পুনরায় অধ্যয়ন করে উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। বিশেষত ভারতীয় দ্রব্যগুণ তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। এইভাবে তিনি ক্রমে আয়ুর্বেদীয় পথ্যের অনুরাগী হন এবং

রোগ-নির্ণয়েও ভারতীয় প্রথা অনেকাংশে অবলম্বন করেন।"

ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ও নিদ্রাহীনতা রোগে জর্জরিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যে শেষপর্যন্ত বড় ডাক্তারের কড়ি জুগিয়েও তেমন কিছু শারীরিক সুফল পাননি তার ইঙ্গিত জীবনীকারদের রচনায় রয়েছে। স্বামীজির স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না দেখে শুভানুধ্যায়ীরা স্থির করলেন অন্যত্র বায়ুপরিবর্তন প্রয়োজন। সেইমতো ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮ স্বামীজি বৈদ্যনাথধাম যাত্রা করলেন। সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে ২২ জানুয়ারি ১৮৯৯ তিনি কলকাতায় ফিরলেন। দেওঘরে তাঁর শরীর এত খারাপ হয় যে টেলিগ্রাম পেয়ে স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী সদানন্দ বেলুড় থেকে সেখানে ছুটে যান।

দেওঘরে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সময় সময় স্বামীজির এত শ্বাসকষ্ট হত যে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠত, সর্বাঙ্গে আক্ষেপ হতো এবং উপস্থিত সকলে মনে করতেন, বুঝিবা প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে। স্বামীজি বলেছেন, এই সময় একটা উঁচু তাকিয়ার ওপর ভর দিয়ে বসে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতেন, ভিতর থেকে যেন নাদ উত্থিত হত—"সোঽহং সোঽহং"।

এই সময়ে শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে স্বামীজির চিঠি (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯) : "বৈদ্যনাথে বায়ুপরিবর্তনে কোনও ফল হয়নি। সেখানে আট দিন আট রাত শ্বাসকষ্টে প্রাণ যায় যায়। মৃতকল্প অবস্থায় আমাকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে এসে বেঁচে উঠবার লড়াই শুরু করেছি। ডাক্তার সরকার এখন আমার চিকিৎসা করছেন।"

আমরা ২ সদর স্ট্রিটের প্রসঙ্গ এখনও শেষ করিনি। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে : Paid to Dr. R. L. Dutt Rs 40/-... তারিখ ২৯ অক্টোবর ১৮৯৮। দরিদ্র সন্ন্যাসী চেম্বারে ডাক্তারের নগদ কড়ি দিচ্ছেন চল্লিশ টাকা উনিশ শতকের কলকাতায়! বিশ্বাস হতে চায় না! আজকের মূল্য মানে সেই চল্লিশ টাকা কত? চার হাজার, না আট হাজার, না বারো হাজার তা হিসেব করে লাভ কী? চিকিৎসার

খরচের বোঝায় আমাদের প্রিয় মহামানব বিব্রত ও বিধ্বস্ত হয়েছিলেন সেকথা ভেবেএ এতদিন পর লাভ কি?

ডাক্তার রসিকলাল দত্ত সম্পর্কে আরও যা জানতে পেরেছি—একমাত্র পুত্র জহরলালকে তিনি রানিগঞ্জের কাছে ভসকাজুলী নামে কয়লাখনি কিনে দেন। ১৮৯৪ সালে ৪ জানুয়ারি দুটি কন্যা ও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে পুত্র জহরলাল পরলোকগমন করেন। ১৮৯৪ সালের ১৭ এপ্রিল রসিকলালের পৌত্র রঙ্গলাল দত্তের জন্ম। প্রথম পৌত্রী আশালতা চ্যাটার্জি পরবর্তীকালে বিখ্যাত ডাক্তার কর্নেল কে কে চ্যাটার্জির পত্নী। দ্বিতীয় পৌত্রী অনারেবল মিসেস শান্তিলতা সিংহ লর্ড সিংহের পুত্র অনারেবল শিশিরকুমার সিংহের সহধর্মিণী। ১৯০৮ সালে রসিকলাল-পত্নী গোলাপমোহিনীর দেহত্যাগ। তাঁর মৃত্যুর দু'মাস পরে রসিকলাল ৪ নম্বর ময়রা স্ট্রিটে বাড়ি কেনেন।

জীবনের শেষদিকে পুত্রশোকাতুর ডাক্তার বসিকলাল দত্ত দৃষ্টিহীন হয়ে যান। এই অবস্থায় জীবন-ধারণ করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিল, তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন—"ভগবান আমাকে শীঘ্র নাও, আমার কাজ শেষ হয়েছে।"

"আমার কাজ আমি করে দিয়েছি বস্"

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে মৃত্যুর কোনো স্বীকৃতি নেই, কারও তিরোধান দিবসেই কোনো অনুষ্ঠান হয় না। তবু স্বামী বিবেকানন্দর মহানির্বাণের দিনটি (৪ জুলাই) কাছাকাছি এলেই প্রতিবছর তাঁর সম্বন্ধে অনেকের অস্থিরতা ও আগ্রহ ভীষণ বেড়ে যায়। বেঁচে ছিলেন তো মাত্র উনচল্লিশ বছর কয়েক মাস, তারই মধ্যে প্রধান সময়টা সহায়সম্বলহীন অবস্থায় দেশ ও বিদেশের পথে পথে কেটেছে। সংখ্যাহীন প্রতিকূল অবস্থামালার বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়তে-লড়তে স্বামীজি কী করে মানুষের জন্যে এত চিন্তা করে গেলেন তা ক্রমশই আমার কাছে এক বিরাট বিস্ময়ের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইদানীং স্বামীজির শরীরের নানা অসুখবিসুখ সম্বন্ধেও মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এতরকম ব্যাধি ও শারীরিক যন্ত্রণাকে পরোয়া না করে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কীভাবে এমন বিধ্বংসী ঝড় তুলে গেলেন তাও মানুষের অনুসন্ধানের বিষয়।

স্বামীজির শরীর-স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' বইতে কিছু লেখা হয়েছে, এ-বিষয়ে আরও একটু ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। স্বামী সারদানন্দকে লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, দেশের লোকগুলো এত শীঘ্র মরে যায় কেন? যার কথা জিজ্ঞেস করি, খবর নেই, সে মারা গেছে। জাতটা কি মরে বিলোপ পেয়ে যাবে নাকি?...ওরা যে দুখচেটে খায়, তাতে এত শীঘ্র মরে যায়! ওদের খাওয়াটা বদলে দেওয়া দরকার। আমেরিকাতে যখন ছিলুম, তখন কয়েক বৎসরের ভিতর কোনো ব্যামো হয় নাই। কয়েকদিন সামান্য সর্দিকাশি হয়েছিল। ভূতের মতো পরিশ্রম করেছি, তাতে কিন্তু শরীর খারাপ হয় নাই।"

এসব ১৮৯৬ সালের কথা, স্বামীজির ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ ও গুরুভাই

স্বামী সারদানন্দ তখন লন্ডনে উপস্থিত। সেই সময়েই কিন্তু স্বামীজির আসন্ন শারীরিক বিপর্যয়ের আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মহেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে : "একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্বামীজি তাঁহার ঠেসান-দেওয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া ভাবিতেছিলেন অথবা ধ্যান করিতেছিলেন। ফক্স ও বর্তমান লেখক অপরদিকের দেওয়ালের নিকট পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁহার মুখে বড় কষ্টের ভাব দেখা গেল। খানিকক্ষণ পর তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া ফক্সকে বলিলেন, "দেখ ফক্স, আমার প্রায় হার্ট ফেল করছিল। আমার বাবা এই রোগে মারা গেছেন। বুকটায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল; এইটা আমাদের বংশের রোগ।"

এই সময়ে স্বামীজি যে কোনও ডাক্তারকে পরামর্শ করার সুযোগ পাননি তা বেশ স্পষ্ট। বিদেশে তখন পরের দয়ায় খাওয়া-থাকা, সেই সঙ্গে ঘাড়ে চেপেছে ভাই ও গুরুভাইদের দায়িত্ব।

এবার চলে আসা যাক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর স্মৃতিকথায়। স্থান কলকাতা, সময় শনিবার ৫ জুলাই, ১৯০২, ঠিকানা দিদিমার বাড়ি, ৭ রামতনু বসু লেন, বাগবাজার। ভিটেবাড়ি গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিট থেকে সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে বিতাড়িত হয়ে বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দেবী অসহায় পুত্রকন্যাদের নিয়ে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান হিসাবে রামতনু বসু লেনে আশ্রয় নিতেন। এই বাড়িতেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার পরে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। ভূপেন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় বলে গিয়েছেন, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে কেউ কখনও গৈরিক বেশ পরিহিত নরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখেনি।

ভূপেন্দ্রনাথ লিখছেন : 'এক সকালে স্বামীজির সেবক ব্রহ্মচারী নাদু (হরেন) স্বামীজির মৃত্যু সংবাদ নিয়ে আসেন। আমি মাকে এবং দিদিমাকে এই শোকসংবাদ জানালাম। মা জানতে চাইলেন, হঠাৎ কী হল, আমি বললাম, "বাবার যা হয়েছিল।" তাঁরা শোকবিহ্বল হয়ে পড়লেন, পাড়ার একজন ভদ্রমহিলা এসে তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।'

স্বামীজির প্রথম ও শেষ হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে আরও একটি সামান্য অ্যাটাকের অস্পষ্ট উল্লেখ সংগ্রহ করা গিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ তখন

কিংবদন্তি ফরাসি গায়িকা মাদাম এমা কালভের অতিথি হয়ে মিস ম্যাকলাউড-এর সঙ্গে মিশর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্যারিস থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২৪ অক্টোবর ১৯০০। ভুবনবিদিত ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে। মাদাম কালভে একবার প্রাণঘাতিণী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, বিবেকানন্দর সান্নিধ্যে তিনি নবজীবন লাভ করেন, অতএব অতিথির আদর আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি হওয়ার কথা নয়।

যাত্রীরা অবশেষে কায়রোয় উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে কী ঘটল? এখনও পর্যন্ত হাতে কলমে কোনও প্রমাণ নেই, কিন্তু স্বামীজির পারিবারিক সূত্রে একটা কথা ভেসে বেড়িয়েছে অনেকদিন, ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথের নিতান্ত আপনজন এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রকাশক প্রয়াত রঞ্জিত সাহা শুনেছেন, স্বামীজিকে শুধু চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়নি, তাঁকে কায়রোতে সামান্য সময়ের জন্য হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলার আগেই রঞ্জিত সাহা দুর্ভাগ্যক্রমে দেহরক্ষা করেন। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে সমস্ত জীবনে কলকাতায় অথবা স্বদেশে কিংবা বিদেশে বারবার অসুস্থতার সংবাদ থাকলেও, কোথাও স্বামীজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়নি। এতদিন পরে কায়রো সূত্রে কোনও খবর পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। খবর কিছু থাকলে তা রয়েছে মাদাম কালভের অথবা মিস ম্যাকলাউডের অপ্রকাশিত কাগজপত্রে।

হাসপাতালের ব্যাপারে যাই হোক, মাদাম কালভে গানের আসর থেকে ফিরে বান্ধবীর কাছে শুনলেন স্বামীজি খুব মনমরা অবস্থায় রয়েছেন এবং যাত্রাভঙ্গ করে দেশে ফিরতে চাইছেন। প্রশ্নের উত্তরে বিষণ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, "আমি দেশে ফিরতে চাই মরবার জন্য, আমার গুরুভাইদের কাছে যেতে চাই আমি।" এর পরই বিস্ফোরণ। এমা কালভেকে স্বামীজি জানালেন, ৪ঠা জুলাই আমার মৃত্যু হবে।

মাদাম কালভের দেওয়া অর্থে টিকিট কিনে স্বামী বিবেকানন্দ রুবাত্তিনো জাহাজে চড়লেন মুম্বইয়ের উদ্দেশে। বান্ধবী সারা বুলকে তখন লেখা মিস ম্যাকলাউডের একটা চিঠির ফুটনোটের প্রতি আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষিত হচ্ছে : "স্বামীজির খবর ভালো নয়। তাঁর আর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।" সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'আর একটা হার্ট অ্যাটাক'। এর মানে কি এইটাই দ্বিতীয় আক্রমণ? সেক্ষেত্রে বেলুড়ে ৪ জুলাই ১৯০২ সন্ধ্যায় তৃতীয় হার্ট অ্যাটাকেই কি তাঁর মর্ত্যলীলার অবসান?

বোম্বাই হয়ে স্বামীজি আচমকা বেলুড় মঠে ফিরলেন রবিবার ৯ ডিসেম্বর ১৯০০। হাওড়া স্টেশনেও কেউ তাঁকে রিসিভ করতে যাননি, নিজেই একটা গাড়ি ভাড়া করে বেলুড়ে পৌঁছে, গেট টপকে যখন মঠের ভিতরে ঢুকলেন তখন সন্ন্যাসীদের সন্ধ্যা-আহার শুরু হতে চলেছে। আমাদের চোখে জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের শুরু এই দিন থেকেই, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ৪ জুলাই ১৯০২।

প্রশ্ন ওঠে, কেন এবং কীভাবে স্বামী বিবেকানন্দ এত কম সময়ে চলে গেলেন? অতি পরিশ্রমে তিনি কি নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করলেন? না সময়মতো সমকালের সেরা চিকিৎসা তাঁর জন্য জোগাড় করা অনুরাগীদের পক্ষে সম্ভব হল না? না, সচ্ছল পরিবারে পরম স্নেহে লালিত শরীর ভোজনং যত্রতত্র ও শয়নম হট্টমন্দিরের ধাক্কা সহ্য করতে পারল না? না, মৃত্যুকে তিনি স্বেচ্ছায় ডেকে আনলেন নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে?

স্বামীজির পৌরুষময় শরীর। রোমাঁ রোলাঁর বর্ণনায়—মল্লযোদ্ধার মতো সুদৃঢ় শক্তিশালী ও সুদীর্ঘ (পাঁচফুট সাড়ে আট ইঞ্চি), ওজন ১৭০ পাউন্ড। রোলাঁর কলমে—প্রশস্ত গ্রীবা, বিস্তৃত বক্ষ, সুদৃঢ় গঠন, কর্মিষ্ঠ পেশল বাহু, শ্যামল চিক্কণ ত্বক, পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সুবিস্তৃত ললাট, কঠিন চোয়াল, আর অপূর্ব আয়ত পল্লবভারে আনত ঘনকৃষ্ণ দুটি চোখ। তাঁর ভাই মহেন্দ্রনাথ আরও কিছু বিবরণ রেখে গিয়েছেন—পায়ের তলার সামনেটা আর পিছনটা মাটিতে ঠেকতো না (খড়ম পা), পাতলা, সরু ও লম্বা এই পা, হাতের আঙুল সরু, লম্বা ও অগ্রভাগ ছুঁচাল, হাতের নখ মুক্তার মতো উজ্জ্বল, কিঞ্চিৎ রক্তাভ। গোল, পুরুষ্ট মুখ, পাতলা ঠোঁট যা ইচ্ছামতো দৃঢ় করতে পারতেন। সিঙ্গি নাক—অর্থাৎ উন্নত, ইচ্ছা করলে নাক কুঁচকে উপরের দিকে তুলতে পারতেন। সুডৌল, সরু লম্বা হাত।

মাথার পিছন দিকটা চ্যাপ্টা। মাথার ব্রহ্মতালু উঁচু যা দার্শনিক ও জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ।

পশ্চিমের লেখকরা অত্যন্ত সাবধানী, রোমাঁ রোলাঁর রায় "অতি পরিশ্রমে" তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন আরও সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁর অনুসন্ধান অনুযায়ী, পারিবারিক বহুমূত্র রোগের প্রথম লক্ষণগুলি, যখন তাঁর বয়স সতেরো আঠারো, তখনই দেখা যায়। স্বামাজির তরুণ বয়সে ডায়াবিটিসের লক্ষণ সম্পর্কে কোনও তথ্য আমি অন্যত্র খুঁজে পাইনি। প্রথমবার মার্কিন দেশে থাকাকালীন নামী ডাক্তারদের স্নেহসান্নিধ্যও হয়েছে, কিন্তু কোথাও ডায়াবিটিসের উল্লেখ নেই।

স্বামীজির আরও দুটি রোগের উল্লেখ করেছেন রোলাঁ—বারবার ম্যালেরিয়া রোগে মারাত্মকভাবে পীড়িত হন ও আরেকবার তীর্থভ্রমণকালে ডিপথেরিয়া। ধৈর্য ধরে ইদানীং যে বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা গিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে স্বামীজি অন্তত বত্রিশটি রোগের শিকার হয়েছিলেন। এর তালিকা অচেনা অজানা বিবেকানন্দ বইতে নিবেদন করা গেছে।

স্বামীজি শেষবারের মতো দেশে ফিরে আসার পরে তাঁর শরীরের অবস্থা কেমন সে সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর করব।

তার আগে উল্লেখ প্রয়োজন স্বামীজির অসামান্য মনোবলের, যার তেজে রোগজীর্ণ শরীর নিয়েও তিনি অসম্ভব সব কাজ করে যেতে পারলেন।

দ্বিতীয়বার বিদেশ যাওয়ার আগে ১৮৯৭ সালে ২০ মে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আলমোড়া থেকে স্বামীজি লেখেন, "তুমি ভয় পাও কেন? ঝট্ করে কি দানা মরে? এই তো বাতি জ্বললো, এখনও সারারাত্রি গাওনা আছে।"

আর এক গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্বামীজি লিখছেন, "শরীর তো যাবেই, কুঁড়েমিতে কেন যায়? মরচে পড়া মড়ার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ঢের ভালো। মরে গেলেও হাড়ে ভেলকি খেলবে।" একই বছরে (২৮ এপ্রিল) দার্জিলিং থেকে মেরি হেলকে স্বামীজির চিঠি : "আমার চুল গোছা

গোছা পাকতে আরম্ভ করেছে এবং মুখের চামড়া অনেক কুঁচকে গেছে...আমার বয়েস যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। (এই সময় স্বামীজির বয়স ৩৪)।"

পরের মাসে (২৯ মে) প্রিয় শশী ডাক্তারকে আলমোড়া থেকে স্বামীজির চিঠি। "যোগেন কি লিখছে তা ভ্রূক্ষেপ করবে না।" মুখে যাই বলুন, ভিতরে ভিতরে তাঁর চিন্তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ৩ জুন ১৮৯৭-তে আমেরিকান ভক্তকে লেখা চিঠিতে : "যদি শেষ পর্যন্ত আমার স্বাস্থ্য ভেঙেই পড়ে, তা হলে এখানে কাজ একদম বন্ধ করে দিয়ে আমি আমেরিকায় চলে যাব। তখন আমাকে আহার ও আশ্রয় দিতে হবে—কেমন পারবে তো?"

রবিবার ৯ ডিসেম্বর ১৯০০ সন্ধ্যায় যে-মানুষটি বিদেশ থেকে ফিরে সকলের সঙ্গে প্রাণভরে খিচুড়ি খেলেন তাঁর মধ্যে গুরুভাইরা তেমন কোনও অসুস্থতার লক্ষণ দেখতে পাননি। কিন্তু খেতড়ি নরেশকে বিবেকানন্দ তখনই জানাচ্ছেন, "আমার হার্ট খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে... আমার মনে হচ্ছে, এ জীবনে যা করার ছিল তা শেষ হয়েছে।"

ডিসেম্বরে মায়াবতীতে বসে প্রিয় শিষ্য বিরজানন্দকে স্বামীজি বললেন, "শরীরটাকে বেজায় কষ্ট দিয়েছি, তার ফল হয়েছে কি? না জীবনের যেটি সবচেয়ে ভালো সময় সেখানটায় শরীর গেল ভেঙে।"

পরের মাসেও খবর ভালো নয়। "মঠে যে-মুহূর্তে পদার্পণ করি, তখনি আমার হাঁপানির কষ্টটা ফিরে আসে, এ স্থান ছাড়লেই আবার সুস্থ।" মার্চ মাসে ঢাকা ভ্রমণকালে এক বারাঙ্গনা করুণভাবে স্বামীজির কাছে হাঁপানির ওষুধ ভিক্ষা করছে। স্বামীজি সস্নেহে বলছেন, "এই দেখ, মা! আমি নিজেই হাঁপানির যন্ত্রণায় অস্থির। যদি আরোগ্য করার ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি আর এই দশা হয়!"

ঢাকা ও কামাখ্যায় স্বামীজির শরীর ক্রমশ কীভাবে খারাপ হয় তার বিবরণ আছে প্রমথনাথ বসুর বিবেকানন্দ জীবনীতে। গৌহাটির স্বাস্থ্যবিপর্যয়ে লক্ষ্য স্থির হল ৩৬ মাইল দূরে শিলং, সেখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। চিফ কমিশনার স্যর হেনরি কটন অসুখের কথা শুনে স্থানীয় সিভিল সার্জেনকে

স্বামীজির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রমথনাথ বসুর সংযোজন, ঢাকা থেকে বহুমূত্রের সঙ্গে হাঁপানির প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল, শিলং-এ এসে তা আরও ভীষণভাব ধারণ করল। শ্বাসগ্রহণের সময় অসহ্য কষ্ট। কতকগুলো বালিশ একত্র করে বুকের উপর ঠেসে ধরতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে প্রায় একঘণ্টা পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতেন। এইখানেই শিষ্যগণ শুনেছিলেন, তিনি অনুচ্চ স্বরে বলছিলেন, যাক, মৃত্যুই যদি হয় তাতেই বা কী এসে যায়? যা দিয়ে গেলুম দেড় হাজার বছরের খোরাক।

শিলং-এ স্বামীজির শরীরে অ্যালবুমিনও বেড়েছিল, শরীর দ্বিগুণ ফুলে যায় বলে শোনা যায়। এই শিলং-এ যে ছবি তোলা হয়েছিল অদ্বৈত আশ্রমের সংগ্রহে এইটাই এখনও পর্যন্ত স্বামীজির শেষ ফটোগ্রাফ। এই ছবিতে তিনি কিন্তু শীর্ণকায়—শরীর ফুলে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কেউ কেউ তাই সন্দেহ করেন এই ছবি শিলং-এ নয়, দেওঘরে তোলা।

১২ মে ১৯০১ সালে স্বামীজি আবার গৌহাটি হয়ে ট্রেনে কলকাতায় ফেরেন। মঠে অবস্থানকালে সমাজের কোনও ধার না ধরে, স্বামীজি খুশিমতো ঘুরে বেড়াতেন, কখনও চটি পায়ে, কখনও খালি পায়ে, কখনও গেরুয়া পরে, কখনও বা শুধু কৌপীন এঁটে। অনেক সময় হতে একটা হুঁকো বা লাঠি থাকত। কিন্তু পা ফুলে শোথের লক্ষণ দেখা দিল, হাঁটতে কষ্ট হতো।

জুন মাসে কবিরাজি চিকিৎসার কথা উঠল। স্বামীজির খুব উৎসাহ ছিল না, কিন্তু স্বামী নিরঞ্জনানন্দের উৎসাহে বউবাজারের মহানন্দ সেনগুপ্ত মহাশয়কে ডাকা হলো। তিনি এসেই লবণ-সংযুক্ত ব্যঞ্জনের ব্যবহার ও জলপান নিষেধ করলেন। যিনি বহুবার জল খেতেন, তিনি অবিশ্বাস্য মনোবলে জলপানের অভ্যাস ত্যাগ করলেন। এই সময় স্বামীজির আহার খুব কমে গিয়েছিল।

অক্টোবরে স্বামীজির অবস্থা আবার আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন না। খ্যাতনামা সায়েব চিকিৎসক ডাক্তার সন্ডার্সকে দেখানো হলো, তিনি সবরকম দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম নিষেধ করলেন।

সেই সময় পোষা জন্তু জানোয়ার পাখিদের নিয়ে বেলুড়ে স্বামীজি অন্য জীবন কাটাতে আরম্ভ করলেন। এই সময়ে চিঠিতে তিনি লিখছেন, "আমার চিড়িয়াখানায় মুরগি নেই, ওই জীব এখানে নিষিদ্ধ।"

নভেম্বরের শেষে স্বামীজি চিঠি লিখছেন, "ডান চোখটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না!" চোখের ডাক্তারের কাছে যাবেন, কিন্তু সর্দিতে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন, সেই সঙ্গে হাঁপানির দাপট।

১২ ডিসেম্বর ১৯০১-এর খবর স্বয়ং স্বামীজি দিচ্ছেন সিস্টার ক্রিশ্চিনকে। "তুমি তো জানো, গত তিনবছর ধরে আমার প্রায়ই অ্যালবুমিন-ইউরিয়া হচ্ছে। কিডনির স্ট্রাকচারাল কোনও দোষ নেই, কিন্তু তাঁরা প্রায়ই অ্যালবুমিন বার করছেন। ডায়াবিটিসের সুগার বেরনো থেকে এটা অনেক খারাপ। অ্যালবুমিন রক্তকে বিষময় করে, হার্ট অ্যাটাক করে, সেইসঙ্গে আরও নানা ক্ষতি হতে পারে। ঘন ঘন সর্দি লাগার আশঙ্কাও থেকে যায়।" ডান চোখেও স্বামীজি দেখতে পাচ্ছেন না, ডাক্তাররা বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন। মাংস খাওয়া বারণ, হাঁটা বারণ, দাঁড়ানো বারণ, এমনকী, লেখাপড়া বারণ।

এক সপ্তাহ পরের রিপোর্ট, "আমি বিশ্রাম নিতে আরম্ভ করলেই অ্যালবুমিন ও সুগার উধাও হয়ে যায়।" জানুয়ারির শেষে শরীরের এমনই উন্নতি হলো যে স্বামীজি জাপান ও চিন যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু মার্চ ১৯০২তে নিবেদিতাকে লেখা চিঠিতে আবার অবনতি সংবাদ। বারাণসী থেকে রোগজর্জরিত বিবেকানন্দ অনুরোধ করছেন, "যদি আমার দেহাবসান হয় (বারাণসীতে সেটা হোক আমি তো চাইব) দয়া করে আমাকে লেখা ক্রিশ্চিনের চিঠিগুলো অবশ্যই তুমি খুলবে, তাকে তুমি অবশ্যই অভ্যর্থনা করবে এবং তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যদি ওর কাছে টাকা না থাকে, অবশ্যই টিকিট কেটে দেবে—এর জন্য যদি ভিক্ষে করতে হয় তাও করবে। আমি ইউরোপ থেকে সামান্য যে টাকা এনেছিলাম তা মায়ের খাওয়া দাওয়া এবং দেনা শোধ করতে লেগে গিয়েছে। যতটুকু আছে তাতে হাত দিতে পারছি না, যে মামলাটা ঝুলে আছে তাতে লেগে যাবে।"

মহানির্বাণের সময় আর দূরে নয়। ২৭ মে ১৯০২ ক্রিশ্চিনকে বেলুড় থেকে স্বামীজি জানাচ্ছেন, তাঁর লিভারের উন্নতি হয়েছে। সেইসঙ্গে কিছু খারাপ খবর, একটা ছাগলছানা মাছের চৌবাচ্চায় ডুবে মরেছে।

২১ জুন ক্রিশ্চিনকে স্বামীজি জানাচ্ছেন, উদ্বেগের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। ডাক্তাররা সব কিছু খেতে বলেছেন, কিন্তু স্বামীজি খুব ভেবেচিন্তে খাওয়াদাওয়া করছেন। চিঠির শেষে একটি 'পুনঃ'—"আমার শরীরে চর্বি জমছে—বিশেষ করে পেটে। ভয়াবহ দৃশ্য!"

"আমার কথাটি ফুরলো নটে গাছটি মুড়লো" এই ছড়াটির ইংরেজি তর্জমা করে সদ্য ভারতে-আসা ক্রিশ্চিনের সঙ্গে স্বামীজি রসিকতা করেছিলেন। ২১ জুন ১৯০২ তারিখে চিঠিটাই ক্রিশ্চিনের কাছে স্বামীজির শেষ চিঠি।

এই জুন মাসের ২৭ তারিখে রোগজর্জরিত স্বামীজির এক শান্তপ্রসন্ন স্নেহময় ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রিয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর রচনায়। অফিসের পোশাকেই শিষ্যকে বেলুড়ে দেখে স্বামীজি বললেন, "তুই কোটপ্যান্ট পরিস, কলার পরিস না কেন?" স্বামী সারদানন্দকে ডেকে বললেন, "আমার যেসব কলার আছে, তা থেকে দুটো কলার কাল একে দিস তো।" আরও আধঘণ্টা পরে স্বামীজি ধ্যানস্থ, বাহ্যচেতনাহীন। আরও পরে শিষ্য লক্ষ্য করলেন, "স্বামীজির বদ্ধ পাণিপদ্ম কম্পিত হইতেছে।"

শেষপর্বে স্বামীজির নানা রোগের তালিকায় আর একটি সংযোজন উদরী, অর্থাৎ পেটে জল হওয়া। রোগাক্রান্ত, বিনিদ্র, ধৈর্যচ্যুত, তিতিবিরক্ত যে বিবেকানন্দকে আমরা দেখতে পাই তিনি প্রায়ই প্রিয়জনদের এমনই বকাবকি করেন যে তাঁদের চোখে জল এসে যায়। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বলেছিলেন, "তাঁর বকুনি সহ্য করতে না পেরে আমারই কতবার মনে হয়েছে মঠ ছেড়ে চলে যাই। একদিন বকুনি খেয়ে দুঃখে অভিমানে দরজা বন্ধ করে কাঁদছি, কিছুক্ষণ পরে স্বামীজি দরজায় টোকা মারছেন, দরজা খুল্লুম।...স্বামীজি বলতে লাগলেন, 'আমি কী করব, আমার শরীরটা চব্বিশ ঘণ্টাই জ্বলছে, মাথার ঠিক থাকে না।'

এর পর স্বামীজি তাঁর প্রিয় বন্ধু ও গুরুভাইকে যা বলেছিলেন তা

আজও হৃদয়কে নাড়া দেয়। "আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের হয়তো বৃথা কষ্ট দেব। দেখ রাজা একটা কাজ করতে পারো? ওদের রেসিং হর্স যখন অকেজো হয়ে পড়ে তখন কী করে জানো? তাকে বন্দুকের গুলিতে মেরে ফেলে। আমি তোমাকে একটা রিভলভার জোগাড় করে দেব, তুমি আমাকে গুলি করে মারতে পারবে? আমাকে মারলে কোনও ক্ষতি হবে না, আমার কাঁজ ফুরিয়ে গেছে।"

বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত স্বামীজি একান্ত সেবক ছিলেন স্বামী নির্ভয়ানন্দ, পূর্বাশ্রমে নাম কানাই সেন। স্বামীজির প্রধান সমস্যা ছিল বিনিদ্রা, একেবারেই ঘুমোতে পারতেন না। কানাই মহারাজের মুখে শোনা যাক স্নেহময় সন্ন্যাসীর একটি অপ্রচলিত গল্প। "শরীর যাবার কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে একটি স্প্রিং-এর খাট উপহার এসেছিল। এর আগে ক্যাম্প খাটে শুতেন। নতুন খাট দেখে একদিন রহস্য করে বলেছিলাম, 'মশায় এখন তো আপনি বেশ আরামে ঘুমোচ্ছেন।' তা শুনেই স্বামীজি বললেন, 'তবে রে শালা! আজ তোকে এই খাটে শুতে হবে।' এই বলে জোর করে আমাকে ওই খাটে শোয়ালেন। কিন্তু আমার কি এতে ঘুম হয়। স্প্রিং-এর খাট, এক একবার নিচে নেমে যাচ্ছে আর আমি লাফিয়ে উঠছি। সকালে স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে কেনো, কাল রাতে তোর কেমন ঘুম হল? বেশ মজা করে ঘুমিয়েছিস তো?" আমি বললাম, "আর বলবেন না।" স্বামীজি, "তবে রে শালা, তুই যে বলেছিলি আমার মজা করে ঘুম হয়! এখন বুঝলি তো?"

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেষ দিনে ঘটনার বিবরণ ইতিমধ্যেই সযত্নে সাজানো হয়েছে। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা 'অচেনা অজানা বিবেকানন্দ' বইটির শেষ পর্ব পড়ে দেখতে পারেন। ওখানে বলা আছে, বেলুড় বাজার পর্যন্ত দু'মাইল বেড়িয়ে সন্ধ্যায় কয়েকজন সন্ন্যাসীকে চা খেতে দেখে, স্বামীজি নিজে এক কাপ চা চাইলেন।

সেবক কানাই মহারাজের বিবরণ একটু আলাদা। "বিকেলে আমি ও হুটকো গোপালের দাদা চা খাচ্ছি, তখন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে নিয়ে বেলুড় বাজারের দিকে বেড়াতে যাচ্ছিলেন স্বামীজি। আমাদের চা খেতে

দেখে কাছে এসে বললেন, "কি কেনো, কি খাচ্ছ?" আমি বললাম, 'মশায়, একটু চা।' তাই শুনে বললেন, "আমায় একটু দেবে না?" আমি তো জানি তিনি কিরূপ চা খান। তাই একটু গরম জলের সঙ্গে একটু দুধ মিশিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরলাম। তিনি তাতে দু-এক চুমুক দিয়ে বললেন, "বেড়ে তো।" এই বলেই তিনি কাপটি নিয়ে বেড়াতে গেলেন কিন্তু তাতে যে একটুও চা নেই সেদিকে তাঁর হুঁশই ছিল না।" এই হল কানাই মহারাজের শেষ বিবেকানন্দ সেবা।

নিজের ঘরে সন্ধ্যা সাতটায় জপধ্যান শুরু করলেন স্বামীজি, এবং এক তরুণ সেবক বাঙাল ব্রজেন্দ্রকে বললেন, আমাকে দু'ছড়া মালা দে, যা বাইরে গিয়ে জপধ্যান কর। না ডাকলে আসবি না।

সন্ধ্যা ৭.৪৫: ব্রজেন্দ্রকে স্বামীজি বললেন, গরম বোধ হচ্ছে, জানলা খুলে দাও। মেঝেতে শুয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ, হাতে জপমালা। একটু পরে বললেন, আর বাতাস করতে হবে না। একটু পা টিপে দে।

রাত ন'টা: চিত হয়ে শুয়ে থাকা স্বামীজি বাঁ পাশে ফিরলেন। কয়েক সেকেন্ড তাঁর ডান হাত একটু কাঁপল। স্বামীজির কপালে ঘামের ফোঁটা। এবার শিশুর মতো কান্না।

রাত ৯.২ থেকে ৯.১৫: গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। মিনিট দুই স্থির, আবার গভীর দীর্ঘশ্বাস। মাথা নড়ে উঠল, মাথা বালিশ থেকে পড়ে গেল। চোখ স্থির, মুখে অপূর্ব জ্যোতি ও হাসি।

এবার শোনা যাক কানাই মহাবাজের দুঃখের কথা। "ঐদিনটিতে আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ কবায় আমি তাঁর সেবা না করে ব্রজেন বলে একটি নতুন ব্রহ্মচারীকে তাঁর সেবার ভার দিয়েছিলুম। ব্রজেন এসে আমাকে বলল যে শীঘ্র আসুন, দেখুন স্বামীজির কী অবস্থা হয়েছে। তখন দেখলাম স্বামীজি তাঁর ক্যাম্পখাটটিতে দক্ষিণ পাশ ফিরে শুয়ে আছেন এবং তাঁর ডান নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে উপস্থিত সকল মহারাজকে ডেকে আনলাম।"

তখন সময় ৯.৩০। স্বামী বোধানন্দ নাড়ি ধরে কিছুক্ষণ দেখে, দাঁড়িয়ে উঠে কেঁদে ফেললেন। একজন বললেন, যাও মহেন্দ্র ডাক্তারকে ডেকে

আনো। ক'দিন তিনিই চিকিৎসা করছিলেন। ডাক্তার মজুমদার থাকতেন নদীর ওপারে বরাহনগরে। স্বামী প্রেমানন্দ ও স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সমাধি ভাঙানোর জন্য কানে রামকৃষ্ণ নাম শোনাতে লাগলেন।

শেষের সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা স্বামী সারদানন্দ কেউ মঠে উপস্থিত ছিলেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন বলরাম মন্দিরে এবং স্বামী সারদানন্দ বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে। কৃত্রিম উপায়ে হার্ট সচল করার চেষ্টা চলল। ডাক্তার মজুমদার ও তাঁরা দু'জন রাত সাড়ে দশটায় প্রায় একসঙ্গে উপস্থিত হলেন। রাজা মহারাজ এসেই দৌড়ে গিয়ে দেহের উপর হুমড়ি খেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

রাত ১২টা : ডাক্তার মজুমদার জানালেন, স্বামীজি আর ইহলোকে নেই। হঠাৎ হার্ট বন্ধ হওয়াই স্বামীজির দেহাবসানের কারণ। পরের দিন সকালে ডাক্তার বিপিন ঘোষ বললেন, সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ হয়েছে। কেউ কেউ বললেন, মাথার ভিতর কোনও শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে।

স্বামীজির ডেথ সার্টিফিকেট খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেখানে কী অসুখের উল্লেখ ছিল তা আর জানবার উপায় নেই। উদ্বোধন পত্রিকায় স্বামীজির দেহাবসানের যে সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে, তিনমাস ধরে গুরুতর অ্যালবুমেনিউরিয়া রোগে ভুগছিলেন।

স্বামীজির পত্রাবলী ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আমরা শুধু বুঝি, মৃত্যুকে সাদর আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। মার্কিন অনুরাগী মিস্টার ফক্সকে তিনি লিখেছিলেন, "আমার শরীর দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। মহিমকে মাকে এবং সংসারকে দেখার ভার নেবার জন্য তৈরি হতে হবে। আমি যে কোনও সময় চলে যেতে পারি।" এই চিঠি লেখার কারণ ভাই মহেন্দ্রনাথ তখনও উধাও। ইউরোপ থেকে পায়ে হেঁটে দেশে ফিরতে ফিরতে কয়েক বছর তিনি মা ভাই দাদা কাউকে চিঠি লেখেননি। সেজন্য স্বামীজির দুঃখের অন্ত ছিল না। প্যারিস থেকে প্রিয় হরিভাইকে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) দুঃখী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "আমার কাজ আমি করে দিয়েছি বস্। গুরু মহারাজের কাছে ঋণী ছিলাম—প্রাণ বার করে আমি শোধ দিয়েছি।"

তিরোধানের শতাব্দী অতিক্রম করেও স্বামীজি প্রবলভাবে বেঁচে রয়েছেন। অকালমৃত্যু তাঁর জয়রথের গতি শ্লথ তো করতেই পারেনি, বরং নতুন শতকে যাঁদের হৃদয়সিংহাসনে তিনি রাজাধিরাজ রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তাঁদের সংখ্যা স্বদেশ এবং বিদেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বলা অত্যুক্তি হবে না, একালের ইতিহাসে এমন বিজয়কাহিনি বিরল। কী এমন ছিল বিবেকানন্দের মধ্যে? কী এমন তিনি দিয়ে গেলেন মানুষকে, যে এমন অঘটন ঘটা সম্ভব হল? যাঁরা নতমস্তকে অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নিজেরাও এ প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর দিতে অক্ষম। তবে তাঁরা বলেন স্বামীজির জীবনই যেমন তাঁর বাণী, তেমন তাঁর বাণীও হয়ে উঠতে পারে নতুন এক ভারতবর্ষের জীবন। নিষ্ঠুর সময় আজও অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দকে সীমিত করতে পারেনি, বরং যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততই তাঁর উপদেশ এবং আহ্বান আরও অর্থবহ এবং সময়োচিত হয়ে উঠছে। নতমস্তকে স্বীকার করে নেওয়া যাক, এ দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা ইদানীং আর ঘটেনি।

ইদানীং যাঁরা বড় হয়ে উঠেছেন তাঁরা যেন মনে না করে বসেন—স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন, দেখেছিলেন এবং মানুষকে জয় করেছিলেন। এই সেদিন কে যেন বলল, তাঁর আবির্ভাব তো আকাশে, সেখান থেকেই বিদ্যুৎ ও বজ্রসম তিনি নেমে এলেন মাটির পৃথিবীতে, সুতরাং কে তাঁকে জীবনের যন্ত্রণা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে? ব্যাপারটা অলৌকিক হলে মন্দ হত না। কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন নিষ্ঠুর সমকাল সন্ন্যাসী বিবেকানন্দকে অত সহজে ছেড়ে দেয়নি। আঘাতে, অপমানে, সন্দেহে এবং অবিশ্বাসে তিনি বারে বারে জর্জরিত হয়েছেন। নীলকণ্ঠের মতো সেই বিষ তিনি ধারণ করলেও, তাঁর মনের কোথাও তা অস্বস্তিকর দাগ রেখে যায়নি, এ কথা জোর করে

বলা চলে না। তাঁর ব্যক্তিগত চিঠির কোথাও কোথাও সেই আহত এবং অপমানিত বিবেকানন্দকে আজও কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা দেখতে পাই।

কত রকমের সেই আঘাত! কখনও যে, ইস্কুলে তিনি পড়ান সেখানকার উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দত্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করছে তিনি পড়াতে পারছেন না, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বাংলার আর এক মহাপুরুষ নির্দেশ দিচ্ছেন, নরেনকে আর পড়াতে না আসতে। কখনও বলা হচ্ছে, বখাটে ছোঁড়াটা গুরুজনদের তাচ্ছিল্য করে মনের সুখে তামাক খাচ্ছে, এবং নাকে নস্যি গুঁজছে। কখনও বলা হচ্ছে—চাকরি না পাওয়ায় বৈরাগ্য! স্বভাবসন্ন্যাসী তিনি অবশ্যই নন, সর্ব অর্থে অভাবসন্ন্যাসী। কখনও বিদেশের মাটিতে স্বদেশের মানুষ ঘরের ছেলেকে সাহায্য না করে কুৎসা প্রচার করছে—বাউণ্ডুলে ডেঁপো ছোকরা, সে আবার ইংরেজি শিখল কবে?

খ্যাতির মধ্যগগনেও আপনজনদের হাতে বিবেকানন্দ-নিগ্রহ শেষ হয়নি, হিসেব চাওয়া হয়েছে, ক'বার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেছ মার্কিন মুলুকে? প্রশ্ন করা হয়েছে, নিষিদ্ধ পানীয়, নিষিদ্ধ মাংস কি ভক্ষণ করেছ? বিস্মিত বিশ্ব সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেও, গেঁয়োযোগীর অগ্নিপরীক্ষা শেষ হতে চায় না। জন্মভূমি কলকাতায় যাঁরা বিবেকানন্দ অভিনন্দনসভার আয়োজন করেন তাঁরাই লজ্জার মাথা খেয়ে খরচের বিলটা তুলে দিচ্ছেন বিশ্বজয়ীর হাতে। এই সেই দেশ, যেখানে তাঁর মঠের বাড়ির ট্যাক্সো তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং মৃত্যুর পরেও পুরসভা গড়িমসি করে বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে দাহকার্য সম্পন্ন করার অনুমতি দিতে।

মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার জন্য যাঁদের জন্ম, তাঁদের সব যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা দেহাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না, তাই সন্ধ্যায় শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেও পরের দিন মহানগরীর সংবাদপত্রে স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক অকালপ্রয়াণ সম্পর্কে কোনও খবর থাকে না, বিশ্ববিশ্রুত সন্তানের স্মরণসভার আয়োজন করতেও লম্বা সময় লেগে যায় এবং স্মৃতিসভায় প্রতিশ্রুতি-দেওয়া সামান্য আর্থিক দানের বড় অংশ শেষ পর্যন্ত

সংগৃহীত হয় না এবং আরও কত কী!

তবু কী আশ্চর্য! নিবিড় ঘন অন্ধকারে আকাশের বিদ্যুৎ ঝলকের মতন মহামানব বিবেকানন্দের বাণী আজও পৌঁছে যায় হতোদ্যম মানুষের হৃদয়ে। নতুন করে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর অনেক বক্তব্যকে যা তাঁর জীবিতকালে পরিপূর্ণ বোঝা যায়নি। যাঁরা খোঁজ করেন, তাঁরা বুঝে নিয়েছেন, বিবেকানন্দকে ঠিকমতন বুঝতে আমাদের আরও এক হাজার বছর লেগে যাবে। হাজার বছরের হিসেবে হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে একজন বিবেকানন্দ এক জীবনে মানুষকে কী দিয়ে গেলেন?

কিন্তু একই সঙ্গে চলেছে উল্টোদিকের প্রবাহ! সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু কিছু সন্দেহবাদী স্বদেশবাসী নিজের দেশে বসে অথবা প্রবাসের দূরত্ব বজায় রেখে দুর্নামের ওভারটাইম খেটে চলেছেন, স্বভাবসন্ন্যাসীটি যে আসলে অভাবসন্ন্যাসী তা প্রমাণ করার জন্য। চোখে চশমা লাগিয়ে, অনেক মাথা খাটিয়ে, পুরনো খবরের কাগজ ঘেঁটে তাঁরা প্রমাণ করবেনই, দুনিয়ার লোকরা একশ' বছর ধরে মস্ত ভুল করে চলেছেন এমনভাবে বিবেকানন্দ-বন্দনা চালু রেখে। এঁদের চেষ্টা, লোকের কানে কানে বলা, বিবেকানন্দ আবার মহাজ্ঞানী হলেন কবে? নরেন্দ্রনাথ 'ইন্টেলিজেন্ট' ছিলেন, কিন্তু কৃতী ছাত্র তো ছিলেন না, এফ এ এবং বি এ পরীক্ষায় সেকেন্ড ডিভিশন নম্বর কেন? কথামৃত মন দিয়ে পড়লেই নাকি নজর এড়ায় না যে, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে বড্ড বেশি প্রশ্রয় দিতেন, গান শুনে গদগদ হয়ে মন্দিরের ছোট ভট্চাজ্যি বলে বসলেন, নরেন ধ্যানসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ এবং ঈশ্বরকোটী। আরও একটি নিষ্ঠুর ইঙ্গিত, ঠাকুরের দেহাবসানের পর, বরাহনগরের যে কৃচ্ছ্রসাধনা তার মূলে তাঁর পারিবারিক অশান্তি এবং অর্থাভাব!

এতেও মন ভরছে না একাল ও সেকালের নিন্দুকদের। কেন বিবেকানন্দ বললেন, ভাল রাঁধতে না জানলে ভাল সাধু হওয়া যায় না? বিদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে স্বদেশে তাঁর পরিব্রাজক জীবনটা এক ধরনের 'হিচ হাইকিং' ছাড়া কিছু নয়। এঁদের নিবেদন, উত্তর ও দক্ষিণ

ভারতের সম্ভ্রান্ত লোকরা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে দিতেন, সুতরাং কষ্ট কোথায়? কেন তিনি এত লঙ্কা খেতেন? উত্তর কলকাতার এই সুখী গ্র্যাজুয়েট ভদ্রলোকটি তো গরমের আতঙ্কে রাজপুতানায় আসতেই চাননি! ভক্তরা তাদের বইতে যতই তাঁকে মহাযোগী অ্যাখ্যা দিক, আসলে সংসারের আর্থিক হাঙ্গামা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সন্ন্যাসীর নিশ্চিন্ত জীবনযাপন!

শুনুন আরও একটা অভিযোগ! স্বামীজি বিদেশে বললেন, ইংল্যান্ডের মাতালের সংখ্যার তুলনায় ভারতে মাতালের সংখ্যা অনেক কম! ওখানে চারশ' জনে একজন, আর স্বদেশে দশ লাখে একজন! সঙ্গে সঙ্গে নিন্দুকদের পাল্টা আঘাত, বিবেকানন্দের সমকালীন কলকাতায় সব 'ভদ্রলোকই' তো মাতাল! ভারতীয়ত্বের যেসব গুণকীর্তন বিবেকানন্দ বিদেশে করেছেন সেসবই বাজে! বিবেকানন্দ কেন সমাজতন্ত্রের গুণগান করেছেন? এ নিয়ে বেজায় গোঁসা কিছু পণ্ডিতের! কোথাকার কোন রাশিয়ান বিবেকানন্দর এই সোশ্যালিজমকে আবছা এবং অস্পষ্ট বলায় তাঁদের বেজায় আনন্দ।

এহেন বিবেকানন্দ কী করে বিশ্ব বিজয় করলেন তা নিয়ে সন্দেহের অভাব নেই। প্রবাসে তিনি বক্তব্যের জন্য বিজয়ী হননি, সরলমনা বিদেশিনীদের মনোহরণ করেছিলেন তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য এবং বাচনভঙ্গি দিয়ে। তাঁর শিকাগো বক্তৃতায় নাকি আধ্যাত্মিক নতুনত্ব একফোঁটাও ছিল না, বরং ভারত সম্বন্ধে অনেক অবান্তর এবং অবাস্তব দাবি ছিল, সেই জন্যেই শিকাগোতে হাততালি পড়েছিল, তবে একই সভায় আরও বেশি হাততালি পেয়েছিলেন কলকাতার আর এক বক্তা প্রতাপ মজুমদার! অর্থাৎ বক্তব্যের জন্য নয়, বলার স্টাইলের জন্যই শিকাগোয় শিহরন। সেইসময় বারবার এই ধরনের নানা অভিযোগে জর্জরিত হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। নিগৃহীত হয়েছিলেন কয়েকজন স্বার্থান্ধ যাজকের হাতেও, এখন নিগৃহীত হচ্ছেন নিজের দেশের নিন্দুকদের হাতে। মৃত্যুর একশ বছর পরেও এঁদের দুঃখের শেষ হল না, কেন একজন সেকেন্ড ডিভিশন গ্র্যাজুয়েটকে 'নীলোৎপলনয়ন' 'বাক্‌পতি' ইত্যাদি বলা হয়েছিল?

সমকালের নিন্দুকরা কীভাবে বিবেকানন্দনিগ্রহে মেতেছিলেন পাঠক পাঠিকারা তার বিস্তারিত বিবরণ পাবেন নানা গবেষণাগ্রন্থে। মিশনারিদের দেওয়া মিথ্যা বদনামের কথা ভাবতে লজ্জা লাগে। বিবেকানন্দ নাকি দুশ্চরিত্র। সন্ন্যাসীর নিজের লেখা থেকে শুনুন : "কখনও কখনও এমন হয়েছে—আমাকে কোনও বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেউ আমার সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা বাড়িওয়ালাকে শুনিয়ে দিয়েছে। তাই শুনে সে দোর বন্ধ করে চলে গিয়েছে, আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি সব ভোঁ-ভোঁ, কেউ নেই।"

প্রবীন প্রতাপ মজুমদার নিজের দেশে ফিরে এসে বলতে লাগলেন, "নরেন, সেই ছোঁড়াটা যে ভ্যাগাবন্ডের মতন পথে পথে ঘুরে বেড়াত, সে এক লম্বা জামা পরে, মাথায় পাগড়ি বেঁধে চিকাগো পার্লামেন্টে তো গিয়ে হাজির।" বিদেশেও প্রতাপ মজুমদার বলতেন, "ছোকরা লেখাপড়া কিছুই জানে না। বোধহয় কোনও বিপদে পড়ে এখানে পালিয়ে এসেছে।"

দেশে ফিরেও বিবেকানন্দের কষ্ট ও অপমানের অবধি ছিল না। সুদূর আমেরিকায় সনাতন ভারতের হৃত গৌরব উদ্ধার করে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, সেই সময় কয়েকজন ভক্তিমতী বিদেশিনী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মুখে-মুখে সেই সময় তাঁর ডাকনাম ছড়ায় বিবি-কা-আনন্দ। সাধে কি আর তিনি এক চিঠিতে দুঃখ করেছেন, "এ দেশ হিংসুক নির্দয় লোকে ভর্তি—যারা আমার কাজ লণ্ডভণ্ড করে দিতে চেষ্টার কসুর করবে না।"

দেশে ফিরে এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল, তার ইঙ্গিতও রয়েছে বিবেকানন্দের চিঠিতে।

উনিশ শতকে যে নিন্দাপ্রবাহের শুরু হয়েছিল একুশ শতকেও তার সম্পূর্ণ অবসান হয়েছে এমন ভাববেন না। সাধ্য থাকলে নিন্দুকেরা প্রমাণ করে দেন, যে-বিবেকানন্দ মঞ্চে দাঁড়িয়ে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন তিনি তো অভিনেতা বিবেকানন্দ। তাঁদের মতের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাঁরা বিভিন্ন স্মৃতিকথার প্রতিটি লাইন আজও তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

শুধু অভিনয়ের অভিযোগ নয়, পাশ্চাত্যের ওপর তাঁর প্রভাবে কতখানি দুধ এবং কতখানি জল তা নিয়ে মাপজোক চলেছে। কয়েকজন স্বার্থপর সায়েব সহজবোধ্য কারণে এই কাজ শুরু করেছিলেন এবং কিছু দেশবাসী সেই দায়িত্ব সানন্দে মাথায় তুলে নিয়েছেন। এঁদের নিবেদন, শিকাগোতে বিবেকানন্দের অভূতপূর্ব সাফল্যের একমাত্র কারণ তাঁর সাদা সিল্কের পাগড়ি! বেনামে লেখা একখানা বইয়ের খোঁজও পাওয়া গিয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে, বিবেকানন্দের সাফল্যের অন্যতম কারণ সরল আমেরিকানদের প্রবল কৌতূহল। অভিনবত্ব দেখলেই মার্কিনরা নাকি ভীষণ আকৃষ্ট হয়, তথাকথিত সন্ন্যাসীর বেশে বিবেকানন্দই নাকি প্রথম ভারতীয়, যিনি আমেরিকায় হাজির হয়েছিলেন।

গরিবের জন্য যিনি সহস্রবার নরকে যেতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁকে বড়লোকের মোসাহেব হিসেবে আঁকবার চেষ্টাও হয়েছে। স্বামীজিকে যাঁরা কদর করেছিলেন তাঁদের অনেকেই যে ধনী তা মিশনারিরা বলেছেন। খবর দিয়েছেন, স্বামীজির অনুরাগীদের তালিকায় দেখা যাচ্ছে ডেট্রয়েটের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী টমাস পামার এবং বিখ্যাত গুডইয়ার টায়ার কোম্পানির ওয়ালটার ও ফ্রাঁস গুডইয়ার, নিউইয়র্কের ধনপতি ফ্রান্সিস লেগেট। সাহেব পাদ্রিদের, প্রচার : এইসব ধনবানদের হাতে ছিল প্রচুর সময় এবং প্রচুর অর্থ, প্রচলিত ধর্মাচরণে সাময়িকভাবে ক্লান্ত হয়ে এঁরা বিকল্প পথের সন্ধান করছিলেন।

সমস্ত তথ্য তন্নতন্ন করে খুঁজে, হন্যে হয়ে নিন্দাবিদরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছেন তা হল, প্রবাসে বিবেকানন্দর বাণীতে কোনও নতুনত্ব ছিল না, যতটুকু সাফল্য তার পিছনে রয়েছে মানুষটির 'ক্যারিশমা', বলবার স্টাইল এবং ভাষার ফুলঝুরি!

শক্ত মানুষ ছিলেন বিবেকানন্দ, ছিল দুর্জয় সাহস। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার লোক তিনি নন, তবু বারবার অন্যায় আঘাতে তিনি যে নীরবে কষ্ট পেয়েছেন, তার ইঙ্গিত রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। একবার বেলুড়ে বিবেকানন্দ বললেন, "ঠাকুরঘরে ঠাকুরের সামনে মার্বেল পাথরটায় জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে রেখে

আয়, মোটে মুছবি না।" বিবেকানন্দ গিয়ে কপাট বন্ধ করে দিলেন, অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বললেন, "দেখছিস না, চারদিকে কী হচ্ছে? সব শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তাই আত্মারামের কাছে গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম, ঠাণ্ডা হবো, সব শরীর জুড়াবো বলে।"

মৃত্যু এসে সাধারণ মানুষকে সব যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তি দিয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী, যাঁদের প্রকৃত বেঁচে থাকা শুরু হয় তিরোধানের মুহূর্ত থেকে, তাঁরা আক্রমণের হাত থেকে কখনও মুক্তি পান না। তাঁদের কপালে যেমন অসংখ্য অনুরাগীর ভালবাসা ও ভক্তি জোটে, তেমনই জোটে অবিরাম, অপ্রত্যাশিত এবং অন্যায্য নিন্দা। যাঁরা শত্রু, যাঁদের তিনি জীবিত অবস্থায় আক্রমণ করতে চেয়েছেন, তাঁরা আক্রমণ করলে বিস্ময়ের বা বেদনার কিছু থাকে না, কিন্তু যাদের জন্য আত্মত্যাগ, যাদের জন্য নিজেকে তিলে-তিলে বিসর্জন দেওয়া, তারা যখন অকারণে আঘাত করে তখন অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করে, কেন এমন হয়? কেন আমরা বারে বারে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করি?

বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের ফুটনোটে একজন বিদগ্ধ বিখ্যাত বাঙালির উল্লেখ করেছেন, যিনি বিবেকানন্দ স্মরণসভায় আসতে রাজি তো হননি, বরং বলেছেন হিন্দু রাজত্ব হলে বিবেকানন্দের প্রাণদণ্ড হতো।

একজন দায়িত্বশীল বিচারক যদি এমন কথা বলতে পারেন, তাহলে ছোট মাপের লোকরা কেন বলবে না, সংসারে ত্যাগ নয়, সংসার থেকে তিনি পালিয়েছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তো তাঁর একখানা ভাঙা তক্তপোশ এবং একটা তুলো বার করা গদি ছাড়া কিছুই ছিল না।

বিবেকানন্দ জীবিত অবস্থায় অনেকের নিন্দাকে গায়ে মাখেননি। প্রকাশ্যেও কোনও মিথ্যা রটনার প্রতিবাদও তিনি পছন্দ করেননি।

সমস্ত ব্যাপারটার দিকে পিছন ফিরে তাকালে মনে হয়, ভালই হয়েছে। কারণ সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর জীবন ও বাণীকে জানবার জন্য, তাঁকে অনুসরণ করবার জন্য আসমুদ্রহিমাচলে কী ব্যাকুলতা!

কেমন করে এই অসাধ্য সাধন হল? আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়,

অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দের মধ্যে পাঁচটি বিবেকানন্দ উপস্থিত রয়েছেন—শিক্ষক বিবেকানন্দ, নেতা বিবেকানন্দ, পরিত্রাতা বিবেকানন্দ, আধ্যাত্মিক বিবেকানন্দ ও সংগঠক বিবেকানন্দ। একই শরীরে এই পাঁচটি বিবেকানন্দের প্রকাশ ও বিকাশ কীভাবে সম্ভব হল, কেমনভাবে রোগজর্জরিত শরীরে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে-করতে পাঁচটি বিবেকানন্দকে তিনি অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত করলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ আজও সম্পূর্ণ লিখিত হয়নি। অতি কঠিন এই কাজ এবং সেই জন্যেই বোধ হয় বিগত এক শতাব্দীতে কেউই বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার দুঃসাহসিক দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে সাহস করেননি।

যে পাঁচটি বিবেকানন্দের উল্লেখ করলাম, তার মধ্যে শেষ বিবেকানন্দটি আমার অতি প্রিয়। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে শিক্ষক, নেতা, পরিত্রাতা এবং অধ্যাত্মবাদীদের সাক্ষাৎ পেলেও সংগঠক আমরা কমই দেখেছি। বরং উনিশ শতকের প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের অনেকেই সৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয়েও সংগঠক হিসেবে শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেননি। মানুষ মরণশীল, তাই মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার বাসনায় মানুষ যুগে যুগে প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চেয়েছে—কারণ, প্রতিষ্ঠানের মস্ত গুণ, স্থাপকের দেহাবসানের পরেও তার বিকাশ স্তব্ধ হয় না।

একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করা যায়, একই দশকের ব্যবধানে জন্মগ্রহণ করে এ দেশের চারজন মহাপুরুষ আশ্রমভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রাণদায়ী স্বপ্ন দেখেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ এবং বিবেকানন্দকে আমরা প্রতিষ্ঠানিক সংগঠক হিসেবে দেখতে পাই—স্বপ্নের আশ্রমজীবনকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে এঁদের প্রত্যেকেই যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। কিন্তু একশ' বছরের মধ্যে গান্ধীর সবরমতী আশ্রম মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিচেরিতেও আদিযুগের সেই প্রাণবন্ত রূপ আজ বোধ হয় তেমন নেই, আর শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবন, সে তো ইতিহাসের পাতায় নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার জন্য ছুট দিয়েছে। এঁদের প্রতিষ্ঠাতারা সকলেই তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তিমহিমায় এবং সৃষ্টিমহিমায় এখনও বিশ্ববন্দিত হচ্ছেন, কিন্তু সংগঠক হিসেবে তাঁরা কিছুটা হার

মেনেছেন বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হবে না। অন্য তিনজনের তুলনায় বিবেকানন্দ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে সবচেয়ে কম সময় দিতে পেরেছেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিতান্ত শৈশবকালেই তিনি ইহলীলা সংবরণ করেছেন, কিন্তু শতবর্ষের দূরত্বেও একটি প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার ক্রমাগত বিস্তার অব্যাহত। আজও ভারতমাতা প্রতি বছর এই সংঘকে শতাধিক সন্ন্যাসীসন্তান উপহার দিয়ে চলেছেন।

এই আশ্চর্য ব্যাপারটি নিতান্ত দৈবিক নয়, সংগঠক বিবেকানন্দ আগামী সহস্র বৎসরের ছক কষে দিয়ে গিয়েছেন। প্রেমের সঙ্গে নিয়মের, নীতির এবং নিষ্ঠার যে মেলবন্ধনের ব্যবস্থা বিবেকানন্দ নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে করে গিয়েছেন, তা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতন প্রাণশক্তি দেখিয়েছে। এইখানেই সংগঠক বিবেকানন্দের অবিশ্বাস্য সাফল্য।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাংগঠনিক প্রাণশক্তির উৎস কোথায় তা আজও ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানীদের নিয়মিত অনুসন্ধানের হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিবেকানন্দ কল্পিত এবং প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে একটি ম্যানেজমেন্ট বিস্ময় বললে অত্যুক্তি করা হবে না। নিজের মোক্ষ, জগতের মঙ্গল এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক নিয়মের শৃঙ্খলা—তিনটি আপাত বিপরীতধর্মী শক্তির সমন্বয় যে অসম্ভব নয়, তা সংগঠক বিবেকানন্দ দেখিয়ে গিয়েছেন।

সংগঠক বিবেকানন্দ যে তাঁর দূরদৃষ্টিতে অনাগতকালকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন তার প্রমাণ ভূরিভূরি রয়েছে। ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে আলমবাজারে বসে তরুণ সন্ন্যাসীদের বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"দেখ এইসব নিয়ম হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে এগুলি করার মূল লক্ষ্য কী? আমাদের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া।" কোনও প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘদিন প্রাণবন্ত রাখার পক্ষে এটা যে কত বড় কথা তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাংবিধানিকরা এখন ভালভাবেই জানেন।

নিয়ম লেখানো শেষ করে স্বামীজি বলেছিলেন, "দেখিস যদি কোনও নিয়মটা নেতিবাচকভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে ইতিবাচক করে

দিবি।" এটাও মস্ত কথা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংগঠকদের সাফল্যের চাবিকাঠিটা রয়েছে মহামূল্যবান এই বক্তব্যের মধ্যে।

নিয়মকানুন বিদেশিভাবে তৈরি হচ্ছে, এই অভিযোগ শুনে বিবেকানন্দ তাঁর গুরু ভাই স্বামী যোগানন্দকে বলেছিলেন, "সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নতুন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয়নি। প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে তাঁর ভাবসমূহ দিতেই আমাদের জন্ম।"

বহুজনের হিত, বহুজনের সুখের স্বপ্ন বুকে রেখেও কত সংগঠন শেষ পর্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষায় অসমর্থ হয়েছে। সংগঠক বিবেকানন্দের মনের মধ্যে বহু চিন্তা একই সঙ্গে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। একবার তিনি বলেছিলেন, "আমি তো পত্তন মাত্র করে দিচ্ছি—এরপরও আরও কত কী হবে। আমি কতক করে যাব, আর তোদের মধ্যে নানা আইডিয়া দিয়ে যাব, তোরা পরে সেসব কাজে পরিণত করবি। বড় বড় নীতি কেবল শুনলে কী হবে। সেগুলিকে কর্মক্ষেত্রে দাঁড় করাতে—প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতে হবে।"

প্র্যাকটিক্যাল বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেবের নামাঙ্কিত সংঘ পরিচালনার জন্য অনেক প্র্যাকটিক্যাল নিয়মকানুনও সুনিশ্চিত করে গিয়েছেন। অর্থই অনর্থের মূল—অতএব সন্ন্যাসীসকেও পাইপয়সার হিসেব নিষ্ঠার সঙ্গে রাখতে হবে, সেই হিসেব নিয়মিত অডিট করাতে হবে এবং শাকের টাকা মাছে এবং মাছের টাকা শাকে খরচ করা চলবে না। সেইসঙ্গে নিতান্ত সহজভাবে বিবেকানন্দ বলেছেন, "বিদ্যার অভাবে সম্প্রদায় নীচদশাপ্রাপ্ত হয়, অতএব সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকবে। ত্যাগ ও তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে, অবএব ত্যাগ ও তপস্যার ভাব সর্বদা উজ্জ্বল রাখতে হবে।"

সংগঠক বিবেকানন্দ যে তাঁর সমকাল থেকে বহুযোজন এগিয়েছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংঘের আর একটি নিয়মে—"কোনও দেশেই আধ্যাত্মিক ভাব মাত্রেরই প্রয়োজন। কোনও দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অতীব প্রয়োজন। এই প্রকার যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে

লইয়া যাইতে হবে।”

সংগঠক বিবেকানন্দ আরও বলে গেলেন, “এই সংঘই তাঁহার অঙ্গ স্বরূপ এবং এই সংঘেই তিনি সদাবিরাজিত। একীভূত সংঘ যে আদেশ করেন তাহাই প্রভুর আদেশ, সংঘকে যিনি পূজা করেন তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সংঘকে যিনি অমান্য করেন তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।”

একবার এক ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেছিলেন, “এত দুর্যোগের মধ্যেও বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠমিশন শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কীভাবে বেঁচে রইল এবং এমনভাবে বিস্তারিত হল তা অনুসন্ধান করা উচিত। ঠিক মতন খুঁজলে দেখা যাবে, একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী সংগঠকই এ দেশের শ্রেষ্ঠতম ম্যানেজমেন্ট বিশারদ। বুদ্ধ, শংকরাচার্য ও বিবেকানন্দকে না বুঝলে এ দেশে ম্যানেজমেন্ট-চর্চার কোনও মানেই হয় না।”

আমিও একসময়ে সন্ধান করেছি সেই মন্তব্যটির যা একটি বাক্যের মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যকে বুঝিয়ে দেবে।

অবশেষে সেই বর্ণনাটি খুঁজে পেয়েছি ১৯৩২ সালের ইংরিজি প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায়। “ত্যাগে বেপরোয়া, কর্মে অফুরন্ত, প্রেমে সীমাহীন, ইমোশনে উচ্ছল, আক্রমণে নির্দয়, অথচ জ্ঞানে গভীর এবং বহুমুখী, অথচ সরলতায় শিশুর মতন—এই হলেন বিবেকানন্দ।” যিনি এই বাক্যটি রচনা করেছিলেন তাঁকেও আমরা চিনি, তাঁর নাম সুভাষচন্দ্র বসু।

শরীর-স্বাস্থ্য যখন ভালো ছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দর একটা মহৎ গুণ ছিল, তাঁকে কেউ সহজে রাগাতে পারতো না। হয়ত একটা লোক তাঁর সামনে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলছে—কিন্তু নিন্দা করে দিল, নানারকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল, স্বামীজি কিন্তু রাগা দূরের কথা, মুচকি হেসে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেন। এই মন্তব্য স্বয়ং স্বামী অখণ্ডানন্দের, যাকে স্বামীজি রসিকতা করে গ্যাঞ্জেস বলে ডাকতেন।

এই স্বামীজিই গুরুতর অসুস্থ হলে কিন্তু শিশুর মতন হয়ে যেতেন। পরিব্রাজক জীবনে হৃষিকেশে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটু সুস্থ হয়ে তিনি খিচুড়ি খেতে চাইলেন। প্রিয় গুরুভাই রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) খিচুড়ি রাঁধলেন, তিনি জানতেন প্রচণ্ড ঝাল না হলে স্বামীজীর পছন্দ হয় না, কিন্তু রোগের কথা ভেবে শেষ মুহূর্তে তিনি খিচুড়িতে একটু মিছরি দিয়ে দিলেন। ঝালখোর স্বামীজির খিচুড়ি মোটেই ভাল লাগছে না, এমন সময় খিচুড়ির মধ্যে একটা সুতো পেলেন। তখনকার দিনে মিছরিতে দু' একটা সুতো থাকতো। খিচুড়িতে সুতো কেন? জানতে চাইছেন বিরক্ত স্বামীজি, সকলে বলল, এক ডেলা মিছরি ফেলেছে রাখাল। মহাবিরক্ত স্বামীজি এবার আক্রমণ করলেন গুরুভাইকে। "শালা রাখাল, এ তোর কাজ, তুই খিচুড়িতে মিষ্টি দিয়েছিস। দুঃ শালা। তোর একটা আক্কেল নেই।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসন্ন মেজাজের অজস্র কাহিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) ছিলেন প্রিয় গুরুভাই, স্বামীজির দেহাবসানের অল্প দিন পর তাঁর সঙ্গে হরিদ্বারে এক সাধুর দেখা হয়। সাধুটি বলেন, "এত সাধুর সঙ্গে মিশেছি কিন্তু তাঁর মতো সাধু কখনো দেখিনি। হাসাতে হাসাতে পেটে ব্যথা করে দিত, আর হাসির সঙ্গে এমন

কথা বলতেন যে একেবারে বৈরাগ্য যেন আবার জেগে উঠত। অমন ইয়ার সাধু জীবনে কখনো আর দেখিনি”।

বিশ্ববিজয়ের পর ফিরে এসে বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠার পরে সদাপ্রসন্ন এবং প্রাণবন্ত বিবেকানন্দের একটি ছবি এঁকে গিয়েছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। “নরেনের সব কাজ কি চটপট, পাগড়ী বাঁধবে তাও কি চটপট...অন্যলোক এক ঘণ্টায় যে কাজ করছে নরেন দু মিনিটে সে কাজ করে ফেলে এবং এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টা কাজ করে।” এই মানুষটির রেগে যাওয়া অবস্থার ছবিও এঁকেছেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। “একদিন মঠ থেকে রেগে বেরিয়ে গেলেন। ‘বললেন, তোরা সব ছোট লোক, তোদের সঙ্গে থাকতে অসহ্য। তোরা সব অনুষ্ঠান শাস্ত্রমত নিয়ে ঝগড়া করবি।’ কিন্তু শেষটা করলেন কি? সেই ছোটলোকদেরই সব দিয়ে গেলেন।”

আর একদিন ভারি চটে গিয়ে স্বামীজি বলছেন, “একাই যাত্রা করতে হলো—বাজানো, গাওয়া সব একাই করতে হলো, কেউ কিছুই করলে না।” আমাদের তো গালাগালি দিচ্ছেনই—ঠাকুরের উপরেও ভারি অভিমান হয়েছে। তাঁকেও গাল দিচ্ছেন, “পাগলা বামুন, মুখ্যুর হাতে ধরে জীবনটা বৃথা গেল।”

গুরুভাইরা তাঁর সম্বন্ধে আরও সব আশ্চর্য কথা লিখে গিয়েছেন। সুস্থ অবস্থায় স্বামীজির শান্তভাবের। স্বামীজি তখন আমেরিকায়, আত্মার অজত্ব ও অমরত্ব উপদেশ দিতেন, আমি আত্মা, আমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। আমার আবার ভয় কাকে?

কতকগুলো ‘কাউ বয়’ তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য তাদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে। স্বামীজি যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই সময় তারা ডেডশটস (বেপরোয়া গুলি) তাঁর কানের, মাথার নিকট দিয়ে চালাতে আরম্ভ করল, স্বামীজি কিন্তু নির্ভীক, অবিচলিত, তাঁর বক্তৃতারও বিরাম নেই, তখন সেই কাউবয়রা আশ্চর্য হয়ে তাঁর কাছে দৌড়ে গেল, আর বলতে লাগলো, ইনিই আমাদের হিরো।...

“স্বামীজি শেষদিন পর্যন্ত খেটে গিয়েছেন। দেখেছি, শেষ অসুখের সময় বুকে বালিশ দিয়ে হাঁপাচ্ছেন; কিন্তু এদিকে গর্জাচ্ছেন। বলছেন,

"ওঠো, জাগো, কি করছো?"

কিন্তু পাল্লা দিয়ে বেলুড়ে চলেছে বড় বড় মানুষদের মান অভিমানের পালা। স্বামীজির চোখে তখন ঘুম আসে না। নিদ্রাহীনতা রোগে রাতের পর রাত কেটে যায়। স্বামীজির প্রিয়তম শিষ্যদের মধ্যে স্বামী সদানন্দ, গুপ্ত মহারাজ নামে সবার কাছে পরিচিত। একসময় হাতরাস স্টেশনে রেলের কর্মী ছিলেন, কী করে এক অপরাহ্নে তিনি অনাহারে থাকা রমতি সন্ন্যাসীকে নিজের কোয়ার্টারে ডেকে এনে সেবা করেছিলেন এবং যথা সময়ে বৈরাগ্যের দীক্ষা নিয়েছিলেন তা বিবেকানন্দপ্রেমীদের স্মরণে আছে। স্বামীজির মহানির্বাণের কাছাকাছি সময়ে গুপ্ত মহারাজ ছিলেন বেলুড়মঠে। তখন তাঁর শরীর ভাঙনের পথে। একদিন কি কারণে স্বামীজি চটে লাল হয়ে নিজের ঘরে বসে আছেন। মেজাজ অত্যন্ত গরম। কার সাধ্যি সামনে এগোয়। খানা তৈরি করে কোমরে বাবুর্চির তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে খাবার নিয়ে সাধাসাধি, 'মহারাজ নরম হোন। গুস্‌সা ছোড় দিজিয়ে।' টেমপারেচার তবু নামে না।—'মেহেরবানি করুন, সব কুছ্ কসুর মাফ্ কিজিয়ে।' 'যাঃ শালা, দূর হ, খাব না।' সদানন্দ তখন দাঁত দেখালেন, তুমভি মিলিটারী, হামভী মিলিটারী, রেগে হাত নেড়ে মুখের উপর বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। যাঃ শালা। ভুখা রহো, হামারা ক্যা খারাপ! কিন্তু সবাই জানতো ওটা মুখের কথা, স্বামীজি অনাহারে বসে থাকবেন আর তাঁর কাছের মানুষরা আহার করবেন এমন ঘটনা কোনোদিন ঘটেনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে।

মঠে স্বামী বিবেকানন্দ নিজেই অনেকবার বলেছেন, যাঁরা তাঁর বিশেষ প্রিয় পাত্র তাঁদেরই তিনি বেশি বকাবকি করেন। কথাটা অতিরঞ্জিত নয়। কারণ সবচেয়ে তাঁর রাগের সামনে পড়তেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ। এই সারদানন্দকেই তিনি বিদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক দিন পরে দু'জনে দেখা হলো লন্ডনে। দু'জনেরই মধ্যে সীমাহীন ভালবাসা, কিন্তু শুনুন স্বামী সারদানন্দ কী বলছেন প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথকে।

"নরেনের হাপরে পড়ে প্রাণটা আমার গেল। কোথায় বাড়ি ছাড়লাম মাধুকরী করব, নিরিবিলিতে জপ ধ্যান করব। না এক হাপরে ফেলে দিল।

না জানি ইংরাজি, না জানি কথাবার্তা কইতে, অথচ তাইশ হচ্ছে—লেক্‌চার কর, লেক্‌চার কর। আরে বাপু আমার পেটে কিছু আছে? আবার নরেন যা রাগী হয়েছে কোনদিন্‌ মেরে বসবে। তা চেষ্টা করব, দাঁড়িয়ে উঠে যা আসবে তাই একবার বলব; যদি হয়তো ভাল, না হয় চোঁ চাঁ মারব। একেবারে দেশে গিয়ে উঠব। সাধুগিরি করব, সে আমার ভাল। কি উপদ্রবেই না পড়েছি। কি ঝকমারির কাজ। এমন জানলে কি এখানে আসতাম? শুধু নরেনের অসুখ শুনেই এলাম।”

সেবার লন্ডনে স্বামীজি তাঁর ভাই মহিম ও সারদানন্দের আচমকা অসুখ- বিসুখ নিয়ে খুব বিব্রত হয়েছিলেন। একে তো পরের দয়ায়, পরের আশ্রয়ে থাকা। সহায় সম্বল প্রায় কিছুই নেই। তার ওপর সারদানন্দ ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে উৎসাহিত হচ্ছেন না। এই সময় আবার সারদানন্দের প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বর। সারদানন্দের ধারণা, স্বামীজি যা নির্দেশ দিয়েছেন তা করাবেনই। জ্বরে হাঁসফাঁস করতে করতে তিনি পায়চারি করছেন এবং মহিমকে বললেন, “দেখ মহিম, নরেন তো ছাড়বে না। যেকোন প্রকারেই হোক লেকচার দেওয়াবেই। এবার লেকচার রিহার্সাল শুরু করলেন মহিমের সামনে, অনুরোধ করলেন তুমি কিন্তু হুঁ দিও।”

মহিমেরও তখন জ্বর! চেয়ারে বসে অতিকষ্টে হুঁ দিতে লাগলেন। এরপরে উভয়েই বিছানার ভিতর কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়লেন, কিন্তু সারদানন্দ মাথা পর্যন্ত কম্বল ঢেকে লেকচার আওড়াতে লাগলেন। প্রায় পাঁচটার সময় স্বামীজি ঘরে এসে ঢুকে সারদানন্দকে লেকচার আওড়াতে শুনে হেসে ধমক দিয়েছেন, সারদানন্দ চিন্তামুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পরের দিন সারদানন্দর জ্বর একটু কম, কিন্তু মহিম কাহিল, বেহুঁশ অবস্থায় একঘণ্টার উপর ছিলেন। বিব্রত বিবেকানন্দ বিদেশে বোধ হয় বাধ্য হয়ে বিশেষ শক্তি প্রয়োগ করলেন। ভাই লিখেছেন, স্বামীজি ঘরে ঢুকে যখন শুনলেন জ্বর নেই তখন বললেন, যা আর জ্বর আসবে না, আমি নীচে বসে উইলফোর্স দিচ্ছিলাম। সারদানন্দও ভালবাসায় মুগ্ধ, স্বামীজিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, “আমার মনটা ভাল করে দাও, এটাকে

উপরে তুলে দাও।”

এরপর সহাস্য স্বামীজির সেই বিখ্যাত ডায়ালগ : “দুঃশালা হোঁৎকা, উঠে বোস! শালার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে কিনা তাই গতিকে কি কচ্ছে দেখ! যা শালা তোকে লেকচার করতে হবে না, না হলে তোকে মারব লাথি আর এই চারতলার জানলা থেকে রাস্তায় ফেলে দোব। শালা তোকে ওয়ার্ক হাউসে খাটাব। জানিস না কত খরচ হয়েছে।”

শুধু সারদানন্দ নয়, নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও স্পেশাল স্টাইলে কথা বলতেন স্বামীজি। লন্ডনে তিনি চেয়েছিলেন ব্যারিস্টারি না পড়ে ভাইও সারদানন্দ ও গুডউইনের সঙ্গে আমেরিকা পাড়ি দেয়। অনুগত ভক্ত ও ক্ষিপ্রলিপিকার গুডউইন যেমন স্বামীজি একটু ঘরের বাইরে গেছেন অমনি নকল করে মহিমকে বলতে লাগলেন, “মারব ঘুষি দাঁত ভেঙ্গে দেব, নাক ভেঙ্গে দেব। চ' আমেরিকায়। তিনজনে মিলে যাব।”

এসবের মধ্যে রাগ যতটুকু আছে তার থেকে মজা অনেক বেশি। জীবনের প্রধান সময়টুকুই ছিলেন স্বামীজি মজার মানুষ। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাই বারবার বলছেন, “তাঁর রাগ একেবারেই ছিল না। তিনি তিনি ছিলেন অক্রোধপরমানন্দ।”

রাজপুতনার এক নাপিত স্বামী অখণ্ডানন্দকে বলেছিলেন, “মহারাজ, আপনাদের স্বামীজির তুলনা নেই। অমন ক্রোধ সংবরণ করতে কাউকে দেখিনি। পণ্ডিত তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানসূচক উত্তর দিচ্ছে—আর তিনি মুচকি মুচকি হেসে তার উত্তর দিচ্ছেন। শেষে, যারা তাঁর নিন্দা করতে এসেছিল তারাই তাঁর গোলাম হয়ে গেল।”

রোগে জর্জরিত এই মানুষটিই শেষ জীবনে কি রকম অসহায় হয়ে উঠেছিলেন, কেমনভাবে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতো তার বিবরণ প্রিয়শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী অচলানন্দ (স্বামীজির শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য) কিছু কিছু রেখে দিয়েছেন। স্বামীজির প্রধান সমস্যা নিদ্রাহীনতা। একবার তিনি কনিষ্ঠতম শিষ্যকে বললেন, “বাবা, তুই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারিস? তুই যা চাস, তোকে আমি তাই দেব।” তখন তাঁর নিদ্রা হলেও শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট। স্বামীজি বললেন অচলানন্দকে, “জ্ঞান হওয়ার পর

থেকে আমি জীবনে কখনও চার ঘণ্টার বেশি ঘুমাইনি।" যখন তিনি একথা বলছেন তখন তাঁর চোখে একেবারেই ঘুম নেই।

স্বামী অচলানন্দ বলেছেন, অসুস্থ স্বামীজি যখন উগ্রমূর্তি ধারণ করতেন তখনও তার মধ্যে একটা মাধুর্য থাকতো। আরও একটা বৈশিষ্ট্য, ক্রোধের পর মুহূর্তেই তাঁর উগ্রভাব চলে যতো, আবার সেই প্রেমপূর্ণ মধুর ভাব আত্মপ্রকাশ করতো। কেউ বুঝতো না যে তিনি একটু আগেই রেগে গিয়েছিলেন।

উদাহরণ? সেবক কানাইয়ের ওপর খুব চটে গিয়েছেন, একটা ছড়ি নিয়ে তাঁর পিছন পিছন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। পরক্ষণেই ক্রোধের ভাব একেবারে চলে গেল। আর একবার বৃষ্টির সময় ব্রহ্মচারীরা বৃষ্টির পরিস্রুত জল ধরছিল। কি একটা কারণে স্বামীজি দু'জন ব্রহ্মচারীকে খুব বকছিলেন। তাই দেখে তরুণ অচলানন্দ কাঁপতে লাগলেন। তাঁর হাত থেকে বৃষ্টিজলের বোতলটি পড়ে গেল। মুহূর্তে স্বামীজির রাগ চলে গেল। তিনি বললেন, "বাবা, তুই নার্ভাস হয়ে পড়েছিস। যা, আমার ঘরে একটা ওষুধ আছে, খেয়ে শুয়ে পড়গে যা।" তাঁর প্রিয় স্বামী তুরীয়ানন্দকে একবার একটা চিঠি পোস্ট করতে দিলেন। হরি মহারাজ ঠিকানাটা দেখছেন। দেখে বললেন, "হরি ভাই, তোমাকে চিঠিটা ডাকে ফেলতে দিয়েছি, ঠিকানা পড়তে তো বলিনি। অন্যের চিঠির ঠিকানা তুমি কেন পড়, এ কাজ তোমার ঠিক নয়।" ব্যাপারটা লুকনো কিছু নয়, স্বয়ং হরি মহারাজই বলে গিয়েছেন।

কিন্তু মানুষের জন্যে স্বামীজির স্নেহের শেষ নেই। স্বামী অচলানন্দ বললেন, একটি বালক ফলের রস করতে গিয়ে একবার একটা সৌখিন কাচের গ্লাস ভেঙে ফেললো। সবাই তাকে বকাবকি করছে শুনে স্বামীজি বললেন, "ঠাকুরের কাছে আমরা গিয়েছিলাম, তিনি কত ভালবাসা দিয়ে আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন, এরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমাদের এখানে এসেছে। এদের এরকম ভীষণ বকুনি দিলে চলবে কেন? এরা থাকতে পারবে কেন? গেলাস তো ঐভাবেই যাবে, গেলাসের তো আর কলেরা হবে না, থাইসিসও হবে না।"

শতাব্দীর ব্যবধানেও বেলুড় মঠের প্রাণপুরুষের শেষ দিকের সব ঘটনা আজও ধৈর্য সহকারে সংগৃহীত বা লিপিবদ্ধ হয়নি। অথচ স্বামীজির অন্ত্যলীলার বিস্তৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ছবি আঁকতে গেলে এইসব ঘটনাগুলির গুরুত্ব অসীম। দু'একটি কাহিনি নিশ্চিন্তে পরিবেশন করাটা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। স্বামী শুদ্ধানন্দ (মঠ মিশনের সভাপতি) ১৮৯৭ সালে আলমবাজার মঠে যোগ দিয়ে স্বামীজির কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।

স্বামীজির ইংরেজি গ্রন্থাবলীর এক বৃহদংশের সার্থক বঙ্গানুবাদক তিনি। তিনি বলছেন, একদিন মঠের বারান্দায় স্বামীজি বেদান্ত পড়াতে বসেছেন, এমন সময় তাঁর গুরুভ্রাতা এসে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণকে বললেন, চল হে চল, আরতি করতে হবে চল। স্বামীজি বিরক্ত হয়ে বললেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁদ পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানেব যথার্থ আরাধনা হয়। তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি।"

এইরকম অস্বস্তিকর পরিবেশে বেদান্ত পাঠভঙ্গ ও আরতি হলো। আরতির পর কিন্তু স্বামীজির গুরুভ্রাতাকে দেখা গেল না। স্বামীজি ততক্ষণে ব্যাকুল হয়ে বলছেন "কোথায় গেল, সেকি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল?" বহুক্ষণ পরে ছাদ থেকে ধরে আনা হলো গুরুভাইকে, স্বামীজির ভাব ততক্ষণে বদলে গিয়েছে। তিনি কত আদর, কত যত্ন করতে লাগলেন।

বকাবকি করতেন, মান অভিমান হতো অসুস্থ শরীরে। কিন্তু যাকে যত ভালবাসতেন তাকে তত বকতেন এবং গাল দিতেন।

স্বামীজি একবার বেলুড়মঠে নিয়ম করেছিলেন যে, কেউ দিবানিদ্রা যেতে পারবে না। একদিন ঘুরে দেখেন স্বামী প্রেমানন্দ ঘুমোচ্ছেন। স্বামীজি তখনই এক শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন, যা তাকে পা ধরে টেনে ফেলে দিতে। টানাটানিতে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে প্রেমানন্দ বললেন, আরে থাম থাম করিস কি। ঐদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতির পর স্বামী প্রেমানন্দ ঘরের সামনের বারান্দায় উত্তর দিক দিয়ে ঐ স্থানে প্রবেশ করলেন, তখন স্বামীজি পায়চারি করছিলেন। গুরুভাইকে দেখে স্বামীজি তার চরণযুগল জড়িয়ে

দরবিগলিত নেত্রে বলতে লাগলেন, "আমি তোদের সঙ্গে কি অন্যায় অত্যাচার না করছি।" এই বলে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করতে লাগলেন। স্বামী প্রেমানন্দ সেদিন যে বহুকষ্টে তাঁকে শান্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা আমরা স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি।

স্বামীজির কাছে ছাড় কেউই পেত না। আমেরিকা ফেরত স্বামী সারদানন্দ দেশে ফিরে সর্বদা ফিটফাট পরিষ্কার থাকতেন। একদিন হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) মাদুরে জুতো পরে বসে আছেন। স্বামীজি যথাসময়ে ধমক দিলেন, "হ্যাঁরে সারদা ওরা (আমেরিকাবাসীরা) কি তোকে গ্রাস করেছে? কিছু কি শুঁকিয়ে দিয়েছিল যে একেবারে সব ব্যাপারে ওদের মতো হয়ে গেছিস?"

যার উপর স্বামীজি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন, তাঁর অবর্তমানে যাঁর ওপর স্বামীজি মঠের দায়িত্ব অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, সেই আবাল্যবান্ধব রাজা মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দের ব্যাপারটা শুনুন। তার সঙ্গে স্বামীজির চিকিৎসা সংবাদ। তাঁর পা ফুলেছে। সমস্ত শরীরে জলসঞ্চার হয়েছে। গুরুভাইরা বড়ই চিন্তিত। স্বামীজি অবশেষে কবিরাজী ওষুধ খেতে রাজি হয়েছেন।

"শিষ্য : মহাশয়, এই দারুণ গ্রীষ্মকাল। তাতে আবার আপনি ঘণ্টায় চার-পাঁচ বার করে জলপান করেন। এ সময়ে জলবন্ধ করে ওষুধ খাওয়া আপনার পক্ষে অসহ্য হবে।

"স্বামীজি : তুই কি বলছিস? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে 'আর জলপান করব না' বলে দৃঢ় সংকল্প করব। তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নিচে নাবেন। তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই আলস।"

শরীরের ওপর এই নিষ্ঠুর শাসন শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল, যদিও চিকিৎসায় কী সাফল্য এসেছিল তা সন্দেহজনক।

তবে সারাজীবন ধরে শরীরকে কত যন্ত্রণা যে সহ্য করতে হয়েছে তার শেষ নেই। স্বামীজি নিজেই বলেছেন, পরিব্রাজক জীবনে এক-আধদিন

উপবাস করাতে তিনি উপেক্ষাই করেছেন। তবে কখনও তিনদিনের বেশি উপবাস করতে হয়নি। "সেই সময় একবার বাঘে খেয়ে ফেলুক ভেবে বনে বসেছিলেন। বাঘ কিন্তু ফিরে চলে গেল দেখে দুঃখিত হয়ে বললেন, বাঘেও খেল না।"

অসুস্থ শরীরের কথায় ফিরে আসা যাক। ডায়াবেটিস, বিনিদ্রা, হার্টের ট্রাবল নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে তাঁকে বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।

যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দের সংযোজন : এর কিছুদিন পরেই দেওঘরে স্বামীজির জীবন সংকটাপন্ন। "সময় সময় এত শ্বাসকষ্ট হইত যে মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিত এবং উপস্থিত সকলে মনে করিতেন, জীবন বা প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া যাইবে। স্বামীজী বলিতেন, এই সময় একটি উঁচু তাকিয়ার উপর ভর দিয়া বসিয়া মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেন।"

সমকালের অবজ্ঞা অপমান বিবেকানন্দকে স্পর্শ করতে পারেনি, কিন্তু তাঁর শরীরের অবনতির পরে তাঁর যত কিছু মান-অভিমান ও বকাবকি সব তাঁর প্রিয় গুরুভাই ও শিষ্যদের প্রতি। তবে শুধু বকেননি, দিয়েছেনও নিজেকে উজাড় করে।

স্বামীজির রাগ যাঁদের উপর গিয়ে পড়ত তাঁদের অবস্থা কিরকম হত? স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার বলেছিলেন, "তাঁর বকুনি সহ্য করতে না পেরে আমারই কতবার মনে হয়েছে মঠ ছেড়ে চলে যাই।"

শেষের সময় আর সুদূর নয়। স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখেছেন, "স্বামীজি শেষটায় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে হতাশ হয়ে জীবজন্তু নিয়ে থাকতেন। তাঁর অনেক হাঁস, পায়রা, কুকুর বেড়াল, ভেড়া ইত্যাদি ছিল। দস্তুরমতো একটা চিড়িয়াখানা তৈরি করেছিলেন। নিজের সেবার টাকা থেকে তাদের জন্য দেড়শ টাকা খরচ করতেন। তাঁর হাঁসের মধ্যে চীনে, বম্বেটে, পাতিহাঁসও ছিল। কুকুরের নাম মেরি, টাইগার। ভেড়ার নাম মটরু। চীনে হাঁসের নাম যশোমতী রেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বামীজির দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশুপাখী সব মরে যায়। তিনি যাকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তার একটিও বেশি দিন বাঁচেনি।" স্বামীজির দেহরক্ষার পরে

খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) কয়েকটি পশুপাখি অখণ্ডানন্দকে দিয়েছিলেন। একটি বেড়াল স্বামীজির পায়রাটিকে লুকিয়ে খায়। স্বামী শঙ্করানন্দ সেই সময় আশ্রমে ছিলেন। তিনি বেড়ালটাকে এমন ঘুষি মেরেছিলেন যে, তাঁর হাত থেঁতলে গিয়েছিল।

বড় চুপি চুপি এলো ৪ঠা জুলাই ১৯০২। স্বামীজির অসুস্থতা ছিল, কিন্তু কেউ বোঝেনি যে সময় সমাগত। প্রায় বিনা নোটিসেই তিনি চলে গেলেন। যাবার তিনদিন আগে আকারে-প্রকারে জানিয়ে দিয়ে গেলেন কোথায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হবে।

পরহিতার্থে দধীচির আত্মত্যাগের গল্প বলতে বলতে স্বামী অখণ্ডানন্দ একবার স্বামীজির কথা টেনে এনেছিলেন। "কাজের জন্যই স্বামীজি এসে মঠ মিশন করে গেলেন, তা যদি না হবে তো যাবার দিনেও স্বামীজি এত কাজ করে গেলেন কেন? অনেকদিন থেকেই চিঠিতে লিখেছেন, 'মা আমায় ডাকছেন, আমার কাজ ফুরিয়ে এসেছে'। কিন্তু কই, হাত পা গুটিয়ে তো বসে রইলেন না। বহুমূত্র অসুখ, পরিশ্রান্ত, কিন্তু সেদিনও দেড় মাইল বেড়িয়ে এলেন, ব্যাকরণের ক্লাশ করলেন, সাধুদের বকলেন কাজ-কর্ম না করার দরুন।...শেষে ধ্যানে বসলেন। যাওয়ার দিনেও যেন কাজের জোয়ার এসেছিল।"

দু'বছর ধরে মৃত্যু উপত্যকার উপর দিয়ে শারীরিক ও মানসিক যাত্রা করে স্বামী বিবেকানন্দ যেন শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হলেন। একমাত্র তিনিই লিখতে পারেন "অসীম একাকী আমি, কারণ মুক্ত আমি—ছিলাম মুক্ত, চিরদিন থাকব মুক্ত।...আঃ কি আনন্দ প্রতিদিন তাকে উপলব্ধি করছি! হাঁ, হাঁ, আমি মুক্ত, মুক্ত! আমি একা—একা অদ্বিতীয়...হাঁ, এখন আমি খাঁটি বিবেকানন্দ হতে চলেছি।"